মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা

এম. ফিল থিসিস

382727

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
382727

গবেষকঃ-

মোঃ আবদুস ছাত্তার
ইতিহাস বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
954.923
SAM
c.2

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা

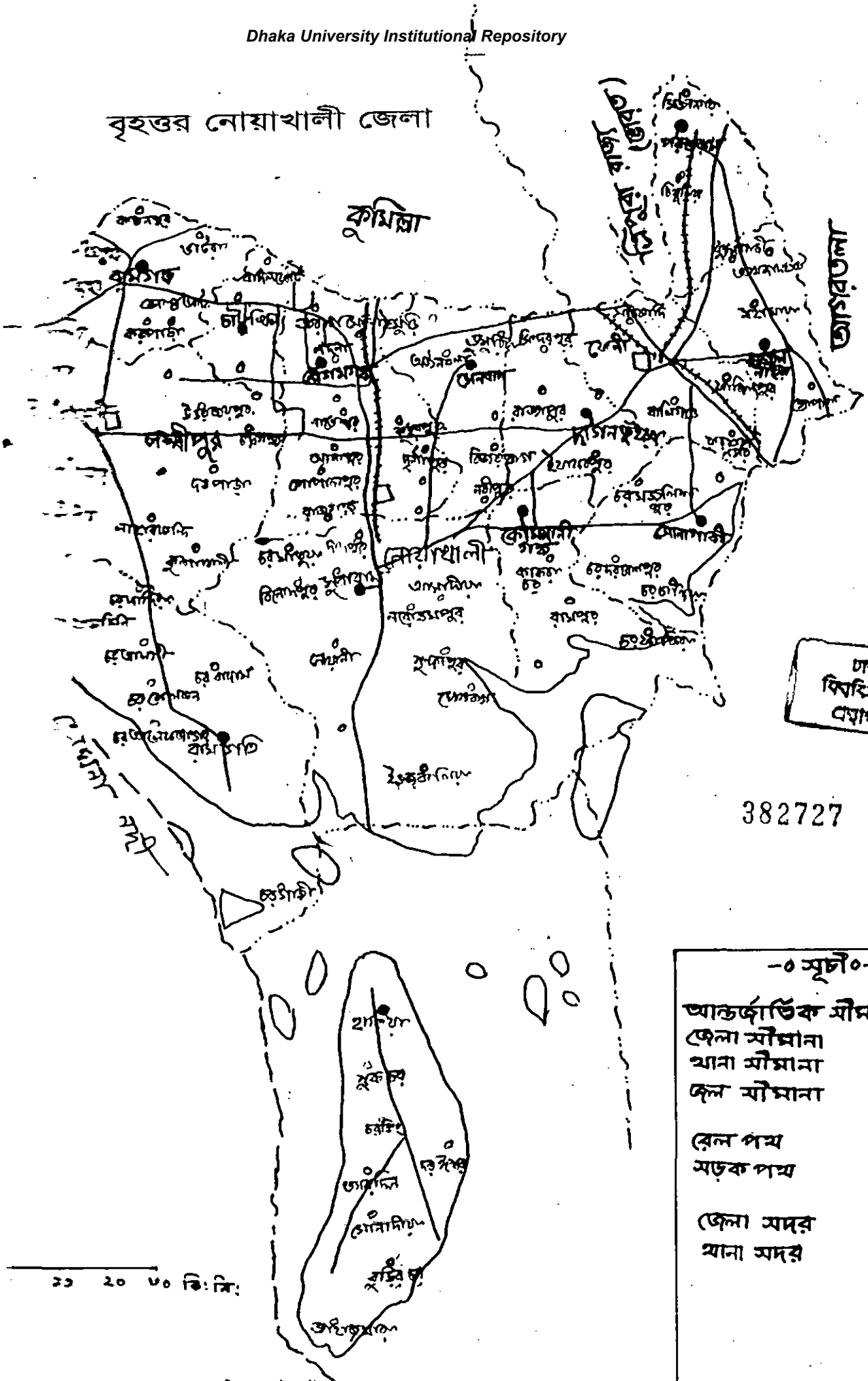

382727

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্রঃ-

অধ্যায়		পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ		I - III
প্রথম অধ্যায় ঃ-	নোয়াখালী জেলার পরিবেশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১ -২২
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ-	স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি ও নোয়াখালী জেলা	২৩ -৪৮
তৃতীয় অধ্যায়ঃ-	মুক্তিযুদ্ধ কালীন নোয়াখালীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক তৎপরতা	৪৯ - ৬৪
চতুর্থ অধ্যায়ঃ-	যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনা	৬৫ - ১১২
পঞ্চম অধ্যায়ঃ-	মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি (মার্চ -ডিসেম্বর ১৯৭১)	১১৩ - ১২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ-	যুদ্ধত্তোর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন	১২৬ - ১৩৮
উপসংহারঃ-		১৩৯ - ১৪১
পরিশিষ্টঃ-		১৪২ -২০০
	I. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা	
	II. ছাত্রদের ১১ দফা	
	III. স্বাধীনতার ইস্তেহার	
	IV. ৭ই মার্চের ভাষন	
	V. অসযোগের ৩৫ দফা নির্দেশ নামা	
	VI. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা	
গ্রন্থপঞ্জীঃ-		২০১ - ২০৪
মানচিত্রঃ-		২০৫ - ২০৭

382727

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম জাতীয় জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। সময়ের সাহসী সন্তানেরা দেশকে বিদেশী শাসক ও শোষনের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং শত্রুর কবল থেকে দেশ ও দেশের মানুষ কে বাঁচাতে মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করে। সমগ্র বাঙালী জাতির সপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে নোয়াখালী জেলার জনসাধারনও স্বত:স্ফুর্তভাবে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহন করে। সঠিক তথ্য ও অনুসন্ধানের অভাবে মুক্তি যুদ্ধের অনেক ইতিহাস আজও আমাদের অজানা। বিশেষ করে স্থানীয় ভাবে জেলা ও থানা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষনা ভিত্তিক লেখা খুব একটা হয়নি। যে কারনে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট থাকবে অজানা।

সঠিক তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষনা ভিত্তিক স্থানীয় পূর্নাঙ্গ ইতিহাস ব্যতীত সামগ্রীক ইতিহাস পূর্নতা পায়না। স্থানীয় বা আঞ্চলিক পূর্নাঙ্গ ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতীয় ইতিহাস রচিত হলে তার গ্রহন যোগ্যতা বেড়ে যায়। স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের পূর্নাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। যদিও এসময়ের মধ্যে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সম্পূর্ন তথ্য পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগন মনে করেন না। আজও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে চলছে বিস্তর গবেষনা। কিন্তু এবিষয়ে আঞ্চলিক গবেষনা বা অনুসন্ধান ধর্মী ইতিহাস চর্চা লক্ষনীয়ভাবে কম। যে কারনে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জনগনের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ন থেকে যায়। একটি তথ্য ভিত্তিক গবেষনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে "মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার" অবদান দেশবাসী ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে এক দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলশ্রুতি। প্রত্যেকটি জেলার মত বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সচেতন জনগনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের। এই জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূত্র ধরে যতটা সম্ভব প্রকৃত ঘটনা ও তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এখানে রয়েছে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নোয়াখালীর যে ঐতিহ্য ও সুনাম রয়েছে, তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তা অনেকটা ম্লান মনে হয়েছে। কারন নোয়াখালীতে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি জন্ম নিলেও এবং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখলেও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অবদান কম। আজ পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। বিক্ষিপ্ত কিছু লেখালেখি হলেও কোন ঐতিহাসিক পন্ডিত ব্যক্তিত্ব এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের স্বীকৃত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার ইতিহাস রচনা করেনি। আর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত লেখা নাই বললেই চলে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস তেমন একটা রচিত হয়নি। কারন ১৯৭১ সালে যারা কাধে রাইফেল নিয়ে জীবন বাজী রেখে পাকিস্তানি শত্রু এবং তাদের এদেশীয় সহযোগিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদের আবেগ-উচ্ছাস এবং বর্তমান প্রজন্মের এ সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহ ও ধারনা ঠিক একরকম নয়। কারন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপর একটা ধর্মীয় আবরন দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। তাই ধর্মভীরু নোয়াখালীর বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে মূল্যায়ন করা হয়না। বর্তমান সামরিক-আধাসামরিক বাহিনীর একজন সদস্যকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী হিসাবে যে ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়, আমাদের বর্তমান প্রজন্মের একটা বড় অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের ঠিক সেরকমই একজন সৈনিক হিসাবেই মনে করছে। তাদের দেশ প্রেম, জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এই প্রজন্মের কাছে প্রায় মূল্যহীন। সে কারনে মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ কম। আর যে টুকু জানে তা প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃত রূপ মাত্র। তারা যা জেনেছে বা যে টুকু শিখানো হয়েছে তার সাথে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল প্রেরনার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

তাই এ গবেষনায় মুক্তি যুদ্ধের চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাসের উপকরনের আলোকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। স্মৃতি চারন মুলক যুদ্ধের বর্ণনা না দিয়ে নোয়াখালী জেলার সংগ্রামী মানুষের দীর্ঘ রাজনৈতিক পটভূমি, রাজনৈতকি নেতৃবৃন্দ, কর্মী এবং সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নোয়াখালী বাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং তার জন্য তাদের চরম আত্মত্যাগ, ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর থেকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভূমিকা, ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে শুরু করে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং পর্যন্ত পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী অনুচরদের হাতে সংঘটিত গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, যুদ্ধ ও তার ফলাফল সঠিক ভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন এবং মুক্তি বাহিনীর ভূমিকা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও তালিকা, স্বাধীনতা বিরোধীদের ভূমিকা ও নামের তালিকা, ক্ষয়ক্ষতি ও স্বাধীনতা উত্তর পূনর্বাসন ও পূর্নগঠনের বিবরণ এখানে আছে। তবে স্বাধীনতার পর সরকারী-বেসরকারী পরিকল্পনার অভাবে সঠিক ভাবে এলাকা ভিত্তিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান নিরুপিত না হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি ভাবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসাব করা হয়েছে। তেমনি ভাবে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর বাহিনীর তালিকাও অসম্পূর্ন রয়ে গেছে। কারন সরকারি ভাবে তাদের কোন পূর্নাঙ্গ তালিকা তৈরী হয়নি এবং সাক্ষাতকারে অনেকেই বিরোধীদের নাম প্রকাশে অনীহা প্রদর্শন করেছেন।

মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যক্তি গত সাক্ষাতকারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ যে সব নেতৃবৃন্দ মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অনেকেই প্রয়াত। আর যে কয়েক জন বেঁছে আছেন তাদের স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়ায় তিন দশক পূর্বের ঘটনা গুলি ঠিক ভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। আবার এমনও হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইলে কেমন যেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে যতদুর সম্ভব স্থানীয় সংগঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল ব্যক্তিত্ব যুদ্ধকালীন সময়ে নোয়াখালীতে অবস্থান করে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছেন এবং পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কারো কাছ থেকে লিখিত কোন দলিল পাওয়া যায়নি। কয়েকজন বলেছেন যে তাদের নিকট বিভিন্ন দলিল পত্র ছিল। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর সে গুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তথ্য সংগ্রহে যে সমস্যাটি বেশী লক্ষ্য করা গেছে তাহলো সাক্ষাতকারে প্রত্যেকেই নিজের অবদানটাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কার্পন্য করেছেন। মুক্তি যুদ্ধের বিরোধীদের ভূমিকা এবং তাদের নাম ঠিকানা বলতে অপরাগতা জানিয়েছেন। নিরাপত্তা জনিত কারণে এবং অনেক রাজাকার আলবদর বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাধর হওয়ার কারনে তাদের সম্পর্কে তথ্য দিতে ভয় পেয়েছেন অনেকে। তাই-মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের সঠিক পূর্নাঙ্গ তালিকা দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু মুক্তি যোদ্ধাদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাতে দেখা যাচেছ প্রকৃত অনেক মুক্তিযোদ্ধার নামও বাদ পড়েছে। আবার অনেকেই মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন শত্রুতা বশতঃ। তার পরও যাচাই বাচাই করে সঠিক তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছে। ফেনীতে দুইটি শক্তিশালী গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধের মধ্যে পড়ে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছি। অনেকে সাদরে আপ্যায়ন করেছেন, মূল্যবান সময় দিয়েছেন, অনেকে সময় দিতে রাজী হননি এবং বিদ্রুপের স্বরে কথাও বলেছেন।

গবেষনা কর্মের তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তার পরও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র ১৬ খন্ড। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত স্মরনীকা ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমার তত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. কে, এম, মোহসিন এর নিকট আমি সবচেয়ে বেশী ঋনী। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়তা করেছেন বলে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর এ. বি. এম. মাহমুদ, প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, শরিফুল্লাহ ভুঁইয়া, নুরুল হুদা আবুল মুনছুর ও আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আমাকে বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে লেখার মান উৎকর্ষে সাহায্য করেছেন-তাদের কাছে আমি ঋণী। স্থানীয় পর্যায়ে যারা সাক্ষাতকারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আরো কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকাস্থ ভারতীয় লাইব্রেরী, বি. আই. ডি. এস, নায়েম, বাংলা একাডেমী, এসিয়াটিক সোসাইটি, নোয়াখালী জেলা পাবলিক লাইব্রেরী, শাহজাদপুর সরকারি কলেজ লাইব্রেরী ও জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের নিকট। আমার অনুজ ওপিনিয়ন কম্পিউটার সিস্টেমের স্বত্বাধিকারী মোঃ জুলফিকার আলী ফিরোজ অভিসন্দর্ভ কম্পোজে সহায়তা করেছেন। আমার সহধর্মিনী আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনায় অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন এবং সার্বিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার কাছেও আমি ঋনী।

মোঃ আবদুস ছাত্তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নোয়াখালী জেলার পরিবেশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভৌগলিক অবস্থান ঃ- নোয়াখালী জেলা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সাবেক জেলা গুলোর অন্যতম। ভৌগলিক অবস্থানগত দিক থেকে ইহা ২২°-০৬ থেকে ২৩°-১৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°-৩৮ থেকে ৯১°-৩৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১] এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী ব-দ্বীপ জেলা। সমুদ্র উপকূলীয় নোয়াখালী জেলা এক সময় বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল। তখন যে স্থানে ভীষণ উর্মিমালার নৃত্য ভীতি সঞ্চার করিত, যে স্থান এক সময় অর্নবচরগনে পরিব্যাপ্ত ছিল, আজ সেই স্থানে বহু সংখক মানব সুখে জীবন যাপন করছে।[২] ১৯৬১ সনের সরকারি গণনা অনুযায়ী এই জেলার আয়তন ছিল ৩১২৮ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সনের গণনা অনুযায়ী এর আয়তন ৫৯৮৫.২৯ বর্গ কিলোমিটার। ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র লীলাভূমি আধুনিক নোয়াখালী জেলা। সমুদ্র তীরের নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি দ্বীপ এ জেলার আয়তন অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বেগবর্তী মেঘনা ও অন্যান্য নদীর ভাঙ্গনের কারণে আয়তন সর্বদা পরিবর্তনশীল।

সীমানাঃ- বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোনে প্রবাহিত ফেনী নদী চট্টগ্রাম জেলা থেকে এ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ফেনী নদীর তীরে জেলার সীমানা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এই নদী নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। ত্রিপুরার পাহাড় গুলোর একজায়গায় মিনারের মত একটা উচ্চ ভুমি প্রসারিত আছে। এখানে নোয়াখালী জেলা কুমিল্লা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই সীমান্ত বিন্দু হতে বরাবর মেঘনা নদী পর্যন্ত কুমিল্লা আর নোয়াখালী জেলার উত্তর সীমারেখা প্রায় সরলরেখায় প্রসারিত। পশ্চিমে মেঘনা নদী ও বরিশাল জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

পূর্বে এই সীমানা আরো অনেক বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন সমতট যা পরে ভুলুয়া নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এরও পরে যখন নোয়াখালী জেলার সীমানা নির্ধারণ করা হয় ১৮২২ সালের ২৯ মার্চ গভর্নর জেনারেলের এক আদেশে[৩] তখনকার সীমানা ছিল বর্তমান নোয়াখালী জেলার মূল ভূখন্ড ও দ্বীপপুঞ্জসহ পশ্চিমে মেঘনা নদী ও দক্ষিণ শাহবাজপুর (বর্তমান ভোলা জেলা), বরিশাল জেলার কিছু অংশ, পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরা জেলা এবং দক্ষিণে বর্তমান চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অঞ্চলও নোয়াখালীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমান কুমিল্লা জেলার এলাহাবাদ পরগনা সহ তিনটি মহল নোয়াখালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৯ সনে দক্ষিণ শাহবাজপুরকে বরিশাল জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ সনে ত্রিপুরাকে আলাদা করা হয়। ১৮৭৬ সনে চট্টগ্রামের মীরেরশ্বরাই থানাকে নোয়াখালীর জেলার অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তীতে আবার বাতিল করা হয়।[৪] উনিশ শতকের শেষ দিকে

১। নুরুল ইসলাম খান (সি,এস,পি) সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার নোয়াখালী (১৯৭৭) পৃ-০১ ।
২। প্যারি মোহন সেন, নোয়াখালীর ইতিহাস (২য় সংস্করণ)।
৩। নুরুল ইসলাম খান (সি,এস,পি) সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার নোয়াখালী (১৯৭৭) পৃ-০১ ।
৪। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮১ সনে সর্বশেষ সীমানা নির্ধারণ করা হয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি ১৯৫৫ সনে সন্দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন চর এলাকাসহ ৪২৭ বর্গ কিলোমিটার ভূমি চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৫ সনে সাবেক নোয়াখালী জেলাকে বিভক্ত করে- নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর নামে তিনটি পৃথক জেলা সৃষ্টি করা হয়। আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধি সাবেক নোয়াখালী জেলা।

নাম করণের পটভূমি ও নাম করনঃ- প্রাচীন জনপদ সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল নোয়াখালী জেলা। পূর্বে এর নাম ছিল ভুলুয়া। মোঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আইন-ই-আকবরীতে" সমতটের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় সমতটের আয়তন ছিল প্রায় ৬৪০০০ বর্গ কিলোমিটার। ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেটের পশ্চিম-দক্ষিণাংশ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের পশ্চিমাঞ্চল প্রাচীন যুগে পরিচিত ছিল সমতট নামে।

অতীতে এই জেলার ইতিহাস ও জনবসতি সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু ছাগল নাইয়া থানায় নব্য প্রস্তর যুগের কৃষি সরঞ্জাম আবিস্কৃত হওয়ায় এ অস্পষ্টতা এখন আর নাই। ফেনী নদীর তীরে পার্বত্য ত্রিপুরার পাদদেশে ভু-গর্ভে থেকে পাথর নির্মিত লাঙ্গলের যে ফলাটি উদ্ধার করা হয়েছে প্রত্নবেত্তারা সেটি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের বলে সনাক্ত করেছেন। অর্থাৎ ধরে নেয়া যায় যে, প্রায় ৬০০০ বছর আগে ফেনী নদী এলাকায় প্রাচীন কৃষকরা এটি ব্যবহার করেছিলেন।[৫] এর থেকে প্রত্নবেত্তারা ধারণা করছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যে প্রাগৈতিহাসিক অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জনগোষ্ঠি আসামের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিলো, নোয়াখালী অঞ্চলের এ আদিম কৃষকরা ছিলেন তাদের বংশধর।

গবেষকদের মতে মেঘনা, বরাক, ফেনী, মুহুরী, ডাকাতিয়া, বরকল, তিতাস, তিস্তা, দামোদর, গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদীর নাম করন করেছেন প্রাগৈতিহাসিক বাংলার অষ্ট্রিক বসতিরা। ভুলুয়া, ভোলা, বাকলা (বরিশাল) প্রভৃতি অঞ্চলের নামও সম্ভবত তাদের দেয়া। ভুলুয়ার নাম করন নিয়ে "রাজমালা" নামক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক কৈলাশ চন্দ্র সিংহ একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বের উপর দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকেও ভুলুয়া নাম প্রচলিত ছিল। পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়, গৌড়, উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র, পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি (বগুড়ার মহাস্থানগড়) এবং সমতট (মধ্যবাংলা) যুগেও ভুলুয়া অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল।[৬] মেগাস্থিনিসের বর্ণনা ও প্রাচীন হিন্দু পুরান ও গ্রন্থাদি অনুসারে আর্য সভ্যতা বিকাশের বহুপূর্বে এদেশের অস্তিত্ব ছিল। ষষ্ঠ শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলার এই প্রত্যান্ত অঞ্চলে কমলাংক নামক রাজ্য ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ভুলুয়া নামের উৎপত্তির বিবরণ সঠিক জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কে যে লোক কথা প্রচলিত রয়েছে তাতে এটা যে একটা নতুন জেগে উঠা চর তার সমর্থন মিলে। নোয়াখালীর শিক্ষিত হিন্দু সমাজে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন কালে মিথিলার রাজপুত্র বিশ্বম্বর শূর নৌকাযোগে সদলবলে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে গমন কালে পথিমধ্যে বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমিশা পাড়া গ্রামের এক প্রান্তে নৌকা নোঙ্গর

৫। সানা উল্লাহ নুরী, ভুলুয়া নোয়াখালীর সভ্যতা ও রাজবংশের ইতিহাস। লক্ষীপুর বার্তা, এপ্রিল/৯৯

৬। সানা উল্লাহ নুরী -পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করে রাত্রি যাপন করেন। রাত্রি কালে তিনি নাকি স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর নৌকা যেখানে নোঙর করা ছিল, সেখানে পানির নীচে বারাহী দেবীর মূর্তি রয়েছে। সেই মূর্তি উত্তোলন করে তার পূজা করার জন্য রাজপুত্র আদিষ্ট হন। তদনুসারে রাজপুত্রের সঙ্গীরা নদী গর্ভে অনুসন্ধান করে বারাহী দেবীর প্রতিমা উদ্ধার করেন এবং যথারীতি পূজা করার জন্য মূর্তিটি নদীর তীরে স্থাপন করেন। ধর্মীয় বিধান অনুসারে যথাসময়ে পাঠা (ছাগল) বলী দিয়ে পূজা শুরু হয়। দিনটি ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। কুয়াশা অপসারিত করে অকস্মাৎ সূর্যোদয় হলে সকলে বুঝতে পারে যে তাদের দিক ভ্রান্ত হয়েছে এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও বলী দানের দিক নির্ধারণ প্রচলিত নিয়মের খেলাফ হয়েছে। যখন এই ভুল ধরা পড়ে তখন সকলেই "ভুলহুয়া" "ভুলহুয়া" বলে উচচ স্বরে চিৎকার করে উঠে। এই ভুলহুয়া ধ্বনির সংক্ষিপ্ত ও সন্ধিবদ্ধ নাম "ভুলুয়া"।[৭] কিন্তু সাংবাদিক সানা উল্যাহ নূরীর মতে 'ভুল' বাংলা আর 'হুয়া' উর্দ্দু শব্দ। এরূপ জগাখিচুড়ী কথা কেউ বলে না। তাছাড়া উর্দ্দু ভাষার তখনও জন্ম হয়নি। কাজেই এইমত আদৌ গ্রহনযোগ্য নয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জন সাধারণ বিগত ১৯৪৬ সন পর্যন্ত আমিশাপাড়া গ্রামে বারাহী দেবীর একটা প্রাচীন মূর্তির পূজা করে আসছিল। নিকটবর্তী গ্রামটি স্মরনাতীত কাল থেকে বারাহী নগর নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এসব দেখে মনে হয় কিংবদন্তীর সাথে ঐতিহাসিক সত্যের একটা ক্ষীন সূত্র জড়িত থাকতে পারে। সর্বাধিক লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, সেই বিস্মৃত অতীতে আমিশা পাড়া গ্রাম পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। নোয়াখালীর যে অংশ আজ মূল ভূখন্ড নামে পরিচিত তার মধ্যে লামচর, চরসাই, চরচামিতা প্রভৃতি গ্রামের নাম প্রমান করে যে, সেকালে সদর মহকুমার রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ থানার উত্তরাংশের অল্প পরিমান ভূখন্ড আজকের নোয়াখালী জেলার মূল ভিত্তি ছিল। লেখক এ.টি.এম.রুহুল আমিনের মতে, বিশ্বম্বর শূর রাঢ় অঞ্চলের ভুলুই নামক স্থান থেকে এই অঞ্চলে আগমন করেন বলে এ অঞ্চল ভুলুয়া নামে পরিচিত হয়।[৮] খুব সম্ভবত তিয়রী, মাগমুদ, বৈগা, পাগাচং প্রভৃতি গ্রামের ন্যায় 'ভুলুয়াও' একটি মৌলিক শব্দ।

নোয়াখালী তথা ভুলুয়া ভূখন্ডের আদি অবস্থান ছিল বর্তমান জেলা সদর মাইজদীর ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের ১২ কিলোমিটার পূর্বে। বঙ্গোপসাগর উপকূলে মেঘনা নদীর তীরে ইহা ছিল এক সুপ্রসিদ্ধ বর্ধিষ্ণু প্রাচীন জনপদ। উপকূল অঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে তাঁরা নৌযুদ্ধেও পারদর্শী ছিলেন।

নোয়াখালী নামের উৎপত্তি হয় ১৬৬০ এর দশকের শেষ দিকে। তখন আওরঙ্গজেব ছিলেন দিল্লীর শাসক। পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড় থেকে উৎসারিত ডাকাতিয়া নদীর বন্যায় সেকালে ঘন ঘন প্লাবিত হতো ভুলুয়ার উত্তর এবং পূর্বাঞ্চল। বন্যার হাত থেকে এখানকার কৃষি অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্যে কুমিল্লার ফৌজদারের তত্ত্বাবধানে ডাকাতিয়া থেকে রামগঞ্জ-সোনাইমুড়ী-চৌমুহনীর মধ্য দিয়ে একটি নতুন খাল কেটে বন্যার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। মোঘল প্রকৌশলীরা এর আগেও এ অঞ্চলে সেচের জন্য বেশ কয়েকটি খাল খনন করেছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ নতুন খাল খননের পর 'ভুলুয়া' ভূখন্ডের নতুন নাম হলো নোয়াখালী অর্থাৎ নতুন খালের দেশ। নতুন শব্দের স্থানীয় লোকজ নাম হলো 'নোয়া'। যেমন - এখানকার লোকেরা নতুন বাড়ীকে বলে

৭। খালেদ মাসুকে রসুল: নোয়াখালীর লোক সাহিত্য লোক জীবনের পরিচয়, বাংলা একাডেমী,(জুন-১৯৯২) পৃ-১৮

৮। এম আবদুল কাদের : বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত (নবদিগন্ত) জুন,১৯৮৬ পৃ-০৩।

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াবাড়ী, নতুন কাপড়কে বলো নোয়াকাপড়, নতুন বউকে বলে নোয়াবউ, নতুন বরকে বলে নোয়াজামাই।[৯] মোঘল যুগে কাটা নোয়া বা নতুন খালই এভাবে লোকমুখে নোয়াখালী অভিধা নিয়ে গোটা অঞ্চলকে অভিষিক্ত করেছে নোয়াখালী নামে।

কিন্তু এখাল খননের দুশো বছরের অধিককাল পূর্বে এই এলাকার নাম নোয়াখালী ছিল বলে যদুনাথ সরকারের আবিস্কৃত "ফুতুহাতুল ইবারিয়াতে" তাঁর প্রমান পাওয়া যায়। ১৬৬৫-৬৬ সনে নওয়াব শায়েস্তা খাঁর চাঁটগাও অভিযানে নোয়াখালী ছিল স্থল ও নৌবাহিনীর মিলিত ঘাঁটি। ফরহাদ খান ও ক্যাপ্টেন মূর তখন এখানে নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা থেকে মীর মর্তুজা এবং সন্দ্বীপ হতে ইবনে হুমায়ুন, ফরহাদ খান ও মনোয়ার খান জমিদারের নোয়াখালী গিয়ে মিলিত হয়। তৎপূর্বে প্রেরিত বুজুর্গ উন্মিদ খাঁর অগ্রবর্তী দল স্থল পথে অগ্রসর হতে এবং ইবনে হোসেন নোয়াখালী থেকে 'নাওয়ারা' (নৌবহর) সমুদ্র পথে চাটগাঁও যেতে নির্দেশ পান। সম্ভবতঃ নবাব ইসলাম খাঁর হাতে রাজা অনন্ত মানিকোর পতনের (১৬১১) পর থেকেই পূর্বনাম ভুলুয়ার পরিবর্তে এলাকাটি নোয়াখালী নামে পরিচিত হয়। অতএব, যদি কোন খাল থেকেই এর নামকরন হয়ে থাকে, তবে এই যুদ্ধের সময় আরেকটি নতুন খাল খনন করা হতে পারে।[১০]

১৮২১ সালে নোয়াখালীকে একটি পৃথক জেলা হিসাবে গঠন করলেও ভুলুয়া নামেই এ জেলা পরিচিত ছিল। ১৮২২ সনের ২৯ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রা (দ্বিতীয় হেস্টিংস) নোয়াখালীকে একটি পৃথক জেলার মর্যাদা দান করেন। কিন্তু ভুলুয়া রাজ্যের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য নব ঘোষিত জেলার নাম করন করা হয় ভুলুয়া। ১৮৬৮ সন হতে সরাসরি এ অঞ্চলের নাম করন করা হয় নোয়াখালী। বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আয়তন ৫৯৮৬ বর্গ কিলোমিটার।

<u>জনসংখ্যা</u>ঃ- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪.৫ শতাংশ এবং মোট জমির ৪.১৫ শতাংশ পড়েছে নোয়াখালীতে। বাংলাদেশের প্রতিবর্গ কিলোমিটারে বাস করে ২০১ জন লোক আর নোয়াখালীতে বাস করে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৫৭ জন। ঘন বসতিপূর্ন নোয়াখালী জেলার জনসংখ্যা ১৯০১ সনের গননা অনুযায়ী ছিল ১১,৪২,৯১২ জন, ১৯১১ সনে ১৩,০৩,৪৪১ জন, ১৯২১ সনে ১৪,৭২,৭৮৬, ১৯৩১ সনে ১৭,০৬,৭১৯, ১৯৪১ সনে ২২,১৭,৪০২, ১৯৫১ সনে ২০,৭৩,৩৮০, ১৯৬১ সনের গননা অনুযায়ী ২৩,৮৩,১৪৫, এবং ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০২ জন। ১৯৮১ সনের সরকারি গননা অনুযায়ী লোক সংখ্যা দাড়ায় ৩৮,১৬,০২০ জন এবং সর্বশেষ ১৯৯১ সনের গননা অনুযায়ী এই সংখ্যা দাড়ায় ৪৬,২৫,৭৬৭ জনে এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৯৯ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১২ শতাংশ।[১১]

<u>যাতায়াত ব্যবস্থা</u> ঃ- রাস্তা ঘাটের দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই নোয়াখালী বাংলার অন্যান্য জেলার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। এর অন্যতম কারন শুরু থেকেই এ অঞ্চলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পূর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নোয়াখালীর লক্ষীপুরে একটা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। এ বাণিজ্য কুঠির অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে পাটের

৯। সানা উল্লাহ নূরী : ভুলুয়া নোয়াখালীর সভ্যতা ও রাজবংশের ইতিহাস।

১০। ডঃ এম, আবদুল কাদের ; বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত (স্মরনিকা-নবদিগন্ত) জুন,১৯৮৬। পৃ-০২

১১। Bangladesh population cencus Report 1991 & Statistical year book Bangladesh-1996.

Dhaka University Institutional Repository

হাট এবং চৌমুহনী ও দাঁগনভুইয়ার মধ্যবর্তী কৈল্যান্দীতে ছোট ছোট দুটি কুঠি ছিল। যুগীদিয়াতে ছিল ফরাসীদের কুঠি। নোয়াখালী থেকে ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে লক্ষ্মীপুরগামী রাস্তার পার্শ্বে ছিল কেন্দ্রীয় লবন কুঠি। এ সমস্ত বাণিজ্য কুঠি কোম্পানীর নির্মিত রাস্তা ঘাটের দ্বারা পরস্পর যুক্ত ছিল।[১২]

১৭৯০ সনে রেনেলের মানচিত্রে জেলার রাস্তাঘাটের বিবরণ দেয়া আছে। অষ্টাদশ শতকে নোয়াখালী জেলায় সড়ক পথ ছিল খুবই সামান্য। চাঁদপুর থেকে রায়পুর - লক্ষ্মীপুর হয়ে একটি রাস্তা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তাও এ রাস্তায় যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য।[১৩] ১৭৯৪ সনের থমাস পার (Tomas Parr) এর রির্পোট থেকে জানা যায় যে, বর্ষাকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতো খারাপ হতো যে, ১০ মাইলের (১৬ কিঃ মিঃ) বেশী রাস্তা যাতায়াতের উপযুক্ত থাকতো না। ১৮১৯ সনের কর্নেল শের উড় (Colonel Sher Wood) এর রির্পোট থেকে জানা যায় বর্ষাকালে চট্টগ্রাম-দাউদকান্দি সড়ক ছিল অনতিক্রম্য।[১৪]

১৮৫৫ সনের পর থেকে ইংরেজ সরকার নোয়াখালীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে নজর দেয় এবং কিছু মঞ্জুরীও প্রদান করে। ১৮৫৬-৫৭ সনে ১২,৪০০ টাকা এবং পরের বৎসর আরও ৫০০০ টাকা রাস্তার উন্নয়নের জন্য বরাদ্ধ করা হয়। এর বেশীর ভাগ টাকা সেতু তৈরীতে ব্যয় হয়। ১৮৭২-৭৩ সনে সড়ক যোগাযোগ ২২৬ মাইলে (৩৬২ কিঃ মিঃ) উন্নীত করা হয় এবং ১৫ টি সেতু নির্মিত হয়। ১৯০৪ সালে ছোট বড় কাঁচা পাকা সড়ক পথের দৈর্ঘ্য দাড়ায় ৫৬২ মাইলে (৮৯৯ কিঃ মিঃ) এবং ১৯১৯ সনে ৭৮১ মাইলে (১২৫০ কিঃ মিঃ) উন্নীত হয়।[১৫]

১৯৬৯ সনের জুন মাস পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা বোর্ডের অধীনে কাঁচা ও পাকা সড়কের পরিমান ছিল ৮৮২ মাইল (১৪১০ কিঃ মিঃ)। এর মধ্যে ৮৩৮ মাইল (১৩৪০ কিঃ মিঃ) কাঁচা এবং ৪৪ মাইল (৭০ কিঃ মিঃ) পাকা। ১৯৯৬ সনে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার মোট সড়ক পথের পরিমাণ ৪৬২ মাইল (৭২০ কিঃ মিঃ)। এর মধ্যে ২০০ মাইল (৩২০ কিঃ মিঃ) পাকা রাস্তা, ৮০ মাইল (১২৮ কিঃ মিঃ) আধা-পাকা রাস্তা এবং ১৮২ মাইল (২৯১ কিঃ মিঃ) কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আর নদী পথে রয়েছে চাঁদপুর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ৯৬ মাইল (১৫৪ কিঃ মিঃ) নৌপথ। মাতামুহুরী ৬০ মাইল (৯৬ কিঃ মিঃ), ডাকাতিয়া নদীতে ১৭ মাইল (২৭ কিঃ মিঃ) এবং ফেনী নদীতে ৪০ মাইল (৬৪ কিঃ মিঃ) নৌপথ, খাল রয়েছে প্রায় দেড়শত কিঃ মিঃ। বর্ষাকালে নৌপথের পরিমান আরো বেড়ে যায়। এছাড়াও গ্রামে বহু ছোট খাট পায়ে হাটার পথ রয়েছ। এসকল পথে গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ীও চলাচল করে। রেলপথ রয়েছ প্রায় ২০ মাইল (৩২ কিঃ মিঃ)।[১৬]

১২। W.H. Thomson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Noakhali,
১৩। নুরুল ইসলাম খান (সি,এস,পি) সম্পাদিত, জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী, পৃঃ-১৪১।
১৪। পূর্বোক্ত।
১৫। পূর্বোক্ত।
১৬। Statistical year book of the 1996.

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি ব্যবস্থাঃ- নোয়খালী জেলার ভূমি ব্যবস্থা আলোচনায় জেলার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক অর্থাৎ ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার কথা এসে যায়। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে ছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বিভিন্ন সময়ে ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে অনুমান করা যায় যে, রাজা বা রাষ্ট্র দেশের সমস্ত ভূমির মূল স্বত্তাধিকারী এবং মূল মালিক দুটোই ছিলেন। সমাজের ক্রম বিবর্তনের ফলে এই চেতনাই বিকাশ লাভ করে যে, রাজা বা রাষ্ট্রই সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান অংশ। গুপ্ত যুগের যে কয়টি লিপি পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় যে ভূমি বিক্রেতা হচ্ছেন রাজা বা রাষ্ট্র এবং বিক্রিত ভূমি ধর্মাচারনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হতো বলে রাজা দান পূন্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হতেন। রাজা আদায়কৃত অর্থের দ্বারা প্রজাদের নিরাপত্তা ও যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। রাজস্ব ও কর আদায়ের জন্য রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত সকল স্তরে রাজার কর্মচারী নিয়োজিত থাকত।[১৭]

হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে সুলতানী আমলের শাসকেরা অনুসরন করেন। ১২০৫ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত সুলতানী আমলে তদানীন্তন বাংলাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগকে এক একজন আমীরের অধীনে আনা হয়েছিল। প্রথম দিকে এসমস্ত বিভাগকে 'ইক্‌তা' এবং বিভাগের শাসন কর্তাকে 'মুক্‌তা' বলা হতো। ১৫৩৮ সনের দিকে বাংলা ক) লখনৌতি খ) সোনার গাঁও গ) সাতগাও নামে তিনটি ইক্‌তায় বিভক্ত ছিল বলে জানা যায়। মুঘলবাদশা আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল ১৫৮২ সনে তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি সমগ্র বাংলাকে মোট ১৯ টি সরকার এবং ৬৮২ টি মহলে বিভক্ত করেন। টোডরমলের রাজস্ব তালিকা অনুসারে সুবাহ বাংলার সরকার গুলি হলো (১) টান্ডা (২) লখনৌতি (৩) ফতেহাবাদ (৪) মাহমুদাবাদ (৫) খলিফাবাদ (৬) বাকলা (৭) পূর্ণিয়া (৮) তাজপুর (৯) ঘোড়াঘাট (১০) পাঞ্জরা (১১) বারবকাবাদ (১২) বাজুহা (১৩) সোনারগাঁও (১৪) শ্রীহট্ট (১৫) চাটগাঁও (১৬) শরীফাবাদ (১৭) সোলায়মানবাদ (১৮) সাত গাঁও (১৯) মান্দারন।[১৮] (পরে ১৬১৮খৃঃ) ত্রিপুরা রাজ্য বিজিত হলে উদয়পুর নামে আরও একটি সরকার গঠিত হয়। ভুলুয়া তথা নোয়াখালী জেলা ছিল সোনারগাঁও সরকারের অধীনে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমগ্র বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলা অঞ্চল তখনও বাদশা আকবরের অধিকারে আসেনি এবং এ এলাকা সে সময় বাংলার বার ভূইয়াদের অধিকারে ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় পূর্ব বাংলা মোঘলদের অধিকারে আসে। মোঘল আমলে ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের সর্ব্বোচ্চ কর্তার পদবী ছিল "দিওয়ান" এবং তিনি সরাসরি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। 'কানুনগো' ও 'পাটওয়ারীর' সাহায্যে আমিন পরগনার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। ঐতিহাসিক আব্দুল ফজল "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে ১৫৮২ সনে প্রথম মোঘল বন্দোবস্তে নোয়াখালী তথা ভুলুয়া পরগনার

১৭। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (কলকাতা) পৃঃ ২১০।
১৮। আ.কা.মো. যাকারিয়া-কুমিল্লা জেলার ইতিহাস পৃঃ ২৮৮-২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেছেন। সেখানে ভুলুয়া, জগদিয়া, দানদেরা ও সন্দ্বীপ পরগনার রাজস্বের নিম্নরূপ হার উল্লেখ করা আছে।[১৯]

সরকার সোনার গাঁও	রাজস্ব
১। ভুলুয়া	- ১৩,৩১,৪৮০ ডেম বা ৩৩,২৮৭ টাকা
২। জগদিয়া	- ৫,১২,০৮০ " বা ১২,৮০২ "
৩। দানদেবা	- ৪,১২,৩৮০ " বা ১০,৩০৯ "
৪। সন্দ্বীপ	- ১১,৮২,৪৫০ " বা ২৯,৫৬১ "
	মোট=৩৪,৩৮,৩৯০ ডেমা বা ৮৫,৯৫৯ টাকা

তবে এসময় ভুলুয়া সংলগ্ন কিছু পরগনা তখন ত্রিপুরা রাজাদের অধীনে ছিল।

রাজা টোডরমলের জরিপ ও রাজস্ব ব্যবস্থা ১০ বছরের জন্য প্রবর্তিত হলেও এ ব্যবস্থা ১৬৫৮ সন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপর বাংলার সুবাদার শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০) বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পুর্ণগঠন করেন। ১৭২২ সনে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁন রাজস্ব তালিকা পুণরায় সংস্কার ও পুণগঠন করেন। তিনি সমগ্র সুবা-ই বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেন। চাকলা গুলো ছিল- বন্দর, বালাশোর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী বা সাতগাঁও, ভূষনা, যশোর, ঘোড়া ঘাট, কড়িবাড়ি, আকবর নগর, জাহাঙ্গীর নগর, শ্রীহট্ট এবং ইসলামাবাদ।

১৭২৮ সনে জেমস্ গ্রান্ট (James Grant) তাঁর নেয়াবত অব ঢাকা (Neabat of Dacca) রির্পোটে নোয়াখালীর যে পরগনা গুলোর উল্লেখ করেছেন তাহল- সরকার সোনার গাঁও এর অধীনে দানদেরা, ভুলুয়া, এলাহাবাদ, বাবুপুর, জগদা, কাঞ্চনপুর এবং সরকার ফতেহাবাদের অধীনে সন্দ্বীপ। মোট রাজস্বের পরিমান ছিল ১,৫২,৯৪৮ টাকা।[২০]

১৭৬৫ সনে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তির পর থেকে নোয়াখালী জেলা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে আসে। তারা পুরনো পদ্ধতি বহাল রেখে ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিয়োগ করেন। ১৭৭২ সনে সুপারভাইজার কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ পান। বারটন (Barton) লক্ষীপুর, ভুলুয়া ও অন্যান্য পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পান। তারপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমি সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সর্বশেষ ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমির মালিকানা জমিদারদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৮২১ সনে স্যার ওয়াল্টার (Sir Walter) এর সুপারিশ অনুযায়ী নোয়াখালীকে ত্রিপুরা থেকে পৃথক করা হয় এবং প্লাউডেন (Plowden) হচেছন নোয়াখালী জেলার প্রথম কালেকটর।

ইংরেজ আমলের পূর্বে নোয়াখালী তথা ভুলুয়া পরগনার মালিকানা ছিল প্রাচীন শূর পরিবারের হাতে। ১৭৮১ সনে প্রথম এই জমিদারী বিভক্ত হয়। বারো আনা অংশের ৮.৭৫ অংশের মালিক ছিলেন শূর রাজাদের বংশধর ধর্ম নারায়ন, প্রসন্ন নারায়ন ও কল্যান নারায়ন। শূর রাজবংশের কোন এক রানীর সুনজরে পড়ে ছিলেন বিক্রমপুর নিবাসী জনৈক নর নারায়ন রায়। তিনি রানীর অনুগ্রহে দেওয়ান পদে উন্নীত হয়ে বারো

১৯। নুরুল ইসলাম খান (সি,এস,পি) সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী, পৃঃ ২৪৫।
২০। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আনা জমিদারীর বাকী অংশের মালিক হন। বাকী চার আনা অংশের ২.৭৫ আনার মালিক ছিলেন অন্য এক দেওয়ানের বংশধর শিবচন্দ্র। চার আনা অংশের বাকী সামান্য অংশের মালিক ছিলেন মাইজদীর চৌধুরী পরিবার। ভুলুয়া পরগনার বাকী ১.২৫ অংশের মালিক ছিলেন নর নারায়ন আর বীর নারায়ন। এই ১.২৫ অংশ ১৭৮৫ সালে নিলামে উঠলে ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান, পাইকপাড়া রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ তা গঙ্গা নারায়ন রায়ের নামে খরিদ করেন। ১৮৩৫ সনে সমগ্র ভুলুয়া পরগনা খাজনা বাকীর দায়ে নিলামে বিক্রি হলে পাইক পাড়ার রাজা নারায়ন সিংহ সমগ্র পরগনা দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট থেকে খরিদ করে নেন। রাজা নারায়নের দুই দত্তক পুত্র ইশ্বর চন্দ্র ও প্রতাপ চন্দ্রর মৃত্যু হলে জমিদারী কোট অব ওয়ার্ডের হাতে ন্যাস্ত হয়। ১৮৯৪ সনে পারিবারিক বন্টনের মাধ্যমে নোয়াখালীর সমুদয় জমিদারীর এক চেটিয়া মালিক হয় কুমার ইন্দ্র চন্দ্র। এর বংশধরগন সরকারি খাস সম্পত্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত ভুলুয়া পরগনার মালিক ছিলেন।

ভুলুয়া পরগনা খন্ডিত হয়ে আরো অনেক গুলো পরগনা গড়ে উঠে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বাবু খান নামে একজন অবাঙ্গালী ঢাকায় মোঘল সরকারের নিকট থেকে ভুলুয়া পরগনার একাংশ বন্দোবস্ত নেন। তিনি শূর পরিবারের কর্মচারী ছিলেন। তার নামানুসারে এই পরগনার নামকরন হয় বাবুপুরা পরগনা । তিনি নিঃসন্তান আবস্থায় মারা গেলে এর মালিক হন এ বংশের মহেশ নারায়ন চৌধুরী। তাঁর মৃত্যু পর উত্তরাধিকর দ্বন্দ শুরু হয় যা চৌধুরীর লড়াই নামে নোয়াখালীতে লোকমুখে আজও পরিচিত। পরবর্তীতে ১৮৬৩ সনে এ জমিদারীর একাংশ ক্রয় করে নতুন মালিক হন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নন্দন রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর। কিছু অংশ ক্রয় করেন কুমিল্লার মোঃ কামেল চৌধুরী এবং কিছু অংশ সরকার খাস ঘোষনা করেন[২১]।

১৮৮৫ সলে প্রজাসত্ব আইন পাশ হয় এবং দখলদারী সত্বের ভুল ত্রুটি সংশোধন করা হয়। এই আইন দ্বারা প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়। ফলে জমিদারদের ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। এর পরও বিভিন্ন কমিশন গঠন করে ভূমি ব্যবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হয়। জমিদারী প্রথার দোষ ত্রুটির কারণে ১৯৫০ সনে আইন পরিষদ পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাসত্ব আইন পাশ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটানো হয়। বর্তমানে জেলা প্রশাসক তাঁর সহকারীদের সাহায্যে জেলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ- বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর। বিগত এক শতাব্দীতে এর কোন পরিবর্তন হয়নি। এখন পর্যন্ত কৃষিই বেশীর ভাগ অধিবাসীর আয়ের প্রধান উৎস ও কর্মসংস্থানের উপায়। উপনিবেশিক শাসনামলে এবং পরবর্তীতেও নোয়াখালীত উল্লেখযোগ্য ভারী শিল্প করাখানা গড়ে উঠেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। নোয়াখালী টেক্সটাইল মিল, ডেল্টা জুট মিল, দুলা মিয়া কটন মিল, রায়পুরে ফিস হ্যাচারী কমপ্লেকস্ স্থাপিত হলেও নোয়াখালীর আর্থ সামাজিক ও জীবন যাত্রার উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীতে রাজধানী কেন্দ্রিক একটি ব্যবসায়ী-শিল্পপতি শ্রেনী গড়ে উঠলেও নোয়াখালীতে এদের বিনিয়োগ খুবই কম। উপরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আবাদী জমির পরিমান কমে যায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২১। খালেদ মাসুকে রসুল: নোয়াখালীর লোক সাহিত্যে লোক জীবনের পরিচয় পৃঃ ২৩-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট তথা কৃষি উন্নয়নের দিক থেকে বৃহত্তর নোয়াখালীর অবস্থান বর্ণনা করে নোয়াখালী জেলার কৃতি অর্থনীতিবিদ ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বৃহত্তর নোয়াখালীর আর্থ সামাজিক অবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর উন্নত মানব সম্পদ। শিক্ষার প্রসার ও উচচ শিক্ষিতের সংখ্যার বিচারে নোয়াখালী বেশ অগ্রগামী। বিশেষ করে মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার জাতীয় গড় হারের তুলনায় অনেক বেশী। তবে কৃষির উন্নয়নের দিক থেকে নোয়াখালীর অর্থনীতি অনেকটা পিছিয়ে আছে। কৃষি জমিতে আধুনিক সেচ বা উচচ ফলনশীল ধান চাষ এখানে তেমন প্রসার লাভ করেনি। ১৯৯২-৯৩ সনের হিসাব থেকে দেখা যায় প্রতি একরে শস্য উৎপাদন থেকে প্রকৃত আয় হয়েছিল নোয়াখালীতে প্রায় ৮,৫০০ টাকা, বৃহত্তর কুমিল্লার প্রায় ১৬,০০০ টাকা, বৃহত্তর চট্টগ্রামে ১৩,০০০ টাকার বেশী এবং সমগ্র বাংলাদেশে গড়ে প্রায় ৯,৫০০ টাকা। মাথা পিছু গোবাদি পশুর সংখ্যাও নোয়াখালীতে দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। কাজেই কৃষির অনগ্রসরতা দুরীকরণে এঅঞ্চলে আরো বিনিয়োগ ও সরকারি সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।[২২]

কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারনে নোয়াখালী জেলার লোকেরা কর্মসংস্থানের জন্য অধিকহারে বিদেশে চলে যায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়ও বসতি স্থাপন করেছে। অনেকে তাই কৌতুক করে বলেন, পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে নোয়াখালীর লোক জন নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, নোয়াখালীর অধিবাসীরা অত্যান্ত পরিশ্রমী। তাই আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে এ জেলা সম্পর্কে হান্টারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "জেলার অধিকাংশ জনগন ছিল কৃষিজীবি। এমনকি জেলার ছোট খাট ব্যবসায়ী ও চাকুরী জীবিগন প্রায় সকলে সাধারণ সাংসারিক প্রয়োজনে সম্পূরক আয়ের ব্যবস্থা হিসাবে নিজেরাই কিছু না কিছু জমি চাষ করত অথবা বর্গায় আবাদ করিয়ে নিত।" তবে নোয়াখালীর কৃষকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ হচেছ বিনা পরিশ্রমে নারিকেল ও সুপারী চাষ করা। কিন্তু উপকুলবর্তী জেলা হওয়ার কারনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায়ই ধবংস হয়েছে নোয়াখালী জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা। তারপরও উইলিয়াম হান্টার এবং জে.ই. ওয়েবস্টার (W.W.Hunter & J.E. Webster) তাদের রির্পোটে উনিশ ও বিশ শতকের নোয়াখালী জেলার যে অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায় অতীতে নোয়াখালীর অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে খারাপ ছিলনা। তারা উল্লেখ করেন- " In 1905 the callector reported that scarcity was unknown is the District and the pinch of poverty felf only by a small proportion of the population. The pepole, he said, ware very back ward and wanting in enterprise and their standerd of living though rising slowly, was still lower than that other parts of Bengal. They were better clothing than formerly, used more oil in their coocking and buy small articles of luxury, lamps and various fancy goods and utensils."[২৩]

নোয়াখালীর অধিবাসীগন সমুদ্র যাত্রায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সে কারনে দেশী বিদেশী জাহাজে তারা নাবিক হিসাবে চাকুরী নিয়েছেন বহু আগ থেকে। থমসন (Thomson) অনুমান করেন সম্ভবতঃ পর্তুগীজ জলদস্যুরা কোন কারনে স্বদেশ থেকে

২২। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ: কৃষির অনগ্রসরতা দুরীকরনে বৃহত্তর নোয়াখালীতে আরো বিনিয়োগ ও সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার -লক্ষীপুর বার্তা (জুলাই-১৯৯৭)

২৩। নুরুল ইসলাম খান (সি,এস,পি) সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী, (১৯৭৭) পৃঃ ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত নোয়াখালীর লোকেরা অলসতাকে ঘৃনা করে। পরিশ্রম করে মাটিতে সোনা ফলায়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ নোয়াখালীতে কম। বর্ষা মৌসুমে বা যখন কোন কাজ থাকেনা তখন তারা রোজগারের উদ্দেশ্যে শহরে চলে আসে। অনেকে ছোট খাট ব্যবসাও করে। বর্তমানে অধিক জনসংখ্যা ও বেকারত্ব বৃদ্ধির কারনে অনেকে বিদেশে পাড়ি জমাচেছ। জনসংখ্যার বহিঃগমনের হার নোয়াখালীতে সম্ভবত বেশী এবং এই হার প্রায় ১৭.৫০ শতাংশ[২৬]। এর ফলে এ অঞ্চলের উদ্বৃত্ত জনশক্তির চাপ যেমন কিছুটা লাঘব হয়েছে, তেমনি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই জনশক্তি বিরাট অবদান রাখছে। ফলে বর্তমানে নোয়াখালী জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচেছ। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার কারনে আবাদী জমির উপর বেশী চাপ পড়ছে এবং দক্ষ শ্রমিকের স্থানান্তর ঘটছে। The District cencus Report of Noakhali (1961) recorded, "Due to heavy density of population in this District the Pressure of population on land is very high . As a result there had been some migrations from this District to other Districts- - - - - - - - - - - - A good number of inhabitants of this district can be found all over the world particularly as sailors, calony of Noakhali people has sprung up in for off places like london and Saudi Areabia."[২৭]

যেখানে ১৮৮১সনে নোয়াখালীর লোকসংখ্যা ছিল ৮,২১,০০০ জন তা ১৯৬১ সনে বেড়ে দাঁড়ায় ২৩,৮৩,০০০ জনে। মাত্র ৮০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ২০০% এর ও বেশী। বর্তমানে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে বাস করে ৮৯৯ জন যাহা দেশের সর্বোচছ ঘনবসতি পূর্ন এলাকা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ। তবে নোয়াখালী জেলাতে অন্যান্য জেলার মত আর্থিক বৈষম্য খুবই কম। কোন কোন জেলাতে যেমন জোতদার শ্রেনী এবং ভূমিহীন শ্রেনীর প্রাধান্য বেশী, তেমনি মধ্যবিও ও নিম্নমধ্যবিত্তের অনুপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। নোয়াখালীতে উচচবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেনীর অবস্থানের কারনে গ্রামীন জীবনে আর্থিক বৈষম্য খুবই কম। তবে দিন দিন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি নোয়াখালীবাসী আর্থিক স্বচছলতা বৃদ্ধির জন্য যে সকল সহায়ক পেশা গ্রহন করে থাকে তাহল-শিক্ষকতা, ছোটখাট চাকুরী, ব্যবসা, মৎস চাষ, পরিবহন শ্রমিক, কুটির শিল্প। স্বাধীনতার পর সরকার গ্রামীন অর্থনীতির অবকাঠামো পরিবর্তনের লক্ষে কৃষি ঋণ কর্মসূচী চালু করেছেন। B.R.D.B, DANIDA, CARE প্রভৃতি বিদেশী এন.জি. ও এর পাশাপাশি বর্তমানে গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাক, আশা, প্রশিকা, ক্রেড প্রভৃতি দেশী এন. জি. ও. গ্রামীন অর্থনৈতিক অবকাঠামো পরিবর্তনে সহায়তা করছে।

ইতিহাসঃ- বঙ্গোপসাগরের সৈকত ভূমিতে ব-দ্বীপাকারে বেশ কয়েকটি জেলা গড়ে উঠেছে। সে জেলাগুলোর সর্বশেষ প্রান্তে ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র লীলাভূমি আধুনিক নোয়াখালী। বেগবতী মেঘনা নদীর সঙ্গম স্থল থেকে এজেলা উত্তর দিকে বিস্তৃত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এর আদি নাম ছিল ভুলুয়া। ভুলুয়া ছিল প্রাচীন ব-দ্বীপ সমতট অঞ্চলের একটি অংশ। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে এ অঞ্চলে সু-পরিকল্পিতভাবে মানব বসতি শুরু হয় (খৃঃ পুর্ব ৫০০০ অব্দে)। কিন্তু ঐযুগে কারা প্রথম এখানে বসবাস শুরু

২৬। জনসংখ্যা রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো বহির্গমন একক, এপ্রিল ১৯৯৯ ইং।

২৭। নুরুল ইসলাম খান (সি,এস,পি) সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী, পৃঃ ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল তার সঠিক বিবরণ এবং সুস্পষ্ট ধারাবাহিক কোন ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় না। তখন এ অঞ্চল বৈদিক সংস্কৃতি বর্হিভূত এলাকা বলে বিবেচিত হতো। মহাভারতের বর্ণনানুসারে ভীম সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের শাসন কর্তাদের নিকট হতে মুল্যবান রত্ন সম্পদ আদায় করেন।

ময়নামতি এবং পার্বত্য ত্রিপুরার উচুস্থান গুলোর ভূগর্ভে প্রাপ্ত প্রচুর নিদর্শন সমুহ ভুলুয়ার প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরে। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত (৩৪০-৩৮০) এর সময়ে নির্মিত এলাহাবাদ স্তম্ভ খোদিত লিপি থেকে জানা যায় সমতট ভূখন্ডের অর্ন্তগত ভুলুয়া অঞ্চল ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদরাজ্য। এর প্রমান হচেছ ৫০৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বৈন্য গুপ্ত এই এলাকার শাসক ছিলেন এবং দাতব্য কাজে এ জেলায় অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর ভুমি দান করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ছিলেন একজন শাসক। পরে গুপ্ত রাজাদের দূর্বলতার সুযোগে তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এর প্রমান মিলে ১৮৮ গুপ্তসনের (৫০৭-০৮) গুনাইগড় তাম্রশাসনে। এই তাম্র শাসন দ্বারা দ্বাদশাদিত্য উপাধিধারী মহারাজা বৈন্য গুপ্ত ত্রিপুরা জেলায় ভুমি দান করিয়াছেন। তাহার রাজধানী শ্রীপুর সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। সম্ভবত বৈন্য গুপ্ত গুপ্তরাষ্ট্রেরই সামন্ত রাজা রূপে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করিতেন, পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[২৮]

গুপ্ত শাসনের পতনের পর সমতট তথা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বা বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। ফরিদপুরের কোটালি পাড়ায় প্রাপ্ত পাঁচখানি, বর্ধমান জেলার মল্লসারুলে প্রাপ্ত একটি এবং বালেশ্বর জেলার জয়রামপুরে প্রাপ্ত একটি মোট সাতটি তাম্রশাসনে দেখা যায় সমতট তথা বঙ্গের তিনজন শাসক ভুলুয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেন। এরা হলেন মহারাজ গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। বৈন্যগুপ্তের গুনাইগড় তাম্র শাসন হতে অনুমান করা হয় যে, বৈন্যগুপ্তের পরই অর্থাৎ ষষ্ঠশতকের দ্বিতীয় দশকে, মহারাজা গোপচন্দ্র বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেইমতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেবের শাসনকাল ৫২৫-৬০০ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ছিল বলে ধরা হয়।[২৯]

সপ্তম শতকের দিতীয়ার্ধে যখন মগধ ও গৌড়ে গুপ্তবংশীয় রাজাগন প্রভুত্ব স্থাপন করেন তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়গ বংশের (৬৫০-৭০০) উত্থান ঘটে। ঢাকা জেলার আশরাফপুরে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন ও কুমিল্লার দেউলবাড়ীতে প্রাপ্ত একখানি মূর্তিলিপি হতে খড়গোদ্যম, জাতখড়গ ও দেব খড়গ নামে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের ধারনা এই তিনজন রাজা ৬৫০-৭০০ সনের মধ্যে সমতট এবং ভুলুয়া শাসন করতেন। তাঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত-বসাক। কুমিল্লা জেলার বড় কামতাই সম্ভবত কর্মান্ত-বসাক। লোক নাথের ত্রিপুরা তাম্র শাসন ও শ্রীধারন রাটের কৈলান তাম্রশাসন হতে আমরা দুই সামন্ত রাজবংশের অবস্থিতি জানতে পারি। উভয় সামন্ত রাজবংশ ত্রিপুরা নোয়াখালী অঞ্চলে সামন্ত রাজা হিসাবে শাসন করত এবং পরে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করেন। খুব সম্ভবত খড়গ রাজাগনই তাদের অধিকর্তা ছিলেন।[৩০]

২৮। Abdul Momin Chowdhury, The Dynastic History of Bengal. Page-1-7.
২৯। পূর্বোক্ত।
৩০। আঃ রহিম ও অন্যান্য বাংলাদেশের ইতিহাস। পৃঃ ১১৩-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

খড়গবংশের শাসনের পর অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে সমতট অঞ্চলে দেব রাজবংশের উদ্ভব হয়। তিনখানি তাম্র শাসনও কিছু সংখ্যক মুদ্রা হতে দেব রাজবংশের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড় সংলগ্ন শালবন বিহার খননকালে দুটি তাম্র লিপি এবং কয়েকটি মুদ্রায় অংকিত লিপিতে দেব রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আধুনিক গবেষকদের মতে ভুলুয়া তথা বৃহত্তর নোয়াখালীর সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল দেব বংশের রাজাদের শাসন। এই বংশের চারজন রাজা- শ্রী শান্তি দেব, শ্রী বীর দেব, শ্রী আনন্দ দেব ও শ্রী ভবদেব ৭৫০-৮০০ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন।[৩১]

পালবংশের উত্থানের প্রাক্কালে সমতট ভূখন্ডে কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের শাসন ছিল। এঁরা হরিকেল তথা বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় রাজত্ব করতেন। মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব ছিলেন হরিকেল রাজবংশের প্রথম রাজা। দশম শতকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ও সমতটে হরিকেল রাজবংশকে পরাভূত করে চন্দ্রবংশীয় রাজারা ক্ষমতায় আসেন। এরা ত্রিপুরা, ভুলুয়া অঞ্চলে সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ময়নামতিতে প্রাপ্ত তিনখানি, ঢাকায় প্রাপ্ত একখানি ও সিলেটের পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হতে এই বংশের শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়। চন্দ্র রাজাদের প্রাপ্ত লিপি সমূহ ও সমসাময়িক অনান্য তথ্য হতে চন্দ্রবংশের তালিকা ও চন্দ্র রাজাদের কাল নির্নয় করা সম্ভব-তবে প্রথম দুজন রাজা পূর্ন চন্দ্র ও সুবর্ন চন্দ্রের রাজত্ব কালের সঠিক সময় জানা যায় না। পরের পাঁচ জন রাজা ছিলেন ১। ত্রৈলোক্য চন্দ্র (৯০০-৯৩০) ২। শ্রীচন্দ্র (৯৩০-৯৭৫) ৩। কল্যানচন্দ্র (৯৭৫-১০০০) ৪। লড়হচন্দ্র (১০০০-১০২০) ও ৫। গোবিন্দ চন্দ্র (১০২০-১০৪৫)। এই পাঁচজন রাজা এঅঞ্চলে ১৭৫ বছর রাজত্ব করেন। এগার শতকের শেষের দিকে বর্মরাজবংশ এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। এর প্রমান মেলে ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত ভোজ বর্মার তাম্র শাসনে।

দ্বাদশ শতকে উত্তর বাংলায় সামন্ত চক্রের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে পাল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে সেন বংশের রাজারা ক্ষমতা সঞ্চয় করতে থাকে এবং পাল বংশের শেষ রাজা মদন পালের সময় (১১৪৩-১১৬১) তারা একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তাঁরা সমতট তথা দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হতে বর্মদের বিতাড়িত করে এবং উত্তর পশ্চিম বঙ্গ থেকে পাল শাসনের অবসান ঘটিয়ে সম্ভবত সেনরাই প্রথম সমগ্র বাংলার উপর একচছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। বিজয় সেনই প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মরাজ বংশের ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে সেন প্রভুত্ব ঐ অঞ্চলে বিস্তার করে। বল্লাল সেনের আমলে কুমিল্লা, ভুলুয়া অঞ্চলে সেন বংশের শাসন সুদৃঢ় হয়। নৈহাটি তাম্র শাসন, সানোখর লিপি এবং বল্লাল চরিত্র কাব্য গ্রন্থ থেকে ভুলুয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে তাঁর আধিপত্যের কথা জানা যায়।

সেন রাজবংশের আমলে মেঘনার পূর্ব তীরবর্তী ভুলুয়া অঞ্চলে স্বাধীন দেব রাজাদের উত্থান লক্ষ্য করা যায়। দামোদর দেব ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এরা ১১৪২ তথা ১২০৪ সনের দিকে ক্ষমতায় আসেন বলে অনুমান করা হয়। লক্ষন সেনের রাজত্বের শেষ দিকে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিশৃংঙ্খলার সুযোগে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আরও কিছু সামন্ত ভূস্বামী স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। ময়নামতিতে প্রাপ্ত বনবংকমল্ল হরিকেল দেবের তাম্র শাসনে ত্রিপুরা-ভুলুয়ায় অধিষ্ঠিত এই স্বাধীন রাজবংশ গুলোর

৩১। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[৩২] ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভুলুয়ার দেব বংশের রাজা দশরথ দেব সর্বশেষ সেন রাজাকে উৎখাত করে বিক্রমপুরে আধিপত্য বিস্তার করেন। বিক্রমপুরের আদাবাড়ি তাম্র শাসন হতে দশরথ দেব নামক এক রাজার নাম পাওয়া যায়, যিনি পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ, দনুজমাধব উপাধি ধারন করেছিলেন। খুব সম্ভবত দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন তাঁর বাংলা অভিযান কালে "রায় দনুজ" নামক যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজার সহিত সন্ধি করেছিলেন তিনিই এই দশরথদেব।[৩৩] সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এয়োদশ শতকের দ্বিতীর্য়াধে সেনরাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া যে দেব রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বিক্রমপুর, ভুলুয়া, ত্রিপুরা ও সমতট তথা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়, এই দেব রাজবংশই এই অঞ্চলের শেষ হিন্দু রাজ বংশ। কারণ এয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চর্তুদশ শতাব্দীর শুরুতেই এই অঞ্চলে মুসলিমদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

বাংলায় মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নায়ক তুর্কী অভিযানকারী ইখ্তিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি। তবে বখতিয়ারের বিজয়ের বহু পূর্ব হতে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সহিত আরব দেশীয় মুসলিমদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কোন কোন গবেষকের মতে বখতিয়ারের বিজয়ের পূর্ব হতে বাংলার সহিত আরব মুসলিমদের কেবল মাত্র বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিলনা, বাংলার কোন কোন জায়গায় মুসলিম বসতিও ছিল। অনেকে আবার মুসলিমদের রাজনৈতিক আধিপত্যের কথাও বলেছেন। আরব বণিকরা যে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলে পন্য দ্রব্য কেনাবেচা করত এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে বখতিয়ার খলজি যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করেননি তার প্রমান পাওয়া যায়। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি কর্তৃক বঙ্গ(দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) হতে কর আদায় করে থাকতে পারেন বলে অনুমান করা হয়। ১২২৬-২৭ সনের পূর্বে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। হরিমিশ্রের কুলজী গ্রন্থ কারিকায় জানা যায় যে, লক্ষন সেনের পুত্র কেশব সেন 'যবন রাজার' ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত ছিলেন এবং তিনি গৌড় রাজ্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে ইওজ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমন করে কর আদায় করতে সক্ষম হলেও হতে পারেন।[৩৪] কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অর্থাৎ উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নাই।

ইওয়াজ খলজির মৃত্যুর পর বাংলার মুসলিম রাজ্য দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের (১২২৭-১২৮৭) সময়কার বাংলার ইতিহাস খুবই তাৎপর্য পূর্ন। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের দূর্বলতার কারণে বাংলার মুসলিম শাসন কর্তারা বারংবার বিদ্রোহী হবার প্রবনতা এই সময় লক্ষ্য করা যায়। এমনি একজন তুঘরল তুঘান। দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের প্রতিনিধি হিসাবে তুঘরল বাংলার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দূর্বলতার সুযোগে তুঘরল বিদ্রোহ করে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুলোতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। এসময় রত্নফা ছিলেন কুমিল্লা-ত্রিপুরার রাজ বংশের অন্যতম উত্তরাধিকারী। তিনি সম্ভবতঃ টিপরা উপজাতির অন্তর্গত কোন

৩২। সানা উল্লাহ নূরী ; ভুলুয়া নোয়াখালীর ইতিহাস ও সভ্যতা (লক্ষ্মীপুর বার্তা/জুন-১৯৯৭)
৩৩। আবদুল করিম- সুলতানী আমলে বাংলা , পৃঃ ।
৩৪। আবদুর রহিম ও অন্যান্য -বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৬৩-৬৪/১৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালী গোত্রের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সিংহাসন নিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে তুঘরল সমর্থন করেন রত্নফাকে, ১২৭৫ সনে তুঘরলের সাহায্যে রত্নফা সিংহাসনে বসেন। তুঘরল তাঁকে মানিক্য উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে ত্রিপুরার রাজাদের পদবিতে মানিক্য কথাটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দিল্লীর সুলতানদের সামন্ত ভু-স্বামী অর্থাৎ করদ মিত্র ছিলেন ত্রিপুরার রাজাগন । সে সময় ভুলুয়ার রাজন্য বর্গ ছিলেন ত্রিপুরার রাজাদের সামন্ত। তখন বৃহত্তর নোয়াখালীসহ বরিশালের বিস্তীর্ন এলাকা ভুলুয়ার অধীনে ছিল। ভুলুয়ার রাজাদের দেখা হতো বিশেষ মর্যাদার চোখে। ত্রিপুরার মহারাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজার মস্তকে মুকুট পরাতেন ভুলুয়ারাজ। এটা ছিল ভুলুয়া রাজবংশের বংশানুক্রমিক মর্যাদা।

তুঘরলের বিদ্রোহ সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বরনীর "তারীখ-ই-ফিরোজ শাহী" গ্রন্থে বিস্তারিত জানা যায়। তাঁর এই বিদ্রোহ ঘোষণায় দিল্লীর সুলতান গিগাস উদ্দিন বলবন অত্যান্ত মর্মাহত হন। ১২৮০ সনে তিনি বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন। এসময় তুঘরল লখনৌতি ত্যাগ করে সোনার গাঁয়ের দিকে অগ্রসর হন। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার হিন্দু রাজা দনুজ রায়ের সহিত এক সন্ধি করেন। এই দনুজ রায়ই পূর্বে উল্লেখিত ভুলুয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেবরাজ বংশের হিন্দু রাজা। বলবনের এ অভিযানের পর মুসলিম সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়। তারপরও ১৩২৫ সন পর্যন্ত ভুলুয়ার শাসকগন দিল্লীর আধিপত্য মেনে নেয়নি। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলেই(১৩২৫-১৩৫১) প্রথম ভুলুয়া, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম দিল্লী সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ১৩৪৭ সনে সোনারগাঁয়ের শাসন কর্তা শামসুদ্দীন ত্রিপুরাধিপতি রাজা প্রতাপ মানিক্যকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু চট্টগ্রামে এই বিজয় স্থায়ী হয়নি। অল্প দিনের মধ্যে আরাকানিরা মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। তখন থেকে পরবর্তী তিন শতাব্দী পর্যন্ত চট্টগ্রাম কখনো মুসলিম অধিকারে কখনো ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকারে আবার কখনো বা আরাকান রাজ্যাধীন ছিল। নোয়াখালীকে তখন সোনার গাঁয়ের শাসনাধীন বলেই মনে করা হতো।[৩৫]

সম্ভবতঃ বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালীতে সুফী সাধকদের আগমন ঘটে এবং ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। এই সুফী ও ধর্ম প্রচারকেরা আসেন পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেন হযরত মিরান শাহ, জাকী উদ্দিন হোসায়নি, হযরত আহসান ওরফে মিয়া সাহেব, হযরত সৈয়দ আহমদ গেছু দারাজ ওরফে কল্লা শহীদ ও আরো অনেকে। হযরত মিরান শাহের প্রকৃত নাম সৈয়দ আহমদ তন্নুরী। মিরান শাহ নামেই বেশী পরিচিত। তাঁর পিতা সৈয়দ আযালা (রঃ) ছিলেন বাগদাদের বড় পীর সৈয়দ মহি উদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) এর পুত্র। হালাকু খানের বাগদাদ অভিযানের সময় বড়পীর সাহেবের পরিবারের উপর যে জুলুম চলে তারই পরিনামে তাঁরা কাবুল কান্দাহার হয়ে ভারতে চলে আসেন। হযরত মিরান শাহ পাণ্ডুয়া হয়ে প্রথমে সিলেট এবং পরে ঢাকা হয়ে নোয়াখালী আসেন। তিনি সিলেটের হযরত শাহ জালাল (রঃ) সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে মিরান শাহের মাজার অবস্থিত।[৩৬] সম্ভাবতঃ তিনিই নোয়াখালী জেলায় প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক।

৩৫। নুরুল ইসলাম খান সম্পাদিত, জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী, পৃঃ ৪০।

৩৬। মুহম্মদ আবু তালিব ; বৃহত্তর নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচার (নবদিগন্ত, স্মরনিকা) জুন,১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রঃ) এর কাহিনী থেকে জানা যায় হযরত সৈয়দ আহমদ তন্নুরী ছিলেন তাঁর আপন ভাই। তাঁরা একই সময় নোয়াখালীতে আসেন। হযরত শাহ মখদুম রুপোশ তাঁর মুরীদ হযরত জাকী উদ্দিন হোসায়নির সঙ্গে রামগঞ্জ থানার শামপুর দায়রায় অবস্থান করেন। দুবছর নোয়াখালীতে অবস্থানের পর বড় পীর সাহেবের স্বপ্ন নির্দেশে শাহ মখদুম (রঃ) রাজশাহী চলে আসেন। তাঁর মুরীদ জাকী উদ্দিন হোসায়নী (রঃ) মাঝার নোয়াখালী জেলার শামপুরে রয়েছে। হযরত মিরান শাহের সম-সময়ে নোয়াখালীর হবিরচর গ্রামে হযরত আহসান ওরফে মিয়া সাহেবের আগমন ঘটে। এছাড়া হযরত শাহ জালালর (রঃ) এর ৩৬০ সঙ্গীর এক সঙ্গী হযরত সৈয়দ আহমদ গেছু দারাজ ওরফে কল্লা শহীদ কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। তিনি জিহাদে অংশ গ্রহনকালে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর মস্তক বিচিছন্ন করে শত্রুরা তিতাস নদীতে নিক্ষেপ করে। বিচিছন্ন মস্তক অলৌকিক উপায়ে জেলেদের জালে পতিত হয় এবং খন্ডিত মস্তকের নির্দেশ মত জেলেরা মস্তকটি দাফন করে। মৃত মস্তক বা কল্লার অলৌকিক কার্য কলাপের জন্য লোকে তাঁকে কল্লা শহীদ নামে অভিহিত করে। বর্তমান কুমিল্লা জেলার খড়মপুর নামক স্থানে এই কল্লা শহীদের মাঝার। এছাড়াও আরেক জন সুফী সাধক হযরত চাঁদশাহ ফকির লক্ষীপুর জেলার রামগতিতে আসেন। বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে চাঁদ শাহের পূর্ব পুরুষগন নোয়াখালীতে আসেন। সম্ভবতঃ দশম শতকের কোন এক সময়ে আরব বণিকদের সঙ্গে চাঁদ শাহের পূর্ব পুরুষগন উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। মুসলিম বিজয়ের পর আরো অনেক সুফী সাধক নোয়াখালীতে আসেন।[৩৭]

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক বাংলার শাসন ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন করেন তাতে সোনার গাঁও -এ বাহরাম খান ও গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর যুগ্ন শাসন কর্ত নিযুক্ত হন। বিদ্রোহের আশঙ্কা দুর করতে তিনি এই পরিকল্পনা নেন। ১৩৩৮ পর্যন্ত বাংলায় মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু ১৩৩৮ সনে বাহরাম খানের মৃত্যু হলে তার সিলাহদার (বর্মরক্ষক) ফখরা স্বাধীনতা ঘোষনা করে এবং সুলতান ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি ধারন করে সোনার গাঁয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বাহরাম খান সিলাহদার ফখরাকে ভুলুয়ার ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। ভুলুয়া ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র। বাহরাম খানের মৃত্যুর পর ফখরা ভুলুয়া থেকে নদী পথে সোনার গাঁও দখলের চেষ্টা করেন। পরে দাউদকান্দি ঘাট দিয়ে মেঘনা পার হয়ে তিনি সোনার গাঁও দখল করে স্বাধীন সুলতান হিসাবে সিংহাসনে বসেন। ফখর উদ্দিন মুবারক শাহ ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান।

ফখর উদ্দিন মুবারক শাহকে নোয়াখালীর অধিবাসী বলে ধারণা করা হয়। কিংবদন্তী আছে যে নোয়াখালীর ভাগ্যান্বেশী এই মলঙ্গী যুবক (নোয়াখালী জেলায় সমুদ্রের লবনাক্ত পানি থেকে স্থানীয় অধিবাসীরা এক শ্রেনীর লবন তৈরী করত। নোয়াখালীর ভাষায় তারা মলঙ্গী নামে পরিচিত) জীবিকার সন্ধানে রাজধানী গৌড়ে উপস্থিত হন। সেখানে সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে নিজের কর্ম-দক্ষতার মাধ্যমে উচচতর পদে উন্নীত হন। পরিশেষে জীবনের এক পর্যায়ে সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান হিসাবে

৩৭। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংবাদ পেয়ে সহকর্মী মলঙ্গীদের কেউ কেউ সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হয়ে বাদশার সঙ্গে স্বাক্ষাত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরিশেষে তারা এক অভিনব কৌশলে ফখর উদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। একদিন দেখা গেল, কয়েকটি জীর্নবস্ত্র পরিহিত লোক লাঠির অগ্র ভাগে লবনের বস্তা বেঁধে এবং লাঠি কাঁধে ঝুলিয়ে এক অভিনব গান গেয়ে রাজপথ পরিক্রম করছে। তারা গান গাইছিল ঃ- " নুনের রাজা ফখর উদ্দিন, লাঠির আগে ছালা চিনৃ।" নোয়াখালীতে তিনি নুনের রাজা ফখর উদ্দিন হিসাবে পরিচিত ছিলেন।[৩৮] এই দুর্বোধ্য গানের কথা ফখর উদ্দিনর কানে যেতেই তাঁর অতীত স্মৃতি জাগ্রত হয়। তিনি তাদেরকে সমাদরে রাজ প্রাসাদে ডেকে নিয়ে বন্ধুর ন্যায় সমাদর করেন। যথা সময়ে প্রচুর খেলাত ও জায়গীরাদি দিয়ে তাদেরকে নোয়াখালী পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পূর্বেও ফখর উদ্দিনের নির্মিত শাহী সড়কের অস্তিত্ব নোয়াখালীর সদর মহকুমায় দেখা যেতো। নোয়াখালীর ভাষায় এ রাস্তার নাম ফখর উদ্দিন অদ অর্থাৎ ফখর উদ্দিনের হদ বা রাস্তা।

ফখর উদ্দিন মোবারক শাহের সময় বিখ্যাত আরব পর্যটক ইবনে বতুতা চর্তুদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভ্রমন কালে সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে ভুলুয়া বন্দরেও অবতরন করেন। এখান থেকে তিনি সিলেট যান এবং হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সুলতান রুকুন উদ্দিন বরবক শাহ ১৪৫৯ - ১৪৭৪ সন পর্যন্ত মোট পনের বছর গৌড়ে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া গৌড়ের শাসন ভুক্ত হয়। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত রাস্তিখানের শিলালিপিতে সুলতান রুকুন উদ্দিনকে পূর্ব বঙ্গের সুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গত কারণে বৃহত্তর নোয়াখালী তথা ভুলুয়া তাঁর শাসনাধীন ছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

সুলতান আলা উদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩ সনে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। বৃহত্তর নোয়াখালীর ভুলুয়া ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম তাঁর শাসনাধীন ছিল।[৩৯] সম্রাট আকবরের সময় বাংলার বার ভূঁইয়াদের শক্তিমান ভূম্যাধিকারী ছিলেন। সম্রাট আকবর এই ভূঁইয়াদের দমনের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের বারংবার বাংলায় প্রেরণ করতে বাধ্য হন। সেনাপতি মান সিংহ বাংলায় এসে এগার সিন্ধুর দূর্গের নিকটবর্তী টোকের মুক্ত ময়দানে বার ভূঁইয়ার গৌরব ঈশা খানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ সময়ে ভূঁইয়াদের অন্যতম ভূঁইয়া ছিলেন ভুলুয়ার রাজা লক্ষন মানিক্য। পরবর্তী কালে দিল্লীর করদ ও আশ্রিত [illegible] তাঁর বংশধরেরা কোম্পানীর শাসনের আগ পর্যন্ত এ জেলার খ্যাত নামা ভূম্যাধিকারী ছিলেন। রাজা [illegible] মানিক্য ভুলুয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন বাংলার বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁনের মিত্র ও সহযোগী। মোঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ দূর্বল হয়ে গেলেও অনন্ত মানিক্য সাহসিকতার সঙ্গে মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। সুবেদার ইসলাম খাঁন ভুলুয়াকে মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্য সেনাপতি আবদুল ওয়াহিদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেন।

৩৮। খালেদ মাসুকে রসুল; নোয়াখালীর লোক সাহিত্যে লোক জীবনের পরিচয়। পৃঃ-২০
৩৯। নুরুল ইসলাম খান সম্পাদিত, জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী । পৃঃ ৪১

Dhaka University Institutional Repository

মোঘলদের ভুলুয়া অভিযানের খবর পেয়ে রাজা অনন্ত মানিক্য প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন এবং আরাকান রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভুলুয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজধানী থেকে পাঁচ মাইল দুরে ডাকাতিয়া খালের মুখে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। এবং রাজা নিজেই সেখানে নেতৃত্ব দেন। উভয় পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। সুবেদার ইসলাম খাঁন অধিক সৈন্য, অস্ত্রসস্ত্র ও রসদ প্রেরণ করেন। মোঘলদের শক্তি বৃদ্ধি সত্বেও তারা ভুলুয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিল না । রাজা অনন্ত মানিক্য নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাজা অনন্ত মানিক্যের রাজধানী রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত উজির মীর্জা ইউসুফের ভুল বুঝাবুঝির কারণে ভুলুয়া বাহিনী পরাজিত হয়। এভাবে মোঘলদের গৌড় দখলের ৩৫ বছর পর ভুলুয়া তথা বৃহত্তর নোয়াখালীর উপর সুবেদার ইসলাম খাঁনের কার্যকর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোঘল বাদশা শাহজাহান (১৬২৭-৫৮) এবং আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) রাজত্ব কালে নোয়াখালীসহ প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বাংলায় শান্তি বিরাজ করে। ছোট খাট অভিযান ছাড়া বড় ধরনের কোন যুদ্ধ এসময়ে পরিচালিত হয়নি। যুবরাজ মুহম্মদ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০) ছিলেন সুবা বাংলার একজন খ্যাতনামা শাসন কর্তা। এরপর মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩) ও পরে নবাব শায়েস্তা খাঁন সুবাদার হিসাবে ঢাকা আসেন। তিনি নোয়াখালীর যুগিদিয়া ও আলমদিয়া থেকে আরাকানিদের বিতাড়িত করেন এবং চট্টগ্রাম দখল করে সারা পূর্ব বাংলা অঞ্চল মুঘল অধিকারে আনেন।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পরে নোয়াখালী জেলার চাকলে রোশনাবাদে শমসের গাজী নামক এক ভাগ্যান্বেশীর আবির্ভাব ঘটে। শমসের গাজী সম্ভবতঃ পলাশী যুদ্ধের পরে এদেশের রাজনৈতিক শূন্যতা ও অরাজকতার সুযোগে শক্তি সঞ্চয় করে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমন করেন। তাঁর সাথে ত্রিপুরার তৎকালীন রাজার যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় তাতে ত্রিপুরা রাজা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। বিজয়ী শমসের গাজীর হাতে তিনি তার রাজধানী উদয়পুর সমর্পন করে পলায়ন করেন। মুর্শীদাবাদের তৎকালীন নবাব মীর কাসিম আলী খাঁনের কাছে শমসের গাজীর বিরুদ্ধে রাজা অভিযোগ করলে নবাবের আদেশে তাকে ধরে মুর্শিদাবাদে নিয়ে হত্যা করা হয়। জেলার পশ্চিম প্রান্তের লক্ষ্মীপুর থানার (বর্তমানে জেলা) সদর দপ্তর যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম শমসেরাবাদ শমসের গাজীর স্মৃতি বহন করছে।

বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পূর্বে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে একটা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর লক্ষ্মীপুরের বাণিজ্য কুঠির স্থান পূর্ব বাংলায় প্রায় ঢাকার বাণিজ্য কুঠির সমপর্যায়ের ছিল। ১৭৭৮ সনের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাণিজ্য কুঠি প্রধানতঃ সূতীবস্ত্র খরিদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১০,৬২,০০০ টাকা।[৪০] এই বাণিজ্য কুঠির অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে পাটের হাট এবং চৌমুহনী ও দাগন ভূঁইয়ার কৈল্যান্দীতে ছোট ছোট দুটি কুঠি ছিল। ফেনী নদীর মুখে জগদিয়াতে ছিল সূতীবস্ত্রের কুঠি। নোয়াখালী থেকে ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর অভিমুখী রাস্তার পার্শ্বে ছিল কেন্দ্রীয় লবন কুঠি। কিন্তু ১৮০০ সনের পূর্বেই লবনের এজেন্ট এখান থেকে নোয়াখালী চলে যায়।[৪১]

৪০। W.H.Thomson ; Final Report on the survey and Settlement Operation in the District of Noakhali.
৪১। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর থেকে স্থানীয় দেওয়ানের সহযোগিতায় একজন কালেকটরের অধীনে খাজনা আদায় করতে থাকে। এই খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে ১৭৮৭ সনে প্রথম ভুলুয়াকে জেলায় পরিণত করা হয়।[৪২] ১৭৮৭ সনে জন শোরের সুপারিশে ভুলুয়া এবং ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলা ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের অধীনে দেয়া হয় এবং ১৭৯০ পর্যন্ত এর অধীনে থাকে। ১৭৯০-১৮২১ সন পর্যন্ত ভুলুয়াকে ত্রিপুরা জেলার অধীনে রাখা হয়। ১৮২১ সনে বৃটিশ লবন এজেন্ট প্লাউডেন (Plowden) এর সুপারিশের ভিত্তিতে কোম্পানী ভুলুয়াকে পৃথক জেলা হিসাবে ঘোষনা করে এবং প্লাউডেনকে এর রাজস্ব আদায়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৮৬৮ সনে ভুলুয়া নোয়াখালী জেলা হিসাবে পরিচিত লাভ করে।

** টীকা-১। খেলাফত আন্দোলন ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেভার্স চুক্তির শর্ত মোতাবেক বৃটিশ ও অন্যান্য মিত্র শক্তি পরাজিত তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ ভটোয়ারা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ভারতীয় মুসলিমদের মনে এতে দারুন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ তুরস্ক খিলাফত তৎকালীন বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, একতা ও আশা আকাঙ্খার প্রতীকরূপে গন্য ছিল। সেই জন্য ভারতের মুসলিমরাও খিলাফতের প্রতি অত্যান্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তুরস্ক সুলতানকে নিজেদের ধর্মীয় নেতা রূপে সম্মান করত। বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধের শেষে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না । যুদ্ধ শেষে বৃটিশ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ভারতীয় মুসলিমদের মনে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত করে। মুসলিমরা খিলাফতের সম্মান ও অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং ১৯১৯ সনের ১৭ অক্টোবর খিলাফত দিবস পালিত হয়। ১৯২০ সনের ১৯ মার্চ সমগ্র ভারত ব্যাপী খিলাফতের দাবীতে হরতাল পালিত হয় এবং আন্দোলন আরো তীব্র করার লক্ষ্যে সারাদেশে বহু খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ইতহাসে ইহাই "খিলাফত আন্দোলন" নামে পরিচিত।

** টীকা-২। হাফেজ্জী হুজুরঃ মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর নোয়াখালী জেলার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলা) রায়পুর থানার লুধুয়া গ্রামে ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহন করেন। ৮ বৎসর বয়সে হাফেজ্জী শিক্ষার জন্য ভারতের পানিপথ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এরপর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাশ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রঃ) ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষক। ১৯৮১ সনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং একই বছর ডিসেম্বর মাসে "খেলাফত আন্দোলন" নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেণ। ১৯৮৬ সনেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেণ। ১৯৮৭ সনের ৭মে মৃত্যু বরণ করেন।

৪২। নুরুল ইসলাম খান সম্পাদিত, জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী (১৯১১) পৃঃ ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র উপমহাদেশের জনগনের মতো নোয়াখালীর অধিবাসী ছিল বিক্ষুব্দ। তাই ধর্মীয় আবরণে যে সকল ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তার সব কয়টিতে নোয়াখালী বাসীর অংশ গ্রহন ও নেতৃত্ব ছিল। তাই নোয়াখালীর ধর্মপ্রান মুসলিমদের মনে ফরায়েজী মতবাদ এবং ওহাবী মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নোয়াখালীর সাদুল্লাপুর নিবাসী প্রখ্যাত মাওলানা ইমামুদ্দিন শহীদ সৈয়দ আহমদের সহকর্মী ছিলেন। বালাকোটের শোচনীয় ঘটনার পর মাওলানা ইমামুদ্দিন ও আলা উদ্দিন আল-বাঙালী নোয়াখালীতে এসে ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। হাজী শরীয়ত উল্লার ফরায়েজী মতবাদ ও নোয়াখালীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে ১৮৫৭ সনের সিপাহীযুদ্ধে নোয়াখালীর জনগনের তেমন অংশ গ্রহন লক্ষ্য করা যায় না।

১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বঙ্গকে নোয়াখালীবাসী জোরালো সমর্থন করে। নতুন প্রদেশের নতুন রাজধানীকে কেন্দ্র করে শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলার উন্নতি ঘটবে চিন্তা করে নোয়াখালীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গ বিভাজন সমর্থন করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার কারণে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ১৯১১ সনে বাতিল করতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়েছিল। ১৯২০ সনে খেলাফত আন্দোলনেও নোয়াখালীবাসী হাজী খান বাহাদুর আবদুর রশিদ খান, খান বাহাদুর আবদুল গোফরান এবং রায়পুরের মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করেন।[৪৩]

১৯০৬ সনে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠিত হলে নোয়াখালীবাসী এতে সক্রিয় সমর্থন দান করেন। মুসলিমলীগ ও কংগ্রেসের যুগপত আন্দোলন ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করে উপমহাদেশের স্বাধীকারের দাবী মেনে নিতে। পরবর্তীতে লহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যখন পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় তখন এই আন্দোলনে নোয়াখালীবাসীর পক্ষে যারা নেতৃত্ব দেন তারা হলেন- খাঁন বাহাদুর আবদুল গোফরান, হাবিবুল্লা বাহার, শামসুন্নাহার মাহমুদ, সৈয়দ আবদুল মজিদ প্রমুখ। মুসলিমদের দাবীর মুখে শেষ পর্যন্ত ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং নোয়াখালী পূর্ব বাংলা প্রদেশের একটি জেলা হিসাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত হয়।

নোয়াখালীবাসী অন্যান্য জেলার জনগনের সঙ্গে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং সর্বোচচ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ যে সমস্ত আদর্শ ও নীতির উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলার জনগনকে হতাস করেছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার জনগনকে বঞ্চিত করে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন অধিকাংশ শিল্প কারখান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ দেশের রাজধানীও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

৪৩। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক অনৈক্য সৃষ্টির ফলে পূর্ববাংলার জনমনে দারুন অসন্তোষ দেখা দেয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলার এক চরম অবজ্ঞা করা হয় এবং উর্দ্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ফলে পূর্ব বাংলার জনগন মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র যুবক শহীদ হন। তাদের মধ্যে নোয়াখালী জেলার কৃতি সন্তান শহীদ আবদুস সালাম ছিলেন অন্যতম। ভাষা শহীদদের রক্ত থেকে জন্ম নেয় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ।

১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার আপামর জনতা এককাতারে সামিল হন। নেতৃত্ব দেন শেরেবাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সহরোয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমান। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয় লাভ করেও এর নেতৃবৃন্দ বেশীদিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। দীর্ঘ ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস ঘাতকতা ও স্বার্থপরতার কারণে পূর্ব বাংলার জনগনের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। উপরন্তু তাদের মাথার উপর চেপে বসে সামরিক শাসন। আইউব খানের সামরিক শাসন এবং তার স্বেচ্ছাচারী নীতির জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যপক গণআন্দোলন গড়ে উঠে। পরবর্তী কালে ১৯৬৪ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ব শাসনের দাবী আরো জোরালো অনুভূত হতে থাকে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সনে বাঙ্গালীজাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষনা করেণ। এর পাশাপাশি ছাত্র সমাজ ঘোষনা করেন তাদের ১১-দফা দাবী। শুরু হয় পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শেখ মুজিবসহ আন্দোলনের অনেক বীর সৈনিককে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয় নোয়াখালীর বীর সন্তান সার্জেন্ট জহুরুল হককে। শুরু হয় গণআন্দোলন। গণআন্দোলনের মুখে আইউব খান পদত্যাগ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারী করে এবং জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী তফশীল ঘোষনা করেন।

** টীকা-৩। **হাজী আবদুর রশিদ** ঃ খান বাহাদুর আবদুর রশিদ খাঁন ১৮৮১ সনে নোয়াখালীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। শিক্ষা জীবন শেষে ১৯০৫ সনে আইনজীবি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেণ। ১৯০৬ সনে নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।১৯১৩ সনে জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও ১৯১৫-১৬ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এবছর তিনি খাঁন বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। আবদুর রশিদ খাঁন ১৯১৯ সনে হজ্ব পালন শেষে দেশে ফিরে খেলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করার অপরাধে কারাবরণ করেন। খেলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ আলী এবং তৎকালীন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নোয়াখালী আগমন করেন এবং নোয়াখালীতে এ আন্দোলনের সাফল্যর জন্যে নোয়াখালীবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তুরস্কের মুসলিমদের উপর বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে নোয়াখালীতে প্রথম বৃটিশ সরকার প্রদত্ত খাঁন বাহাদুর উপাধি বর্জ্জন করেন আবদুর রশিদ খাঁন। ১৯২২ সনে নোয়াখালী টাউন হলে অনুষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদসহ বহু নেতা উক্ত সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯২২ সনে তিনি দেশবন্ধু স্বরাজ পার্টির সরাসরি সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সনের শুরুতে বাঙালীজাতি বুঝতে পারে পাকিস্তানরাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি শুরু করে স্বাধীকারের সংগ্রাম। ১৯৭১ সনে ৭ মার্চ ঢাকার রেইসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক বিশাল জনসমুদ্রে ঘোষনা করেন"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এ ঘোষনার পর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি বুঝতে পারে তাদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাচেছ। বাংলা তাদের ছাড়তেই হবে। আর তাই রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর ২৫ মার্চের কালো রাতে টিক্কা খানের নেতৃত্বে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাংক, কামান, মেশিনগান ও অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা রাইফেলস্ কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সহ নিরস্ত্র নিরীহ্ নাগরিক, ছাত্র, শ্রমিক, নারী ও শিশুর উপর এই নিষ্ঠুর আক্রমন পরিচালনা করে। একই সাথে দেশের অন্যান্য শহরও আক্রান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতে ই.পি.আর. ওয়ার্লেসের মাধ্যমে সারাদেশে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করার ঘোষনা দেয়।

শুরু হয়ে যায় বাঙ্গালীজাতির স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রায় এক মাস স্বাধীনতা থাকার পর নোয়াখালীতে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস সমস্ত বাঙ্গালী জাতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে। শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সনের ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলা শত্রুমুক্ত হয়। আর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ও ভারতীয় যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে নোয়াখালী জেলার অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি ও নোয়াখালী জেলা

বাংলায় সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি ঃ-বৃটিশ শাসন বাংলাতেই প্রথম শুরু হয় এবং এ অঞ্চলেই এর প্রভাব সর্ব প্রথম এবং ব্যাপক অনুভূত হয়। ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী মুসলিম নবাবদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে। বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়ায় হিন্দু, মুসলিম আমির ওমরাহ এবং নবাবের সভাসদদের যোগসাজস থাকলেও ব্যবসায়ী সূত্রে বাংলায় অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। স্বাভাবিক কারণে তারা নবাবের পরিবর্তে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যকে স্বাগত জানায়। সাথে সাথে ইংরেজী ভাষা শিখে কোম্পানীর মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়। অপর দিকে ক্ষমতা হারানোর পর মুসলিম শাসকদের একটি বড় অংশ বাংলা প্রদেশ ছেড়ে দিল্লী অথবা পশ্চিম ভারতে চলে যায়। একদিকে নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে বৃটিশ শাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব -এই দুই মিলে মুসলিমরা প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। তাই পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে সমাজে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে অনুরূপভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলনে দুটো ধারা লক্ষনীয়। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ, পশ্চিম বঙ্গের মীর নেছার আলী তিতুমীর এবং পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও তার পুত্র হাজী মোহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইসলাম ধর্মের মধ্যে যেসমস্ত অনাচার প্রবেশ করেছে সে গুলো শুদ্ধি করনের মাধ্যমে পবিত্র কোরানের আদর্শ রূপায়িত করার কথা ভাবেন। অপর দিকে সৈয়দ আহমদ খান, বাংলার নবাব আবদুল লতিফ, গুলাম আহমদ, মৌলভী চিরাগ আলী ও সৈয়দ আমীর আলী পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহন করে মুসলিম সমাজকে অধিকতর শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, নোয়াখালী জেলার মুসলিম জনসাধারণ শুরুতে সংস্কারের প্রথম ধারা সমর্থন করেন।

নোয়াখালরী শতকরা নব্বই জন অধিবাসী মুসলিম। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মত নোয়াখালীর জনগনও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারে বৃটিশদের বিরোধীতা করে। যে কারণে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের চাইতে আরবী ও ফার্সী ভাষার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নোয়াখালীতে ছিল বেশী। তাই নোয়াখালীর ধর্ম প্রান মুসলিমদের মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী মতবাদ ব্যাপক সাড়া জাগায়। একই সময়ে ওহাবী আন্দোলনও নোয়াখালীর মুসলিমদের প্রভাবিত করে। উত্তর ভারতের বায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ মক্কায় শিক্ষা সমাপন করে ১৮২০ সালে

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশে এসে ওহাবী আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি তিনি পরাধীন দেশে বিধর্মীর কর্তৃত্বাধীনে মুসলিমদের জীবন ব্যহত হতে বাধ্য-এরূপ প্রচারনায় তাঁর আন্দোলন অচিরেই ইংরেজ বিরোধী জেহাদ আন্দোলনে পরিনত হয়। ১৮৩০ সনে পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে এবং বালাকোট নামক স্থানে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। বাংলার হাজার হাজার মুসলিম তাঁর আহবানে সীমান্তের জেহাদে অংশ গ্রহণ করেন। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেনঃ শিখ নরপতি রনজিৎ সিংয়ের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলার নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল থেকে সর্বাধিক সংখ্যক মুজাহিদ যোগদান করেছিলেন। নোয়াখালীর সাদুল্লাপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মাওলানা ইমামুদ্দিন (১৭৮৮-১৮৫৯) ও আলা উদ্দিন আল বাঙালী সৈয়দ আহমদের সহকর্মী ছিলেন এবং জেহাদ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রেখেছিলেন।[১] বালাকোট থেকে নোয়াখালীতে ফিরে মাওলানা ইমামুদ্দিন ইসলামের সহজ সরল নীতিমালা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য তার মতবাদের সঙ্গে ফরায়েজী মতবাদের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা।

উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সংস্কারকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি ফরায়েজী মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। ১৮৪০ সনে তাঁর তিরোধানের পূর্বে সমগ্র মধ্য বঙ্গ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় তাঁর মতবাদ ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন আরো ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ লাভ করে। ১৮৫৭ সনের যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ের পর এবং ১৮৬২ সনে ঢাকায় দুদুমিয়ার মৃত্যুতে ফরায়েজী আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মাওলানা ইমামুদ্দিনের পরে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী নোয়াখালীতে আসেন। ১৮৭০ সনের দিকে ওহাবী মতবাদের প্রভাবে এদেশের মুসলিম জনসাধারণ যখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে উন্মুখ, ঠিক সেই সময়ে মাওলানা কেরামত আলী বাংলায় ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হন। নোয়াখালীর মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন এবং আধুনিক সমাজ ব্যস্থায় উত্তরনে মাওলানা কেরামত আলীর প্রভাব অপরিসীম।[২]

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লবের সময় নোয়াখালী জেলায় তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। ১৯০৫ সনের ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে মুসলিম জনগন স্বাগত জানায়। হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তুললে ১৯০৬ সনের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে এর পতাকা তলে মুসলিমরা সমবেত হতে থাকে। মুসলিম স্বার্থরক্ষা ও ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে অধিকার ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে উঠে। নোয়াখালীর ধর্মপ্রান মুসলিমগন সর্বান্ত করনে মুসলিম লীগের কর্মসূচী সমর্থন করে এবং লীগ পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১। নুরুল ইসলাম খান সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী পৃঃ-৫০।
২। নুরুল ইসলাম খান সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার, নোয়াখালী পৃঃ-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ সনের নোয়াখালী জেলার জনগন খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। খেলাফত আন্দোলন নোয়াখালী জেলায় প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে যখন মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী নোয়াখালীতে আসেন। এ আন্দোলনে নোয়াখালীর খান বাহাদুর আবদুর রশীদ খান ও রায়পুরের মাওলান মোহাম্মদ উল্যাহ হাফেজ্জী হুজুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৩] ১৯২১ সনে মহাত্মাগান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনেও নোয়াখালী জেলার জনসাধারণ সক্রিয়া অংশ গ্রহণ করেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠান,ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সে সময় বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং বৃটিশ পন্য ও শিক্ষা বর্জন করে। সমগ্র উপ-মহাদেশের মত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন নোয়াখালী জেলার জনসাধারণকে স্বাধীকার আন্দোলনে অনুপ্রেরনা দেয়।

১৯৪০ সনে ২৩ মার্চ এ,কে ফজলুল হকের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের পৃথক আবাস ভূমির দাবী এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান আন্দোলনে দেশের অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নোয়াখালী জেলার খান বাহাদুর আবদুল গোফরান, হাবিবুল্লা বাহার চৌধুরী ও তাঁর বোন সামছুন নাহার মাহমুদ, সৈয়দ আবদুল মজিদ, শহীদ নজির প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।[৪] এর পর ভারত বিভাজনকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপ-মহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে নোয়াখালী জেলায়ও এ দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানায় এই দাঙ্গা ভয়াবহরূপ নেয়। এ দাঙ্গা রোধে নোয়াখালীতে ছুটে আসেন মহাত্মাগান্ধী। অহিংসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সত্যাশ্রয়ী ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথিকৃত এ মহান ব্যক্তি শান্তির পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৪৬ সনের ৭ নভেম্বর নোয়াখালীতে আসেন।[৫] তৎকালীন আইন সভার সদস্য হারান ঘোষ চৌধুরীর উদ্দোগে নোয়াখালীর চৌমুহনীতে প্রথম জনসভা হয়। মহাত্মাগান্ধী সে সভায় বক্তৃতা করেন। রামগঞ্জ, রায়পুর, দত্তপাড়া, চাটখিল প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিক্ষুব্দ অঞ্চল ঘুরে ঘুরে নিপীড়িত মানুষের মধ্যে শান্তি, প্রেম ও করুনারবানী দিয়ে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলেন। এভাবে ১৯৪৭ সনের ২৯ জানুয়ারী তিনি বর্তমান চাটখিল থানার জয়াগ গ্রামে এসে পৌছেন। সেদিন নোয়াখালী জেলার প্রথম ব্যারিষ্টার জয়াগ গ্রামের হেমন্ত কুমার ঘোষ তাঁর জমিদারীর স্থাবর অস্থাবর যাতীয় সম্পত্তি এলাকাবাসী সাধারণ মানুষের উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যবহারের জন্য মহাত্মাগান্ধীকে দান করেন। দীর্ঘ চার মাস মহাত্মাগান্ধী নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমন শেষে বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সেখানে ছুটে যান।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল ও নেতার সঙ্গে আলোচনার পর ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর ভারত বিভাগ পরিকল্পনা সম্পন্ন করেন। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সনের ৫ জুন তারিখে মুসলিম লীগ কাউন্সিল মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কংগ্রেস মুসলিম লীগ দুটো প্রতিষ্ঠানই শিল্পপতি, ব্যসায়ী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। তাদের উপকারের জন্যই বাংলাকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল- পশ্চিম বাংলার প্রয়োজন ছিল বিড়লা,

---

৩। পূর্বোক্ত।
৪। পূর্বোক্ত।
৫। মহাত্মাগান্ধী স্মারক প্রকাশনা "সেতু" ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ডালমিয়াদের আর পূর্ব বাংলার বাজার আদমজী, ইস্পাহানিদের জন্য প্রয়োজন ছিল। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সনের ২০ জুন শুক্রবার বাংলার আইন সভার সদস্যরা বাংলাকে দুই অংশে বিভক্ত করার পক্ষে ভোট দেন। এভাবে বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারত ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্ব বাংলার একটি জেলা হিসাবে নোয়াখালী পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্বাধীন বাংলার চিন্তা ঃ- ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাতদিন পূর্বে একদল তরুন বাঙালী রাজনীতিবিদ কর্তৃক পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা শুরু করে এবং একটি গুরুত্ব পূর্ন বৈঠক আহবান করেন। এই বৈঠকে নোয়াখালী জেলার তরুন রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ তোয়াহা উপস্থিত ছিলেন। এ সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্রনেতা এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি থেকে অংশ বিশেষ উদ্বৃতি প্রনিধানযোগ্য ; " ৭ আগষ্ট ১৯৪৭, বেলা দুটোয় কামরুদ্দিন সাহেবের বাসায় যাই। তিন কপি মেনিফেষ্টো টাইপ করি। তোয়াহা সাহেব, নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও অন্যান্য প্রস্তাব করলেন যে, পার্টির নাম হবে পাকিস্তান পিপলস্ ফ্রিডম লীগ"। আমরা নাম দিলাম ইষ্টার্ন পাকিস্তান ইকনোমিক ফ্রিডম লীগ।[৭] এ বিষয়ে অর্থনীতির গবেষক ডঃ আতিউর রহমান বলেন, প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে এটাই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা। যে কারণে দলের নাম ইষ্টার্ন এবং ইকনোমিক শব্দ জুড়ে দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান শাসনে বাংলাঃ- ভৌগলিক দিকথেকে অবাস্তব, ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং পৃথক অর্থনীতি ও জীবন যাত্রা সত্বেও ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতিকে পাশ কাটিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল সমুহ নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র সমূহ গঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু মুসলিম লীগের নেতারা সাম্প্রদায়িক আবেগ তাড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত হাজার মাইল দুরে অবস্থানে থাকা দুটো ভূখন্ড সমন্বয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন দেশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন: "মুসলিম লীগ বর্নিত পাকিস্তান পরিকল্পনাটি সম্ভবপর সমস্ত দিক থেকে আমি বিচার করে দেখেছি। ভারতীয় হিসাবে আমি ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে এর কী অর্থ দাঁড়াবে তা খতিয়ে দেখেছি। ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যে এর কী ফলাফল ঘটতে পারে একজন মুসলমান হিসাবে আমি তা যাচাই করে দেখেছি। পরিকল্পনাটির সমস্ত দিক বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, এটি শুধু সারা ভারতের পক্ষেই নয় মুসলিমদের পক্ষেও হানিকর এবং বস্তুত পক্ষে এতে সমস্যা যতনা মিটবে তার চেয়ে ঢের বেড়ে যাবে।[৮]"

এখান থেকে অসঙ্গতির যাত্রা শুরু হয়। জিন্নাহ নিজেই পাকিস্তানের ভিত্তি মূলে আঘাত হানেন ঢাকায় এসে। ১৯৪৮ সনের ১৯ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সমবেত

৬। কামরুদ্দিন আহমদ, "পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি।"

৭। তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রি ; ৭ আগষ্ট, ১৯৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন "আপনাদের পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।[৮] এরপর ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি এই ঘোষনার পুনরাবৃত্তি করেন। সঙ্গেসঙ্গে ছাত্র জনতার মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কারণ বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধবংস করার ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাস পরে (ডিসেম্বর, ১৯৪৭) তৎকালীন রাজধানী করাচীতে একটি গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন পূর্ব বাংলা সরকারের মন্ত্রী নোয়াখালীর হাবিবুল্লা বাহার চৌধুরী ও আবদুল হামিদ। শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংবাদ ৬ ডিসেম্বর ঢাকার "মর্নিং নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ ও অন্যান্য কলেজসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ সভা করে। এতে সভাপতিত্ব করেণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও তমুদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাসেম। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র ভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এটাই প্রথম সাধারণ ছাত্র সভা।[১০] এ সময় পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক সংখ্যা ছিল বাংলায় ৫৪.৬ শতাংশ, পাঞ্জাবী ২৭.১ শতাংশ, উর্দু ৬.০ শতাংশ, সিন্ধী ৪.৮ শতাংশ এবং ইংরেজী ১.৪ শতাংশ।[১১]

এভাবে ভাষা প্রশ্নকে নিছক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে না রেখে তাকে রাজনৈতিক মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক দল নয় বরং ছাত্ররাই অধিকতর যোগ্য ভূমিকা পালন করে।[১২] ১৯৪৮ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ভাষা বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয় উর্দু এবং ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হোক। প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন-"পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হতে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।" বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গিতে নিয়ে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষনা করেন-"পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৩]"

মুসলিম লীগ দলীয় পূর্ব বাংলার গণপরিষদের সদস্যদের বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার খবর ঢাকা পৌছালে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় । প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২ মার্চ ফজলুল হক হলে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একসভা অনুষ্ঠিত

৮। মৌলানা আবুল কালাম আদাজ ; ভারত স্বাধীন হল (অনুবাদ ;সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা: ইউ,পি,.১৯৮৯) পৃ-১৩৭-১৪০।

৯। একুশের সংকলন; ১৯৮১; স্মৃতিচারন, বাংলা একাডেমী, পৃ-৮৭।

১০। জাতির পিতা বলেছেন পুস্তিকা) ; (ঢাকা, প্রকাশনা ও চলচিত্র বিভাগ, পাকিস্তান সরকার,প্রথম সংস্করন ১৯৬৬) পৃঃ-২৭।

১১। Rangalal Sen- Political Elites in Bangladesh, P-99.

১২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্দোগে ১৯৪৭ সনের ২ সেপ্টেম্বর তমুদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ।[১৪] উল্লেখ্য উক্ত সভায় উপস্থিত মোহাম্মদ তোয়াহা ও শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন নোয়াখালীর সন্তান। এই সভায় ভাষা আন্দোলনকে সুষ্ঠ ও সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য একটি সর্বদলীয় "রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ- বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবীতে পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলারমত বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৮ সনের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। নায়াখালীতে সবাত্মকভাবে পালিত হয় এই ধর্মঘট। ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ছাত্রদের আনীত ৭ দফা চুক্তিনামায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন স্বাক্ষর করেন।[১৫]

পরবর্তীতে ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জিন্নাহর একটি নির্ধারিত বৈঠক হয়। বৈঠকে জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পাদিত ৮ দফা চুক্তি মানতে অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠে। এই সময় পেশাগত স্বার্থ নিয়ে অন্যান্য সরকারি কর্মচারী এমনকি পুলিশ বাহিনীও সংগ্রাম মুখর হয়ে উঠে। ১৯৪৮ সনের ১৪ জুলাই তারিখে দেড়মাসকাল কোন বেতন না পাওয়ায় ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ধর্মঘট এবং প্রকাশ্য রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে সরকার সেনাবাহিনীকে পুলিশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে খন্ড যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দুইজন পুলিশ নিহত ও নয়জন আহত হয়। এছাড়া বেশ কিছু অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন দানা বেধে উঠে। এর মধ্যে সিলেটে জমিদারী ও নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলন, ময়মনসিংহে জমিদার ও টঙ্কা প্রথা বিরোধী আন্দোলন, হাজং অঞ্চলে লেভির জুলুম এবং জমিদারী ও টঙ্কা বিরোধী আন্দোলন, নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ ছিল অন্যতম[১৬]।

আরবী হরফে বাংলা লেখার একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত ১৯৪৭ সন থেকে শুরু হলেও তা কার্যকরী করার উদ্দ্যেগ নেয়া হয় ১৯৪৯ সনে। ১৯৪৯ সনের ৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব ফজলুর রহমান পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় বলেন, "সহজ ও দ্রুত যে হরফের মারফত ভাষা পড়া যায় সেই হরফই সবচাইতে ভাল।" - - - সুতরাং দ্রুত লিখন ও পঠনের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া আরবীকেই পাকিস্তানের হরফ করা উচিত। অর্থাৎ বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবী

১৩। নও বেলাল, ৪ মার্চ ১৯৪৮।

১৪। মোহাম্মদ হান্নান; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতহাস (১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬ কলিকাতা) পৃ-৬০।

১৫। ছাত্রদের আনীত ৭ দফার মধ্যে ছিলঃ (১) বন্দী মুক্তি (২) তদন্ত অনুষ্ঠান (৩) ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার (৪) আন্দোলন কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রহিত করণ (৫) বাংলাকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান (৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রাদিশিক সংসদীয় সভায় বাংলার প্রচলন ও (৭) সংবাদ পত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। প্রধান মন্ত্রী স্বহস্তে ৮নং দফা লেখেন ৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্টের দুশমন দ্বারা অনুপ্রানির্ত হয় নাই।(মোহাম্মদ হাননান; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস; পৃ-৬১।)

১৬। বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

হরফে।[১৭]" এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা থেকে প্রথম প্রতিবাদ উঠে। এছাড়া অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে বিমাতা সুলভ আচরণ বাংলার জনতাকে অধিকতর বিক্ষুব্দ করে তোলে।

<u>বায়ান্নর সংগ্রাম</u> ঃ- ১৯৫২ সনে মাতৃ ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষের সঙ্গে নোয়াখালীর ছাত্র জনতাও একাত্মতা প্রকাশ করে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, সমাবেশ নোয়াখালীতেও সমানভাবে পালিত হতে থাকে। নোয়াখালী জেলাস্কুল, বেগমগঞ্জ হাই স্কুল, ফেনী হাই স্কুল, লক্ষ্মীপুর সামাদ একাডেমী, রায়পুর এল, এম, হাই স্কুলের ছাত্ররা ভাষার দাবীতে চৌমুহনী কলেজের ছাত্র নেতাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে। এই সময় চৌমুহনী কলেজের দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্র মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ (পরবর্তীতে সোনাইমুড়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ; মৃত্যু ১৯৯৬) এবং স্নাতক শ্রেনীর ছাত্র সহিদ উদ্দিন এস্কেন্দার (কচি ভাই হিসাবে সকলের নিকট পরিচিত) প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভাষার দাবীকে নোয়াখালীতে জনপ্রিয় করে তোলেন।

১৯৫২ সনের ২৬ জানুয়ারী ঢাকায় শুরু হয় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশন। এই উপলক্ষে ২৭ জানুয়ারী পল্টনে মুসলিম লীগের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন। তাতে ভাষন দিতে গিয়ে জিন্নাহর মত তিনিও ঘোষনা করেন-পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু। নাজিম উদ্দিনের এই উক্তি সম্পর্কে ঐ সময়ের পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী "যে কথা এতো দিন বলিনি" শীর্ষক একটি পুস্তিকায় লেখেন-পল্টনের জনসভায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে একথা ঘোষনার আগে তার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু জানানো বা তার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেননি। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে খাজা সাহেব কিছু বলবেন আমি তা আগে জানতাম না। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর পাশেই আমি উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি যখন তার ভাষনে বলে ফেললেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, তখন আমার বুঝতে দেরী হয়নি যে দেশে আগুন জালানো হলো।[১৮]"

ছাত্রদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিনামা স্বাক্ষরের পর খাজা নাজিম উদ্দিন এই ধরনের ঘোষনায় ছাত্র সমাজ ভীষন ক্ষুব্ধ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর প্রতিবাদে ধর্মঘটের আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে এই ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারী বিকেলে রাজনৈতিক দল গুলোর সহযোগিতায় ঢাকা বার লাইব্রেরীতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে এক সর্ব দলীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সর্বদলীয় সমাবেশে যোগদান করে আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, খেলাফতে রাব্বানী পাটি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমুদ্দুন মজলিশ, ইসলামি ভ্রাতৃ সংঘ, যুব সংঘ প্রমুখ সংগঠন। সভায় সর্ব সম্মতভাবে "সর্ব দলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ" গঠন করা হয়।

১৭। একুশে ফেব্রুয়ারী(সংকলন) হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত (ঢাকা, পুথিপত্র প্রকাশনী দ্বিতীয় প্রকাশ,১৯৬৫) পৃ-২১২-২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে প্রতিবাদ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গৃহীত ২১ ফেব্রুয়ারীতে সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল প্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ঐ দিনই ছিল পূর্ব বাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশন। জনমতের এই ধরনের প্রাবল্যের কাছে নিজেকে অসহায় মনে করে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬ টায় একটানা এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র হরতাল, সভা, মিছিল প্রভৃতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেন। [ঢাকার জেলা প্রশাসক হুসেন হায়দার এই অবাঞ্ছিত নিষেধাজ্ঞা জারী করতে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সিলেট বদলী করা হয়।][১৮] ২১ ফেব্রুয়ারী সকালে দেখা গেল ১৪৪ ধারা ও পুলিশের যাবতীয় বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের ছাত্ররা দলে দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জমায়েত হতে থাকে। ফজলুল হক হলের ছাত্র গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক বেলতলায়[২০] ছাত্র সভা শুরু হয়। এ ছাত্র সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্র মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার এক পর্যায়ে পুলিশ মেডিকেল কলেজের সামনে গুলি চালায়। এতে জব্বার, রফিক ও বরকত নিহত হন। এদের সঙ্গে আহত হন নোয়াখালী জেলার আবদুস সালাম (২৭), সরকারি শুল্ক বিভাগের পিয়ন, যিনি পরবর্তী সময়ে ৭ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[২১] এদিন রাত থেকে মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে নোয়াখালীর সন্তান শহীদুল্লাহ কায়সারের কক্ষটি আন্দোলনের মূল "নিয়ন্ত্রন কক্ষে" পরিনত হয়।

আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ২৫ ফেব্রুয়ারী সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করে এবং ছাত্রদের জোর করে ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেয়। সকল সংবাদ পত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে আন্দোলনের মূল নেতাদের উপর হুলিয়া জারী করে এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী রাতে পুলিশ এক বাড়ীতে হানা দিয়ে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের ৯ জন আত্মগোপনকারী নেতার মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতর করে। এসময় নোয়াখালীর ছাত্র নেতা শহীদুল্লাহ কায়সার ও মোহম্মদ তোয়াহা গ্রেফতার হন। শহীদুল্লাহ কায়সার ১৯৫৬ সনে মুক্তিলাভ করেন। ঢাকার বাহিরে দেশের অন্যান্য জেলারমত নোয়াখালী জেলায় ৫ মার্চ ঘোষিত শহীদ দিবসটি অভূতপূর্বভাবে পালিত হয়। এ,এম,এ, মুহিত এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সলিমুল্লাহ হলের সুবর্ন জয়ন্তী স্মরনিকায় লিখেছেন-"রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন যথার্থই

১৮। "যে কথা এতাদিন বলিনি" প্রকাশক ফজলুর রহমান, আঞ্চলিক পি,ডি,পি অফিস ; জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা- ।

১৯। এ,এম,এ মুহিত ; সলিমুল্লাহ হলের দিন গুলি, সুবর্ন জয়ন্তী (স্মরনিকা) সলিমুল্লাহ হল ঢঃ বিঃ।

২০। বেলতলা-আমতলা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে তৎকালীন ডাকসু ও মধুর ক্যান্টিন সম্মুখস্থ চত্বরের গাছতলায় বিভিন্ন সমাবেশ করতো। সাধারণত আমতলায় ছাত্র সভা হতো -এ জায়গা অন্যরা ব্যবহার করলে দক্ষিনে দিকের বেলতলায় সমাবেশ করা হতো।

২১। আবদুস সালামের জন্ম ১৯২৭ সনে নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার (বর্তমান ফেনী জেলা) দাগনভুঁইয়া থানার লক্ষনপুর গ্রামে। তার পিতার নাম মোঃ ফজল মিয়া ও মাতার নাম দৌলতুন্নেছা। শহীদ সালাম দাগনভুঁইয়ার কৃষ্ণ নারায়নপুর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে জীবিকার সন্ধানে অল্প বয়সে কলিকাতা পাড়ি দিয়েছিলেন। কিছু দিন পর সেখানে এক সরকারি দপ্তরে তার চাকুরী হয়। অতঃপর দেশ বিভাগের পর তিনি বদলী হয়ে ঢাকায় আসেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ ঢাকায় ছাত্র জনতা মিছিল বের করলে সালাম তার চাচাত ভাই মকবুল আহমদকে সঙ্গে নিয়ে মিছিলে যোগদান করেন। তাদের মিছিল তৎকালীন পরিষদ ভবনের পথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌছালে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে সালাম রাস্তায় পড়ে যান। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ পুলিশি হেফাজতে ঢাকায় আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হল। - - - - এই প্রতিবাদ আর ছাত্রদের আন্দোলন রইল না - - - - - একুশে ফেব্রুয়ারীতে জাতি রাতারাতি পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেল। - - - - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে হিতে বিপরীত হলো। ছাত্র দল বাড়ী ফিরে সরকার বিদ্বেষের আগুনে আরো ইন্দন যোগালো।[২২]

চরম নির্যাতনের মুখ এই সময় আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে এলেও ছাত্ররা বিচ্ছিন্নভাবে ভাবছিল চলমান আন্দোলনকে তার লক্ষ্যে কিভাবে পৌছানো যায়। কারণ ভাষার প্রশ্নে আপোষ হতে পারেনা। ফলে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের যে প্রভাব সব চেয়ে বড় আকারে পূর্ব-বাংলার জনমানসে পড়ে, তাহল বাঙালী মনে পুনরায় স্বাধীনতার চেতনার উৎসরন। ১৯৫২ সনের এই আন্দোলনের পরেই বাঙালী শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহার স্ফুরণ জাগিয়ে পরবর্তী কালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম এবং প্রধান অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

<u>আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা</u> ঃ- ইতিমধ্যে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পটভুমিতে এবং মুসলিম লীগ নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ও সরকারি নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৯ সনে ঢাকায় "আওয়ামী মুসলিম লীগের" জন্ম হয়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ বা জনগনের মুসলিম লীগ গঠন করেন। বিশিষ্ট যুবনেতা এবং পরবর্তী কালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমান (১৯১৭-১৯৭৫) যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্য দুজন যুগ্ম সম্পাদক হলেন মোহাম্মদ তোয়াহা ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ। পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের মেরুদন্ডহীন কার্যকলাপ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সামন্ত প্রভুদের জনবিরোধী কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনী ক্রমশঃ আওয়ামী লীগের দিকে ঝুকে পড়ে। অল্প দিনের মধ্যে মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবের যোগ্য নেতৃত্ব এবং ছাত্র সমাজের সক্রিয় সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দোক্তা হিসাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেনীর সংগ্রামী কণ্ঠস্বর রূপে পরিগনিত হয়।

<u>যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪) ও পরবর্তী ঘটনাবলী</u> ঃ- সরকারি নির্যাতনের কারণে ঝিমিয়ে পড়া ভাষা আন্দোলন আবার আস্তে আস্তে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে ধীর গতিতে শুরু হচ্ছিল। ১৯৫৩ সনের শুরুতেই সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারীকে "শহীদ দিবস" হিসাবে পালনের কথা ঘোষনা করে। খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫৩ সনের ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হন। এ দিকে ১৯৫৩ সনে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত পরিষদ জয়লাভ করার পর থেকে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলে বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত করার দূর্বার আকাঙ্খা জাগ্রত হতে থাকে। ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই আকাঙ্খা দানা বাঁধতে থাকে। শেখ মুজিরব রহমানের ভাষায়ঃ "জনতা একদিনের জন্যও মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। তাই তারা সমস্ত বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার আওয়াজ তুলেছিল।[২৩]

২২। সুবর্ন জয়ন্তি (স্মরনিকা ; সলিমুল্লাহ হল পৃঃ ৫৬-৫৮ ।

২৩। শেখ মুজিবর রহমান; সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবশেন ২১,২২ ও ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

[আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর এর নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার পড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা আবুল মনসুর আহমদের উপর। তিনি এর পূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্য ৪২ দফা সম্বলিত একটি জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করেছিলেন। ফ্রন্টের শরীক দল গুলো ৪২ দফা কমিয়ে ২৮ এর মধ্যে নামিয়ে আনতে বলে। এ সম্পর্কে আবুল মুনসুর আহমেদ বলেন -"মুসাবিদা করিতে করিতে হঠাৎ একটা ফন্দি আমার মাথায় ঢুকিল। এটাকে ইনসপিরেশন বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিনার নির্মান, ২১ ফেব্রুয়ারীকে সরকারী দুটির দিন ঘোষনা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ ফিগারটাকে চির স্মরনীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে-যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীকে ২১ দফা কর্মসূচী করিলে কেমন হয়? ৪২ দফা কাটিয়া ২৮ দফা করা গেলে ২৮ দফাকে কাটিয়া ২১ দফা করা যাইবেনা কেন?[২৪] "শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচী ২১ দফা ঘোষনা করা হয়েছিল।"]

যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত ২১ দফা (প১) ইশতেহারে বাঙালীর প্রানের দাবী উচচারিত হয়। ১৯৫৪ সনের ৮-১২ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এত সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। সম্প্রদায় ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন। মুসলিম আসন ছিল ২৩৭ টি। আর অমুসলিম আসন ৭২ টি। নয়া পরিষদে দল ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ-

নং	বিভিন্ন দলের নাম	আসন সংখ্যা
১	আওয়ামী মুসলিম লীগ	১৪৩
২	কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮
৩	নেজামে ইসলাম	২২
৪	গণতন্ত্রী দল	১৩
৫	খেলাফতে রাব্বানী পার্টি	০২
	যুক্তফ্রন্টে (সর্বমোট)	২২৮
৬	মুসলিম লীগ	০৯
৭	জাতীয় কংগ্রেস	২৫
৮	তফসিলি কংগ্রেস	২৭
৯	সংখ্যলঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩
১০	কমিউনিষ্ট পার্টি (স্বনামে)	০৪

৩ এপ্রিল ১৯৫৪, শেরে বাংলা ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের পশ্চিম বাংলা সফর কালীন কিছু উক্তি ও মার্কিন ইন্ধনে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত কর হয়। অগণতান্ত্রিকভাবে বাংলার মানুষের নির্বাচনী রায়কে নস্যাৎ করে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় এরপর থেকেই ভাঙ্গনের পালা শুরু হয়।

২৪। আবুল মনসুর আহমেদ ; আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রন, ১৯৭৫ ঢাকা) পৃঃ ৩২২-৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানে সামরিক আইন জারীর পটভূমি, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলঃ- ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ ও যন্ত্রনা দায়ক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। তৎকালীন রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতা, স্বার্থপরতা ও দায়িত্বহীনতা সেদিন জাতিকে এক দূর্যোগপূর্ন পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে। ১৯৫৪ সনের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে ৯২(ক) ধারা জারি করা হয়। ৬ জুন আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রি হয়ে পূর্ব বাংলায় নতুন সরকার গঠন করে। ৫ আগষ্ট গর্ভণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বিদায় নেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জা নতুন গর্ভণর জেনারেল হন। ১০ আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারে শেরে বাংলা ফজলুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর স্থলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় ক্ষমতার দ্রুত হাত বদল হচ্ছিল। পারস্পরিক দ্বন্দ ও প্রতিশোধ স্পৃহা রাজনৈতিক গগনে এক কালো মেঘের জন্ম দেয়। এমনি পরিস্থিতিতে ২২ জুলাই ১৯৫৮ ইং আতাউর রহমান খান দ্বিতীয়বার পূর্ব পাকিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী হবার সুযোগ পান। সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার সংসদ অধিবেশন আবার আহুত হয়। সরকার দলীয় স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন একজন সদস্য। ২৩ সেপ্টেম্বর সংসদে সংঘটিত গোলযোগের একপর্যায়ে আহত হয়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারা যান। ঘন ঘন ক্ষমতার রদবদল রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিভেদ এবং ধবংসাত্মক কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে প্রধান সেনাপতি আইউব খান সারা দেশে সামরিক শাসন ঘোষনা করেন।

সামরিক শাসন জারির সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ এক ঘোষনা বলে পূর্ব পাকিস্তানের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র সংসদ গুলোকে বাতিল করে দেন। বিক্ষুব্দ ও সচেতন ছাত্রদের ঘাটি বলে পরিচিত এ রকম অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বিক্ষোভের উস্কানিদাতা বলে পরিচিত অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন গুলোর অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সামরিক শাসনাধীনে ছাত্র সংগঠনের নামে প্রকাশ্য রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেই শুধু নয়, নির্বাচনেও তাঁরা সাংস্কৃতিক সংগঠন ঘেঁষা নাম দিয়ে মাঠে নামে।[২৫]

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ঃ- ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইউব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার পর নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে গঠিত হয় ইষ্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি নামে আধুনিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সশস্ত্র দল। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করা এ দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মপুত্র নদীতে একটি বড় নৌকায় এই পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সনের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে আনুষ্ঠানিক গোপন বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। আইউবের

২৫। সাক্ষাতকার ঃ ফেরদৌস আহম্মদ কোরেশী। (সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি)

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে মিলিত সংগ্রাম পরিচালনা বিষয়ে যৌথ কর্মসূচী প্রনয়ন এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে মনিসিং ও খোকা রায় যোগদান করেন। দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে উপস্থিত থাকেন নোয়াখালীর সন্তান প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী। এ বৈঠকে আইউব বিরোধী আন্দোলনের যে কর্মসূচী তৈরী করা হয় তা হলঃ-

১। পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন করা।
২। পূর্ব বঙ্গের জন্য স্বায়ত্বশাসন আদায়।
৩। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতি সমুহের জন্য স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তোলা।
৪। রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী।
৫। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
৬। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা।
৭। কৃষকের খাজনা, ট্যাক্স হ্রাস করা এবং
৮। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন শীর্ষক নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কথাও বলা হয়েছিল এ রূপরেখায়।[২৬]

উপরোক্ত রূপরেখার আলোকে আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি পর্বে ১৯৬২ সনের ৩০ জানুয়ারী করাচিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬২ সনের ছাত্র আন্দোলন ঃ- আইউব খানের সামরিক শাসনের প্রতিবাদ এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়েতোলা সে সময়ে ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং সাফল্য লাভ করে। দীর্ঘ চার বছর পর বাষট্টিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আইউবের স্বৈরশাসনের ভিতে প্রথম আঘাত হানে ছাত্ররা। বাষট্টির এই আন্দোলনের তিনটি পর্যায়[২৭] ছিলঃ-

১। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাতে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূচনা (ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত)
২। আইউব খান প্রবর্তিত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন (মার্চ-এপ্রিল)
৩। আইউব প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন (সেপ্টেম্বর-আক্টোবর)

ইতিমধ্যে বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে থেকেও ছাত্রদের দাবীর পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। ফলে কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ছাত্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। আগষ্ট মাস থেকে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শরীফ কমিশনের সুপারিশের বাস্তবায়ন শুরু হয়। ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন অগ্রহণযোগ্য বলে তার প্রতিবাদ করে। ছাত্র অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিনে সরকার শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষনা দেয়। একই সঙ্গে এক উদ্ভট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৬৩ সনের জন্য যে সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষায় ফরম পুরন করেছিলো, পরীক্ষা না দিয়েই তাদের সবাইকে পাশ করিয়ে দিয়ে ডিগ্রী প্রদান করার কথা ঘোষনা করা হয়। এভাবে আংশিক বিজয়ের

২৬। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট পৃঃ ৫১-৫২।
২৭। মোহাম্মদ হাননান; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (কলকাতা ১৯৯৬) পৃঃ-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে বাযষ্টির আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে।] এই আন্দোলন ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক সংগঠন সমুহের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দেয়। শুধু শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক ও বিশাল আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে তা ছিল নেতৃবৃন্দের জন্য একটি বিরাট অভিজ্ঞতা।

চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সমার্তন উৎসবঃ- সামরিক স্বৈরাচার আইউব বিরোধী মনোভাব যখন দেশবাসীর মনে তুঙ্গে, তখন এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমগ্র জনমানস বিপযস্ত হয়ে পড়ে। ঘটনার শুরু হয় কাশ্মীরের হরতালকে কেন্দ্র করে। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান, পরে বাঙ্গালী--বিহারী দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৪ সনের ৭ জানুয়ারী থেকে ঢাকা, আদমজী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমুহে পেশাদার গুন্ডা বাহিনীর নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী বাঙালী-বিহারী দাঙ্গায় শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৮] দাঙ্গা বিরোধী বক্তব্য ও কর্মসূচী নিয়ে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন সমূহ এবং বুদ্ধিজীবিগণ দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় মানবতা রক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বলা চলে এই সাংগঠনিক তৎপরতা ও দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে "পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাড়াও" আন্দোলনের ভিত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা তৎকালীন গর্ভণর আইউব খানের ঘনিষ্ট ব্যক্তি স্বৈরাচার মোনায়েম খাঁনের হাত থেকে সনদ পত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ডাকসু সমাবর্তন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ছাত্র বিক্ষোভ দ্বিগুন বেড়ে যায়। ফলে পূর্ব বাংলার প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ছাত্র অসন্তোষ আরো বেড়ে গেলে আইউব খান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে ছাত্র অসন্তোষের কারণ সমূহ বের করার জন্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি ছাত্র সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর মন্তব্য করে সমস্যা আরো বাড়িয়ে তোলেন এবং শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন ঘোষনা করলেন। স্বাভাবতই ছাত্ররা হামুদুর রহমান প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে নতুন করে রাজ পথে নামে। কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার পূর্বেই পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দেখা দেয় নতুন সংকট। এবছর অনুষ্ঠিত হয় পকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইউব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থীহন মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ভোট দাতা ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীরা-এদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ হাজার। এদের অভিহিত করা হতো আইউবের 'আশি হাজার ফেরেস্তা' বলে। চরম দূর্নীতি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে আইউব খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র আড়াই হাজার ভোট বেশী পান।

মুক্তির সনদ ছয়দফাঃ-আইউব খানের দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারতযুদ্ধ, তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব বাংলার জনমনে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির উদাসিনতা ও দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য মূলক আচরনের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষনা ছিল পূর্ব বাংলার ইতিহাসে "মেঘনা কার্টা" স্বরূপ। আইউব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে সমগ্র পাকিস্তানের

২৮। ১৫ জানুয়ারী, ১৯৬৪ দাঙ্গা বিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাতে গিয়ে নবাবপুর রেলক্রসিরয়ের সামনে নিহত হন আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী। ১৬ জানুয়ারী, ১৯৬৪ বিহারীদের আক্রমনে নিহত হন নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভার্ক।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য "নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স" আহ্বান করেন। শেখ মুজিব এ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবী পেশ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৬৬ সনে ৬ দফা পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে শাসক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি প্রথম আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের কাছে। এ প্রেক্ষাপটে ৬ দফা ছিল বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ। ফলে বাঙালীর মুক্তিসংগ্রাম নতুন ভাবে গতি লাভ করে।

৬ দফার রূপ রেখাঃ-

প্রস্তাব একঃ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিঃ- দেশে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্র সংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনিন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জন সাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব দুই ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাঃ- কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা- দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্র গুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব তিন ঃ মুদ্রাও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ- মুদ্রার ব্যাপারে নিম্ন লিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রির্জাভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব চার ঃ রাজস্ব, শুল্ক ও কর সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ- ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্র গুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় অঙ্গরাষ্ট্র গুলির সব রকম করের ক্ষমতা শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব পাঁচ ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতাঃ- (ক) ফেডারেশন ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। (খ) বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্র গুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে। (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্র গুলিই মিটাবে। (ঘ) অঙ্গ রাষ্ট্র গুলির মধ্যে দেশজ দ্রবাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। (ঙ) শাসনতন্ত্র অঙ্গ রাষ্ট্র গুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বানিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব ছয় ঃ আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতাঃ- আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যে শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্র গুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[২৯]

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন সারা দেশে দানা বেধে উঠতে থাকে। কেন্দ্রিয় সরকারও এ আন্দোলনকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষনা করার ষড়যন্ত্রের জন্য কয়েকজন বাঙালী সামরিক অফিসার, সাধারণ সৈনিক এবং সি,এস,পি অফিসারসহ মোট ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে এই পরিকল্পনার হোতা বলে উল্লেখ করা হয়। "রাষ্ট্রদ্রোহী" হিসেবে শেখ মুজিবকে সামরিক বিধির আওতায় ১৮ জানুয়ারী গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সনের ১৯ জুন কড়া নিরাপত্তায় কুমিটোলা সেনানিবাসের অভ্যান্তরে শেখ মুজিবের বিচার কার্য শুরু হয়। সরকার এব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করলেও চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করতে সমর্থ হননি। তাঁরা ভেবেছিলেন সংবাদপত্রে এ সব বিষয় পড়ে সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের উপর রুষ্ট হয়ে পড়বে এবং তাঁর রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এই মামলা সরকারের জন্য "বুমেরাং" হয়ে দেখা দেয়। সকল নির্যাতন, ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলার স্বাধীনতাকে আরো একধাপ এগিয়ে দেয়।

<u>উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান</u> ঃ- ১৯৬৮ সনে আইউব খান তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের দশ বছর পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনে দেশের উন্নতির স্মৃতি চিরস্থায়ী করার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পূর্ব বাংলার জনগন এই উদ্যোগে তেমন উৎসাহ বোধ করে নাই। পূর্ব বাংলার পাশাপাশি এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে জেড,এ, ভূট্টোর নেতৃত্বে আইউব বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকে আওয়ামী লীগ দ্রুত জনপ্রিয় দলে পরিণত হলেও সরকারি নির্যাতনে সাংগঠনিক ভাবে দলটি ছিল বিপর্যস্ত। তার পরও ১৯৬৮ সনের নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আন্দোলনমূখী হতে থাকে। ২৯ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবিরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করলে এতে পথচারীরাও অংশ গ্রহণ করে। এসময় আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে। মাওলানা ভাসানীর সার্বিক নেতৃত্বে ১৯৬৯ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্র সমাজ এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঐক্য স্থাপন করে কর্মসূচী ঘোষনা এবং আন্দোলনে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করে। বায়ান্নর পর সামরিক শাসন বিরোধী প্রথম জাগরণ ঘটায় ছাত্ররা বাষট্টি সনে। এর পর প্রতিটি মাস, প্রতিটি বছর এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে যে, কোন না কোন ব্যাপার নিয়ে ছাত্রদের রাজ পথে নামতে হয়। উনসত্তরে এসে প্রচন্ড রুদ্ররোষে ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যে রাস্তায় নেমে পড়ে তার বড় কারন গুলো হচ্ছেঃ-

---

২৯। শেখ মুজিবর রহমান ; আমাদের বাঁচার দাবী : ৬ দফা কর্মসূচী (পুস্তিকা) (প্রকাশক, আবদুল মোমিন, প্রচার সম্পাদক ; পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১, পুরান পল্টন, ঢাকা-২, পুনঃমুদ্রন, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। মূল্য০.২৫ টাকা) থেকে সংক্ষিপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১। পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক দীর্ঘ দিন ধরে অর্থনৈতিক ভাবে চরম শোষন এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা খাতকে নিরন্তর অবহেলা ও বঞ্চনা। ফলে এই অঞ্চলের জনমানসে শ্রেনীদ্বন্দের উদ্ভব এবং এই সব বঞ্চনা, অবহেলা ও অর্থনৈতিক শোষন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্খা প্রসূত চেতনার বিকাশ।

২। বাঙালী রাজনীতিবিদ ও সামরিক অফিসারসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের এবং ১৯৬৮ সনের ১৯ জুন থেকে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিচার শুরুর ঘটনা।

৩। বেতার ও টেলিভিশনে পুনরায় রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষনা।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষার তথাকথিত সংস্কার জনিত পুনঃ প্রচেষ্টার ঘটনা।

৫। আইউব খানের শাসনামলের একদশক পূর্তি এবং তথাকথিত শাসন মহাত্ম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সাফল্যের প্রচার ডামাডোল এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের অর্থব্যয়ের ঘটনা।[৩০]

কিন্তু এ জাতীয় কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সকল দল ও সংগঠনের মিলিত কর্মসূচী ভিত্তিক একটি মঞ্চ তৈরী করা ছিল কঠিন ব্যাপার। অবশেষে ছাত্র সংগঠন সমূহ ঐক্যবদ্ধ ১১ দফা কর্মসূচী প্রনয়ন করে। সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রলীগ সমর্থিত ৬ দফাকে ১১ দফার (প২) অন্তভুক্ত করা হয়।[৩১]

ছাত্রদের কর্মসূচী ঘোষনার তিনদিন পর অর্থাৎ ৮ জানুয়ারী ১৯৬৯ ইং রাজনৈতিক দল গুলো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করার লক্ষ্যে ৮ দফা দাবী নামার একটি মিলিত কর্মসূচী ঘোষনা করে। "ডাক" (Democratic Action Committee) নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কিন্তু ৬ দফা ও ১১ দফাকে কেন্দ্র করে ছাত্র জোট ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দুই জোটই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী ঘোষনা করে। ইতিমধ্যে সরকার সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হয় (২০ জানুয়ারী, ১৯৬৯)। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদ স্মরনে হরতালসহ তিনদিন ব্যাপি কর্মসূচী ঘোষনা করে। ২৪ জানুয়ারী হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ছাত্র কর্মী রুস্তম আলী ও কিশোর মতিউর রহমান। এ অবস্থায় জনতা আরো জঙ্গী হয়ে উঠলে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। আরো রক্তপাত এড়াতে নেতৃবৃন্দ কঠোর কর্মসূচী দানে বিরত থাকেন। গর্ভণর মোনায়েম খান লাগাতার সান্ধ্য আইন জারী করে শহর নিয়ন্ত্রনের ভার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেন। ১ ফেব্রুয়ারী আইউব খান কিছুটা নমনীয় হয়ে আলাপ- আলোচনার প্রস্তাব দিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডাক নেতৃবৃন্দ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষনা দেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকা সেনানিবাসে ষড়যন্ত্র মূলকভাবে

৩০। মোহাম্মদ হাননান ; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। পৃ ঃ-১৫৭

৩১। সাক্ষাতকার ; সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলার আসামী নোয়াখালীর সন্তান সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ড আন্দোলনে অগ্নিতে ঘৃত সঞ্চার করে। প্রাদেশিক যোগাযোগমন্ত্রী সুলতান আহমদ ও পূর্তমন্ত্রী মংশুপ্রু চৌধুরীর আবদুল গনি রোড়স্থ সরকারি বাসভবনে জনতা অগ্নি সংযোগ করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারক এম,এ, রহমানের বাসভবনসহ অনেক সরকারি অফিস ও ভবন জনতার রোষানলে ভস্মীভূত হয়। এসময় রাজশাহীতে সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। উন্মত্ত জনতার চাপে সরকার ২১ ফেব্রুয়ারী ছুটি ঘোষনা করে এবং ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিব ছাত্রদের ১১ দফাকে সমর্থন করেন। ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে রাতের অন্ধকারে সপরিবারে গর্ভণর মোনয়েম খান ঢাকা থেকে পালিয়ে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে বুঝতে পেরে আইউব খান উপায়ন্তর না দেখে সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ইয়াহিয়া খান নতুন করে সামরিক আইন জারী করে সাময়িকভাবে ছাত্রগণ আন্দোলন নিয়ন্ত্রন করেন। উনসত্তরের এই গণআন্দোলনে বৃহত্তর নোয়াখালীতে বিক্ষুব্দ জনতার উপর পুলিশের গুলিতে সর্বমোট পাঁচজন নিহত হয়।[৩২]

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিঃ- ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক কোন প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখা যায়নি। বাংলার জনগণ সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নিময়তান্ত্রিকভাবে তাদের দাবী জানাতে থাকলে ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষনা করলেন আগামী ১৯৭০ সনের অক্টোবরে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে। তিনি এ দিন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল ঘোষনা করে, দেশের আসন্ন সংকটের বিস্তারিত বিবরণ দেন। ইয়াহিয়ার ঘোষনার সম্পর্কে আবুল মুনসুর আহমদ লিখেছেন " আমাদের শাসক গোষ্ঠীর প্রায় সকলের স্বীকৃত মতেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ও জনগণ পুনঃ পুনঃ ধবংসের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছে। প্রতিবারই একজন রক্ষাকর্তা আসিয়া আমাদের সে "আসন্ন ধবংসের" হাত থেকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু প্রতিবারই আমরা ধবংসের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছি। প্রতিবারই পরের বারের রক্ষাকর্তা আসিয়া বলিতেছেন : এমন ঘোর সংকট পাকিস্তানের জীবনে আর হয় নাই। একথার তাৎপর্য এই যে, আগের বারের রক্ষাকর্তা যে পরিমান বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন পরের বারের রক্ষাকর্তার সামনের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশী ঘোরতর। একথার মানে এই যে, আগের বারের রক্ষাকর্তা আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া আরো বেশী বিপদে ফেলিয়াছেন। গোলাম মোহাম্মদ হইতে জেনারেল আইউব, জেনারেল আইউব হইতে জেনারেল ইয়াহিয়া সবাই পাকিস্তানকে আসন্ন ধবংসের হাত হইতে রক্ষাও যেমন করিয়াছেন, দেশকে তেমনি ধবংসের আরো কাছে পাইয়াছেন। দুই দুইবারই মার্শাল 'ল' প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। - - - পুনঃ পুনঃ মার্শাল লই আমাদের বারাত।[৩৩]"

ইতিমধ্যে নির্বাচনের তারিখ আক্টোবর থেকে পিছিয়ে ডিসেম্বরে নেয়া হয় বণ্যার কারণে। অন্যান্য দলের মত আওয়ামী লীগও পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল আসনে প্রার্থী দেয়। টেলিভিশনে প্রদত্ত তার নির্বাচনী ভাষনে বলেন-"

৩২। মোহাম্মদ হাননান ; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস । পৃ-১৭২

৩৩। আবুল মুনসুর আহমদ ; আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। পৃ-৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

Within such a federal democratic framwork, radical economic programmes must be implemented to bring about a social revolution ,------ we therefore, serve notice upon the forces of reaction in our society that we, along with the poeple of pakistan will confront them and if democratic processes are abstructed, we shall resist them by every means possible[৩৪] ".

এসময় পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা গুলোর বিশেষকরে পশ্চিমে পটুয়াখালী থেকে পূর্বে সন্দ্বীপের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চল, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় বিস্তীর্ন এলাকার উপর দিয়ে মহাপ্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছাস বয়ে যায় (১২ নভেম্বর ১৯৭০)। এতে প্রায় দশ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। জলোচ্ছাস কবলিত এলাকায় নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয় কয়েকদিন। পূর্ব পাকিস্তানের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে একমাত্র ওয়ালী খান ছাড়া কোন রাজনৈতিক নেতা এসে দাঁড়ায়নি।

১৯৭০ সনের পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচন বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একটি পোষ্টার খুব আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" শীর্ষক পোষ্টারে বর্ণিত বিষয় জনগণকে জঙ্গী করে তোলে এবং আওয়ামী লীগের প্রতি জন সমর্থন আরো নিশ্চিত হয়। আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয়ের পশ্চাতে অনেক কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সংক্রান্ত এ পোষ্টারটি প্রভূত ভূমিকা রাখে। পোষ্টারটি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১। উন্নয়ন খরচ	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
২। বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
৩। আমদানি	২৫%	৩৫%
৪। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি	১৫%	৮৫%
৫। সামরিক বাহিনী	১০%	৯০%
৬। চাল (প্রতিমন)	৫০ টাকা	২৫ টাকা
৭। আটা (প্রতিমন)	৩০ " "	১৫ " "
৮। সরিষার তেল (প্রতিমন)	২০০ " "	১০০ " "
৯। সোনা (প্রতি তোলা)	১৭৫ " "	১৩৫ " "

আবদুল মমিন, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ , ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।[৩৫]

৩৪। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, দ্বিতীয় খন্ড। পৃ ঃ ৫৫৩-৫৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬২ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি, পি,ডি,পি ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি আসন লাভ করে। পরে বিজয়ী স্বতন্ত্র সদস্য আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বৃহত্তর নোয়াখালীর নিম্নলিখিত ৮ জন আওয়ামী লীগ নেতা জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসাবে জয়লাভ করেনঃ

	নাম	আসন নং	নির্বাচনী এলাকা
১।	ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	এন,ই-১৪৫ নোয়াখালী-১	পরশুরাম থানা, ছাগলনাইয়া থানা, এবং ফেনী থানার-লেমুয়া, জালিয়া, কালিদহ, মটবী, ফাজিলপুর, চানুয়া ও ফরহাদ নগর ইউনিয়ন।
২।	খাজা আহমদ	এন,ই-১৪৬ নোয়াখালী-২	ফেনী থানার উপরোক্ত ৭টি ইউনিয়ন বাদে ফেনী থানা এবং সোনাগাজী থানা।
৩।	নুরুল হক	এন,ই-১৪৭ নোয়াখালী-৩	সেনবাগ থানা এবং বেগমগঞ্জ থানার চৌমুহনী, শরীফপুর, রসুলপুর, কুতুবপুর, দুর্গাপুর মীরওয়ারিশপুর, একলাশপুর, রাজগঞ্জ, ছয়ানী, বেগমগঞ্জ এবং আলিয়ারপুর ইউনিয়ন।
৪।	আবদুল মালেক উকিল	এন,ই-১৪৮ নোয়াখালী-৪	কোম্পানী গঞ্জ থানা ও সুধারাম থানা।
৫।	এডভোকেট দেলওয়ার হোসেন	এন,ই-১৪৯ নোয়াখালী-৫	হাতিয়া ও রামগতি থানা।
৬।	খালেদ মোহাম্মদ আলী	এন,ই-১৫০ নোয়াখালী-৬	লক্ষ্মীপুর থানা।
৭।	অধ্যাপক মোঃ হানিফ	এন,ই-১৫১ নোয়াখালী-৭	নোয়াখালী-৩ আসনে উল্লেখিত বেগমগঞ্জ থানার ১৩টি ইউনিয়ন বাদে পুরো থানা এবং রামগঞ্জ থানার খিলপাড়া, নয়াখোলা, চাটখিল, পাঁচগাঁও মোহাম্মদপুর, বদলকোট ও রাম-নারায়নপুর ইউনিয়ন।
৮।	মোঃ আবদুর রশিদ	এন,ই-১৫২ নোয়াখালী-৮	রামগঞ্জ থানার উপরোক্ত ৭টি ইউনিয়ন বাদে বাকী থানা এবং রায়পুর থানা।

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বৃহত্তর নোয়াখালীর ১৪ জন বিজয়ী নেতৃবৃন্দ ঃ-

	নাম	আসন নং	নির্বাচনী এলাকা
১।	এ,এফ,কে, সফদার	পি,ই-২৬৭ নোয়াখালী-১	নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার পরশুরাম থানা এবং শুভপুর ও গোপাল ইউনিয়ন বাদে ছাগলনাইয়া থানা।
২।	মৌলভী খায়ের উদ্দিন	পি,ই-২৬৮ নোয়াখালী-২	ছাগলনাইয়া থানার শুভপুর ও গোপাল ইউনিয়ন এবং ফেনী সদর থানার চেন্নুয়া, সরিষাদি, ধর্মপুর, মটবী, কাজিরবাগ, ফাজিলপুর, বারহীপুর, কালিদহ, ফেনী শহর কমিটি পাঁচগাঁছিয়া, ফরহাদনগর ও লেমুয়া ইউনিয়ন।

৩৫। Rangalal Sen ; Political Elites in Bangladesh (UPL Dhaka)

Dhaka University Institutional Repository

৩।	এ,বি,এম, তালেব আলী	পি,ই-২৬৯ নোয়াখালী-৩	সোনাগাজী থানা এবং ফেনী থানার ডালিয়া, বালিগাঁও, মাতু ভূঁইয়া ও জয়লস্কর ইউনিয়ন।
৪।	আবু নাসের চৌধুরী	পি,ই-২৭০ নোয়াখালী-৪	কোম্পানীগঞ্জ থানা এবং ২ ও ৩ নং আসনে উল্লেখিত ইউনিয়ন গুলো বাদে ফেনী থানার বাকী অংশ।
৫।	আবদুস সোবহান	পি,ই-২৭১ নোয়াখালী-৫	সেনবাগ থানা এবং বেগমগঞ্জ থানার কতুবপুর, দুর্গাপুর, ও রসুলপুর ইউনিয়ন।
৬।	মাষ্টার রফিক উল্লা মিয়া	পি,ই-২৭২ নোয়াখালী-৬	বেগমগঞ্জ থানার জয়াগ, নদোনা, সোনাইমুড়ি, বজরা, সোনাপুর, আমিশাপাড়া, আমানুল্লাপুর, গোপালপুর, মীরওয়ারিশপুর, গনিপুর, বড়গাঁও, আম্বরনগর, ডেউটি বাজার, ও নাথেশ্বর ইউনিয়ন।
৭।	মোঃ শাখাওয়াত উল্লা	পি,ই-২৭৩ নোয়াখালী-৭	উপরোক্ত ৫ ও ৬ নং আসনের উল্লেখিত ইউনিয়ন গুলো বাদে বেগমগঞ্জ থানার বাকী অংশ।
৮।	নুরুল আহমদ কালু মিয়া	পি,ই-২৭৪ নোয়াখালী-৮	খিলপাড়া, রামনারায়ন পুর, নয়াখোলা, চাটখিল, পাঁচগাঁও, সাহাপুর, ও করপাড়া ইউনিয়ন বাদে রামগঞ্জ থানার বাকী অংশ।
৯।	মোহাম্মদুল্লাহ	পি,ই-২৭৫ নোয়াখালী-৯	রায়পুর থানা এবং লক্ষীপুর থানার চররুহিতা, দালালবাজার, ও দক্ষিন হামছাদী ইউনিয়ন।
১০।	বিছামল্লাহ মিয়া	পি,ই-২৭৬ নোয়াখালী-১০	রামগঞ্জ থানার খিলপাড়া, রামনারায়ন পুর, নয়াখোলা, চাটখিল, পাঁচগাঁও, সাহাপুর,ও করপাড়া ইউনিয়ন এবং লক্ষীপুর থানার চন্দ্রগঞ্জ, হাজিরপাড়া, উত্তর জয়পুর, দওপাড়া, পার্বতীনগর, বশিকপুর, ও উত্তর হামছাদী ইউনিয়ন।
১১।	মোঃ আবদুল মোহাইমেন	পি,ই-২৭৭ নোয়াখালী-১১	উপরোক্ত ৯ও ১০ আসনে উল্লেখিত ইউনিয়ন গুলো বাদে লক্ষীপুর থানার বাকী অংশ এবং সুধারাম থানার চরমাতুয়া, দাদপুর ও কালাদোরাপ ইউনিয়ন।
১২।	শহীদ উদ্দিন এক্কান্দার	পি,ই-২৭৮ নোয়াখালী-১২	চরমাতুয়া, দাদপুর, ও কালাদোরাপ ইউনিয়ন বাদে সুধারাম থানা।
১৩।	সিরাজুল ইসলাম	পি,ই-২৭৯ নোয়াখালী-১৩	রামগতি থানা।
১৪।	আমিরুল ইসলাম কালাম	পি,ই-২৮০ নোয়াখালী-১৪	হাতিয়া থানা।

কিন্তু আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের কোন আসন না পাওয়ায় দলটি পাকিস্তানের জাতীয় পারিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পাওয়া সত্বেও আঞ্চলিক মর্যাদার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে যে বিশাল ভূখন্ড, সেখানে আওয়ামী লীগের হয়ে কথা বলার কেউ ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফলও এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল অভাবিত। পাকিস্তানি শাসকদের ধারণা ছিল, পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দল গুলো নির্বাচনে একক আসন লাভ করবে কিন্তু তা হয়নি। ১৯৭১ সনের ৪ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে প্রাকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।[৩৬] জনগণের সামনে প্রকাশ্যে এভাবে জনপ্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠান দেখার জন্য এদিন রেসকোর্স ময়দানে জনতার ঢল নেমেছিল। বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতিক স্বরূপ ১৭ টি কবুতর বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দেন। শ্লোগান উঠে- (১) আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ (২) জাগো জাগো-বাঙালী জাগো (৩) জয় বাংলা ও আরো অন্যান্য। বঙ্গবন্ধু এদিন তার ভাষনে আরো বলেন-" শুধু নির্বাচনে জয় লাভ করলেই দাবী আদায় হয় না। দাবী আদায়ের জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে।" এ দিনই বঙ্গবন্ধু তাঁর দলীয় কর্মীদের প্রতিটি ইউনিয়ন ও মহল্লায় দূর্গ গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ষড়যন্ত্রের করণে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তবু আপনারা নিরস্ত্র হবেন না। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা যদি বিশ্বাস ঘাতকতা করে, তাহলে তিনি তাদের জ্যান্ত কবর দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

<u>সংকটের শুরু</u>ঃ- সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং নির্বাচনের ফলাফল ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কূটকৌশলের প্রেক্ষাপটে ৩ মার্চ ১৯৭১ ইং ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়।[৩৭] ভুট্টো এসময় ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচিত হলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি দেন। ভুট্টোর অনড় মনোভাবের কারণে নতুন করে সংকটের শুরু হয়। ইয়াহিয়া ভুট্টোর গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসতে শুরু করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রনয়নের প্রশ্নে অটল থাকেন। বিভিন্ন মূখী তৎপরতার মূখে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা সংকটের একটা গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা পেশ করেন। তিনি বলেন ;"পাকিস্তানের প্রদেশের উপর তিনি ৬ দফা চাপিয়ে দিবেন না।.....তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে ৬ দফা পুরোপুরি কার্যকর হতে হবে। আমি পাকিস্তান বিপন্ন হওয়ার ধুয়া আর শুনতে রাজী নই"।[৩৮] ২৭ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় শেখ মুজিবর রহমানের সভাপতিত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করেন ডঃ কামাল হোসেন। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা গ্রহনে উন্মুখ বাঙালীর আশা আকাঙ্খাকে ধূলিস্যাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১মার্চ ১৯৭১, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষনা করেন। ঐদিন এক সরকারি ঘোষনা বলে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর ভাইস এডমিরাল এস,এম, আহসানকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর স্থলে খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে, জেলারেল সাহেব জাদা ইয়াকুব খানকে নিযুক্ত করা হয়। গর্ভণর আহসান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে গুজব ছিল। দেশের অন্যান্য প্রদেশেও একই ধরনের পরিবর্তন ঘটলো। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিল দেশ আবার কঠোর সামরিক ব্যবস্থার দিকে যাচেছ। এসময় ঢাকার রাজ পথে হাজার হাজার বিক্ষুব্দ ছাত্র, জনতা, কর্মচারী, শ্রমিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষ নেমেপড়ে। এক বিশাল জনতা মতিঝিলের হোটেল পূর্বানী চত্বরে সমবেত হয়ে সেখানে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী নির্দেশের জন্য উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার অর্জনের কর্মসূচী ঘোষনা করবেন বলে জানান এবং ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালনের আহবান জানান।

৩৬। <u>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র</u> ; দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৫৮৭।
৩৭। <u>বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র</u> ; দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৬২৮।
৩৮। মোহাম্মদ হাননান ; <u>বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস</u>, পৃ-২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

এসময় অন্যান্য দলের নেতারাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজপথে এই প্রথম প্রকাশ্যে স্বাধীনতার শ্লোগান উঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতার কণ্ঠে। ইয়াহিয়ার ঘোষনা- বাঙালীরা মানে না, পদ্মা মেঘনা যমুনা-তোমার আমার ঠিকানা, পাকিস্তানের পতাকা- জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও ; বীর বাঙালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর ; জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান- আজিমপুরের গোরস্থান ইত্যাদি শ্লোগান মুখরিত জনতা শোভা যাত্রার পর শোভাযাত্রা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় ১ মার্চ, ১৯৭১। ২ মার্চ বটতলায় ছাত্রলীগের সভায় নোয়াখালীর সন্তান ডাকসু সহসভাপতি আ.স.ম, আবদুর রব ও অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন, যা উপস্থিত লাখো জনতাকে সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ৩ মার্চ ইহাহিয়া খান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ঢাকায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত নেতাদের একটি বৈঠক ডাকেন। বঙ্গবন্ধু এই বৈঠক প্রত্যাখান করেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। পল্টন ময়দানে এ দিন যে ইশতেহার পাঠ করা হয়, তাতে ছাত্রলীগের প্রথম ইশতেহার স্মারক দেয়া হয় যা পরবর্তী কালে "স্বাধীনতার ইশতেহার" (প৩) নামে পরিচিত হয়। পল্টনের জনসভা শেষে আন্দোলনের এ পর্যায়ে শ্লোগান[৩৯] নির্ধারিত হয়ঃ-

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ	- দীর্ঘজীবি হউক
স্বাধীনকর স্বাধীনকর	- বাংলাদেশ স্বাধীন কর
স্বাধীন বাংলার মহান নেতা	- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
গ্রামে গ্রামে দূর্গ গড়	- মুক্তিবাহিনী গঠন কর
বীর বাঙালী অস্ত্র ধর	- বাংলাদেশ স্বাধীন কর
মুক্তি যদি পেতে চাও	- বাঙালীরা এক হও।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনঃ- বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ তাঁর কর্মসূচী ঘোষনা করবেন- একথা ১ মার্চ পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার পরই সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষনা করেছিলেন। ফলে ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভার জন্যে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী যেমন, তেমনি পাকিস্তানের সকল রাজনীতি সচেতন মানুষও উৎকণ্ঠচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুরদুরান্ত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষন শোনার জন্য সমবেত হয়। বঙ্গবন্ধু সভায় দৃঢ়চিত্তে ঘোষনা করেন ঃ (১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। (২) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। (৩) বাঙালী হত্যার তদন্ত করতে হবে। (৪) আর জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়ে তিনি ঘোষনা করেন-"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৪০]"

৩৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র ; দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৬৬৬-৬৬৮।
৪০। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষন সরাসরি বেতার মারফত প্রচার করার দাবী উঠেছিল আগে থেকেই। কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত ৭ মার্চ সরাসরি ভাষন প্রচার করেনি। বেতার কর্মচারীদের দাবী ও আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত ৮ মার্চ সকালে ভাষনটি কোন রকম কাট-ছাট ছাড়াই পুনঃ প্রচার করা হয়। ৮ মার্চ সকালে সমগ্র বাঙালীজাতি ঢাকা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষন একযোগে শুনতে পান এবং সে অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

৭ মার্চের ভাষন (প৪) ছাত্র জনতার পাশাপাশি বাঙালী সৈনিকদেরকেও উদ্দীপ্ত করেছিল। এ সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন বাঙালী সামরিক অফিসার জিয়াউর রহমান (যিনি ১৯৭১ এ ছিলেন মেজর, পরবর্তী কালে মেজর জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি) এক প্রবন্ধে লেখেনঃ "৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষনা আমাদের কাছে এক "গ্রীন সিগন্যাল" বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্তরূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।[৪১]" ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবর রহমানও পরবর্তী কালে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। ইংরেজ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রষ্টের সাথে এক সাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৯৭২ সনে এক সাক্ষাতকারে বলেনঃ" আমি জানতাম কি ঘটতে যাচ্ছে। তাই আমি ৭ মার্চ রেসকোর্স মাঠে চূড়ান্ত ভাবে ঘোষনা করেছিলাম এটাই স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধে করার মোক্ষম সময়। - - - - - - আমি চেয়ে ছিলাম পাকিস্তানিরাই প্রথম আমাদের আঘাত করুক। আমার জনগণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।[৪২]"

এভাবে ৭ মার্চের ভাষন বাংলার মানুষকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষনই প্রতিদিন বাজিয়ে শোনান হতো বাঙালী যোদ্ধাদের মনোবলকে অটুট রাখার জন্য। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এদিনে নতুন গর্ভণর করে পাঠান লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। টিক্কা খান ৭ মার্চ বিকালে ঢাকা আসেন। ৭ মার্চের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নিম্নরূপ। (১) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনা (২) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক টিক্কা খানের মতো উগ্র মেজাজী সামরিক অফিসারকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর হিসাবে নিয়োগ। এ সব ঘটনার ভিতর দিয়েই দেশের ভবিষ্যত পরিস্থিতি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে পড়ে। মার্চের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র সংগ্রামের সমূহ সম্ভাবনা দেখতে পান। ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও কর্নেল ওসমানী প্রথম আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা করে এ সংক্রান্ত খুটিনাটি প্রস্তুত করেন। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক অফিসারও এসময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গোপনে দেখা করেন।[৪৩] ফলে কাউকে সুনির্দিষ্ট সময় তারিখ দিয়ে কোন নির্দেশ দেননি বঙ্গবন্ধু, দেয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

৪১। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন সম্পাদিত-বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৮৬) পৃ- ৪১৯-৪২০।

৪২। কর্নেল জিয়াউর রহমান ; একটির জাতির জন্ম ; দৈনিক বাংলা , ২৬ মার্চ ১৯৭২।

৪৩। ইংরেজ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রষ্টের সাথে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাতকার। বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্ ২য় খন্ড থেকে অনুদিত, / ডঃ হাননান।

Dhaka University Institutional Repository

অসহযোগ আন্দোলনঃ- টিক্কা খানের নিয়োগে জনতার রুদ্ররোষ আরো বেড়ে যায়। শুরু হয় সার্বিক অসহযোগ আন্দোলন। এর শুরুটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি নতুন গর্ভণর টিক্কা খানকে শপথ পাঠ করাতে অস্বীকার করেন। ফলে গর্ভণর হিসাবে তার পক্ষে সরকারি কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করে। ৯ মার্চ আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, মাওলানা ভাসানীসহ ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের ডাক দেন। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বলেন- " তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র রচনা কর, আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র রচনা করি।" পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মনিসিং) ও ছাত্র ইউনিয়ন এবং তোয়াহার সাম্যবাদী দল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সশস্ত্র লড়াই শুরু করার প্রস্তুতি নেয়ার আহবান জানান।

এদিকে জনতা পাকিস্তানি সেনবাহিনীর খাদ্য সরবরাহ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে কয়েদীরা পালানোর চেষ্টা করে। হাইকোর্টের বিচারপতিসহ সকল সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সকল শ্রেনীর নাগরিক অফিস বর্জন অব্যাহত রাখে এবং অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন করে। ঢাকা সফর শেষে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আজগর খান করাচিতে সংবাদিক সম্মেলনে বলেন- "কার্যতঃ শেখ মুজিবই পূর্ব পাকিস্তানে সরকার চালাচেছ তিনি শেখ মুজিবের শর্ত মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানান।" বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনকে আমেরিকার হোয়াইট হাউস কিংবা বৃটেনের ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে তুলনা করে মন্তব্য করে- "বঙ্গবন্ধুর বাসভবন এখন একটি অঘোষিত সরকারি দফতর"। ১৩ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্মকর্তাবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত নেন।

১৪ মার্চ ভুট্টো এক প্রস্তাবে দুই অঞ্চলের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করে পাকিস্তান ভাঙ্গার আনুষ্ঠানিক আয়োজন সম্পন্ন করেন। এদিনই বঙ্গবন্ধু ১১৫ নং সামরিক অধ্যাদেশের জবাবে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জনতার উদ্দেশ্যে ৩৫ দফা নির্দেশনামা (প৫) জারী করেন। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছুটি ভোগরত বাঙালী সৈনিকদের ক্যান্টনমেন্টে না গিয়ে স্ব স্ব এলাকায় সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহনের আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু -ইয়াহিয়া কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হয়েও যখন কোন সমাধানে পৌছাতে ব্যর্থ হন, তখনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষনা করে জয়দেবপুরের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও স্থানীয় জনতা যৌথভাবে।

১৯ মার্চের জয়দেবপুরের সেনাবিদ্রোহ এবং ২০ মার্চ পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের ট্রেনিং প্রাপ্ত গণবাহিনীর রাজপথে ডামি রাইফেল কাঁধে নিয়ে মার্চপাষ্ট করা, জনতাকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে দেশের সর্বত্র গণবাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ ছুটি ঘোষনা করেন এবং সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ "প্রতিরোধ দিবস" হিসাবে পালনের আহবান জানায় ও কর্মসূচী ঘোষনা করে। এদিকে ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোর ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ব্যর্থ হলে ২২ মার্চ ঘোষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন পূনরায় স্থগিত করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হন। একের পর এক

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন স্থগিত করার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়ার ব্যার্থতার ছবি পাকিস্তানের রাজনীতিতে ফুটে উঠে। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল সবুজ পতাকা উত্তোলন করলে মুক্তির ঘোষনা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন নামে এ দিবসটি পালন করে। জনতা প্রভাত ফেরীতে লাল সবুজ পতাকা হাতে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মিছিল করে। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী পল্টন ময়দানে জনসভা শেষে জয়বাংলা বাহিনী কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করে। ঢাকায় দূতাবাস গুলিতে তাদের ভবনের শীর্ষে নতুন পতাকা উড়িয়ে দেয়। এদিন ঢাকায় একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার শিরনাম হয়ঃ- " A new Flag is bron" এতে লেখা হয়ঃ- "A new flag is bron today- a flag with a golden map of Bangladesh implanted on a red circle placed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flags representing various states and nations of the contemporary world. This is the flag for "Independent Bangladesh." This is the flag that symbolizes the emancipation of 75 million Bangalees [৪৪];

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এদিন ক্যান্টনমেন্টে কাটান এবং ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ব্যস্ততা এবং নানমুখী তৎপরতা চলতে থাকে। এ অবস্থায় ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম,ভি, সোয়াত জাহাজ থেকে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার জনতা বন্দর এলাকা ঘেরাও করে। রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েও প্রতিরোধ ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অবাঙালী (বিহারী) অধ্যুষিত শহরে বাঙালী-বিহারী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে কারফিউ জারী করা হয় এবং সেনাবাহিনী অধিকাংশ শহরের নিয়ন্ত্রন ভার গ্রহণ করে। ঢাকায় তাজউদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকের পর ঘোষনা করেন, "আওয়ামী লীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে রাজী নয়"। ফলে এদিনই পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা দলে দলে ঢাকা ত্যাগ করতে থাকেন। ভূট্টোর দল বলেন- বর্তমান শাসনতান্ত্রিক সমস্যার প্রশ্নে আলোচনার জন্য তাদের উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ নীল নক্শা চুড়ান্ত করেই পাকিস্তানি নেতারা ঢাকা ত্যাগ করে।

<u>২৫ মার্চের গণহত্যা</u> ঃ- পাক সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে কামান ও ট্যাংক বহর নিয়ে বাঙালীদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বাড়ী ঘরে নিবির্চারে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় এবং বাঙালীদের হত্যা করতে থাকে। ধানমন্ডির বাড়ী থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে এ রাতেই গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার একটি বাণী বাংলার মানুষের কাছে পাঠানো হয় ঃ- "This may be my last message. From today, Bangladesh is independent . I call upon the people to Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist army of occupation to the last. You fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the said of Bangladesh and final victory is achieved[৪৫]. "

৪৪। দি পিপল্স (ঢাকা) ২৩ মার্চ ১৯৭১ / মোহাম্মদ হাননান ; পৃ-৩১২।
৪৫। <u>স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র</u>, ৩য় খন্ড, পৃ-১।

Dhaka University Institutional Repository

(এই-ই হয়তো তোমাদের জন্য আমার শেষবাণী। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। যে যেখানেই থেকে থাক, যে অবস্থায় থাক, হাতে যার যা আছে, তাই দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিংশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোল। ততোদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে, যতোদিন পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তানিদের শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিঃস্কৃত হচেছ এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচেছ।)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের এই ঘোষনা প্রচার করা হয় ই,পি,আর,(E.P.R) এর ওর্য়ালেস্ যোগে। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হচেছ। সেনাবাহিনী পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমন করেছে- এখবর বঙ্গবন্ধু পান গ্রেফতার হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। তৎক্ষনাৎ তিনি আরেকটি বার্তা পাঠান ঢাকার টি এন্ড টি মারফতে। তাতে বলা হলোঃ "পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ এর সদর দপ্তরে আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর আক্রমন করেছে। সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রতিরোধ করুন। আর স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিন।" বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ এই বার্তাটি নোয়াখালীতে পান তৎকালীন জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিম।[৪৬]

৪৬। সাক্ষাতকার ; মনযুর উল করিম (তৎকালীন জেলা প্রশাসক , নোয়াখালী) অবসর প্রাপ্ত সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধকালীন নোয়াখালীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠন

সাংগঠনিক পটভূমিঃ ১৯৬৯ সনে গণআন্দোলনের মাধ্যমে যখন আইউব খানের পতন ঘটে, তখন পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসনের নির্মম নিপীড়ন জুলুমের বিরোধীতা করতে গিয়ে বাংলার জনগন বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করল যে, ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত শান্তিপূর্ন গণসংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগনের পূর্ন গণতান্ত্রিক অধিকার স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা তো দুরের কথা নূন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতিও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি দিতে রাজী নয়। এই অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পুরোধা তৎকালীন আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে দুটো ধারা সক্রিয় ছিল। একটি শান্তিপূর্ন উপায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন বা যেনতেন ভাবে পূর্ব বাংলার জনগনের অধিকার প্রতিষ্ঠা। রেডিকেল জাতীয়তাবাদী ধারার বক্তব্য ছিল-"সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের" মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগনের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পরিনতিতে সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১] আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যে রেডিকেল জাতীয়তাবাদী যে গ্রুপ ছিল তার নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা দিয়েছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালীর তৎকালীন ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান। ছাত্র লীগের মধ্যে দুটো ধারা ছিল। তার অন্যতম ছিল সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন গ্রুপ। এরা ছিল স্বাধীনতার পক্ষে, অন্যরা চেয়েছিল স্বায়ত্ব শাসন। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় লাভের পর ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হয়। এ সভায় ৬৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং এ সভায় স্বাধীনতার বিষয়টি প্রস্তাবাকারে উপস্থাপন করা হয়। বক্তারা এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্ক হাজির করেন। এর পর ছাত্রনেতা স্বপন কুমার চৌধুরী সুনির্দিষ্ট প্রস্তার পেশ করেন। প্রস্তাব ছিল- ছাত্রলীগের সংগ্রাম হবে "স্বাধীন সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ"। এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। সিদ্ধান্ত হয় ভোটাভোটির মাধ্যমে এ প্রস্তাব গৃহিত হবে। কিন্তু নূরে আলম সিদ্দিকী সভা মূলতবী ঘোষণা করেন। ফলে সহ-সভাপতি মার্শাল মনিকে সভাপতি করে ৫৮-১১ ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয়। ভোর রাতে প্রস্তাবটি শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হয়।[২]

বৃহত্তর নোয়াখালীর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যেও উপরোক্ত চেতনার অনুসারী ছিল। নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের মূল সংগঠন ও সাধারন সম্পাদক নুরুল হক মিয়াসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের একটি বড় অংশ রেডিকেল ভাব ধারায় বিশ্বাসী ছিল। নুরুল হক মিয়া এক সময় আবুল হাসিমের ভক্ত ছিলেন। তখন

১। সাক্ষাতকার;আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক (আহবায়ক,বাসদ); তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা তাং-২৪.৬.৯৮।

২। সাক্ষাতকার ; আ.ও.ম. শফিক উল্লাহ, জি.এস, ইকবাল হল ছাত্র সংসদ ১৯৭০,৭১ (বর্তমান জহুরুল হক হল) ছাত্রলীগনেতা তাং ২৭.৬.৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই তিনি প্রগতিশীল ও রেডিকেল রাজনীতির অনুসারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়া নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের এক বিরাট অংশ ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে বিশেষ করে নোয়াখালীর তৎকালীন ছাত্র ও যুবনেতা মাহমুদুর রহমান বেলায়েত (এম,পি), মোমিন উল্যাহ (এডভোকেট), শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার (কচি), মৃত মুস্তাফিজুর রহমান, একরামুল হক, ফেনীর ভি,পি জয়নাল (বর্তমান বি,এন,পি নেতা), আবদুল ওয়াদুদ কাজী নূরন্নবী, লক্ষ্মীপুরের রফিকুল হায়দার চৌধুরী (বর্তমান প্রধান শিক্ষক বিজয় নগর হাই স্কুল) মুনছুর আহমেদ (বর্তমান অধ্যক্ষ লক্ষ্মীপুর মহিলা কলেজ) রায়পুরের নবী নেওয়াজ চৌধুরী বকুল (মৃত), আমীর হোসেন পাটওয়ারী (মৃত), জিয়াউল হক জিয়া (অধ্যাপক চৌমুহনী কলেজ) প্রমুখ ছাত্র ও যুব নেতাদের অনুসারী ছাত্র ও যুব কর্মীরা ছিল রেডিকেল ধারায় বিশ্বাসী। এর প্রমান পাওয়া যায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নোয়াখালীর রাজনীতিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) দ্রুত উত্থান।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয় বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে সংগঠিত করার জন্য। সারা দেশের মত বৃহত্তর নোয়াখালীতেও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ(ওয়ালী) প্রকাশ্যে কিন্তু গোপনে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন একমাত্র সংগঠন ছিল যার নেতা, কর্মী, সংগঠকগণ দেশের সর্বত্র বিশেষ করে নোয়াখালীতে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতি সেবীসহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এমনকি তৃনমূল পর্যায়েও জনগনকে সংগঠিত করে। এ সময় তোয়াহার সাম্যবাদীদল যা নোয়াখালীতে নক্সাল নামে পরিচিত ছিল, লেলিন- মাও সেতুংয়ের মত বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করে।

কিন্তু তৎকালীন রাজনীতির বাস্তবতায় নোয়াখালীর জনগণ ১৯৭০ সনে সবকয়টি আসনে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে। পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে শ্লোগান নোয়াখালীসহ আপামর বাংলার জনগনকে উজ্জীবিত করেছিল তা হলো পদ্মা মেঘনা যমুনা-তোমার আমার ঠিকানা; বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তখনকার জাতীয়তাবাদী শ্লোগান স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্খার স্বপ্ন জনগনকে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলিত এবং উদ্বেলিত জনগনকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সংগঠিত করার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র উইনিয়ন, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী সংগঠন, বুদ্ধিজীবি সংস্কৃতি সেবীসহ তৎকালীন সময়ের জনগনের সচেতন ও সংগ্রামী অংশ। এর পাশাপাশি ভাসানি ন্যাপ, পুর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দল জনগনকে সংগঠিত করার এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে নোয়াখালী বাসীকে সাহায্য করে।

কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল মাও সেতুং-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তথা চীনপন্থী রাজনৈতিক দল গুলো বিশেষ করে কমিউনিষ্ট গ্রুপ ও ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সংগঠন গুলো। নোয়াখালীতে এরকম একটি সংগঠন ছিল সাম্যবাদী দল। এর মুখপাত্ররা শ্রেনী সংগ্রামের কথা বলে প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বুর্জুয়া শ্রেনীর স্বার্থ দ্বন্দ্ব বলে

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক রাজ কায়েমের লক্ষ্যে নোয়াখালীতে সাম্যবাদী দল প্রতিপত্তিশালী ও জোতদার শ্রেনী খতম করার শ্লোগান তুলে অস্ত্র হাতে নেয়। এরা নোয়াখালীতে বেশ কিছু লোককে হত্যাও করে। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানিদের বিরোধীতা করতে গিয়ে-এই দু'দলের বিরুদ্ধেই আত্মঘাতি যুদ্ধে অংশ নেয় মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তোয়াহার যোগাযোগের প্রমান পাওয়া যায়।[৩] অথচ কমরেড আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করে।

যুদ্ধপুর্ব কালীন বৃহত্তর নোয়াখালীর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামোর নেতৃস্থানীয় সংগঠকগন বিশেষ করে আবদুল মালেক উকিল, নুরুল হক মিয়া, খাজা আহম্মদ, গাজী আমিন উল্যা ও শহীদ উদ্দিন এস্কান্দার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সংগে সার্বক্ষনিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রত্যেকটি জাতীয় কর্মসূচী পালন ও আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহন করেন। ১৯৬৯ সনের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যাকে কেন্দ্র করে নোয়াখালীতে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সর্বদলীয়ভাবে শোক মিছিল, গায়েবানা জানাযা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। শোকাবুত নোয়াখালীবাসীর এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করেন নেতৃবৃন্দ। এই শক্তি শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সনে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

গণঅভ্যুত্থানের পর যখন নতুন করে সামরিক শাসন জারী হয় তখনো নোয়াখালীবাসী সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। একই সাথে তৃনমূল পর্যায় পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ তৎপরতা শুরু করেন। আসন্ন সংকট সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে এই উপলব্দি থেকে নেতৃবৃন্দ জনগণকে সচেতন করে তোলেন। ইতিমধ্যে ১৯৭০সনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী তফশীল ঘোষিত হলে নোয়াখালীর দলীয় নেতৃবৃন্দের তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। প্রত্যেক থানায় ও ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। অনেক থানার গ্রাম পর্যায়েও আওয়ামী লীগের আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়েছিল। নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক মিয়া, খাজা আহম্মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জেলার প্রত্যান্ত অঞ্চল সফর করে এসকল সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির শোষন, নির্যাতন ও বঞ্চনার ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরে মানুষকে স্বাধীকার আন্দোলনে উজ্জীবিত করে তোলেন।[৪]

ঠিক এমনি সময়ে ১৯৭০ সনের ১২ নভেম্বর নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে যে ঘূর্নিঝড় হয়েছিল এবং সরকারের পূর্ব সতর্কতার অভাবে ও উদাসীনতার কারনে লক্ষ লক্ষ প্রানহানির ঘটনায় বিক্ষুব্দ নোয়াখালী বাসীর মন আরো উত্তপ্ত হয়। ত্রান তৎপরতা ও উদ্ধার কাজে পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা এবং দায়িত্ব হীনতার কারনে সারা দেশে

৩। মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

৪। সাক্ষাতকার ; শেখ মোঃ আবদুল হাই ; সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি বর্তমানে এডভোকেট, নোয়াখালী জজ কোর্ট তাঃ ৪,৫.৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দার ঝড় উঠে। এসময় নোয়াখালীর সর্বদলীয় এবং সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ সাধারণ অসহায় ও দুর্গত মানুষের পাশে দাড়ান। যে কারণে পরবর্তীতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আহবানে জনসাধারণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের পর যখন ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ইয়াহিয়া খান তালবাহানা শুরু করে তখনই বঙ্গবন্ধুর ঘোষনা অনুযায়ী ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে যায়। মিছিল, সভা, পোষ্টার, প্রচার পত্র প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি এর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগও এ সময় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কর্মসূচী ও নির্দেশ অনুযায়ী নোয়াখালী জেলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। জেলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে প্রত্যেক থানায় থানায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। নোয়াখালী জেলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে ও চুড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠনও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহন করতে থাকে। ১৯৬৯ সনের প্রথমার্ধেই কাজী জাফর আহমেদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে গঠিত হয় কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি। দল গঠনের পরপরই তাঁরা রচনা করেন স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী। এই কর্ম সূচীর ভূমিকায় বলা হয়ঃ "কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির পক্ষ হইতে আমরা জনতার বিপ্লবী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। আসুন মহান চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম বাংলার নক্শালবাড়ী, প্যালেষ্টাইনের আরবদের মুক্তিসংগ্রাম হইতে শিক্ষা গ্রহন করিয়া আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করি। আসুন মহান মাও সেতুংয়ের শিক্ষাকে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্দি করি ও গ্রহন করি-'বন্দুকের নলই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'[৫]। কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের এই কর্মসূচীর আওতায় সমগ্র দেশের মতো নোয়াখালীতেও কমিউনিষ্ট বিপ্লবীগন স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগঠিত হতে শুরু করেন। শেখ মোঃ আবদুল হাই পিতা-মৃত আলহাজ মৌলভী হামিদ উল্লাহ সাং-আবদুল্লাহপুর পোঃ-আলায়ারপুর থানা-বেগমগঞ্জ জিলা-নোয়াখালী ছাত্র জীবন থেকেই কমিউনিষ্ট রাজনীতির অনুসারী ছিলেন। কমিউনিষ্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় প্রকাশ্যে ন্যাপ (ওয়ালী) এর সমর্থক ছিলেন এবং ন্যাপ (ওয়ালী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং নোয়াখালী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গোপন সংগঠন কমিউনিষ্ট পার্টির ও নোয়াখালী জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক ছিলেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে এর সদস্য হন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। বর্তমানে নোয়াখালী জেলা জর্জ কোর্টের উকিল এবং আওয়ামীলীগ জেলা কমিটির সদস্য।

৫। মোহাম্মদ হাননান ; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৃঃ-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় গোপন সংগঠন হিসাবে এই কমিটি নোয়াখালীতে প্রকাশ্যে কাজ করত ন্যাপ (ওয়ালী) সমর্থক হিসাবে। ন্যাপ (ওয়ালী) গ্রুপের নোয়াখালী জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ (সুধারাম) এবং সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শেখ মোঃ আবদুল হাই ও ডাঃ নিজামুল হুদা।[৬] ওয়ালী ন্যাপ ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে একমাত্র প্রগতিশীলদল, যার দেশের দুই আংশেই শক্তিশালী অবস্থান ছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে শক্তিশালী ছিল বটে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তার ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পুর্বে ওয়ালী-মোজাফফরের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যের আহবান জানিয়ে ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা প্রত্যাখান করে।[৭]

ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলনা। দলে অবস্থিত চরম বামপন্থীদের একটি উপদল নির্বাচন বর্জনের জন্য চাপ দিলে ঢাকায় দলের জরুরী কাউন্সিল ডাকা হয়। শেষ পর্যন্ত অধিবেশনে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। নির্বাচন এবং স্বাধীনতা প্রশ্নে ভাসানী ন্যাপ প্রথম দিকে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। নোয়াখালীতে ভাসানী ন্যাপের অবস্থান তেমন ভালো ছিলনা।

কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠন সারা দেশে শক্তিশালী ছিল। সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরালো ভাবে পরিচালনা করে। নোয়াখালীতে শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন আবু সাইদ ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার চৌমুহনী বাজার সংলগ্ন নোয়াখালীর বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ডেল্টা জুটমিলস্ এর শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নোয়াখালী রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন তখন কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রনে ছিল।[৮]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা গৌরবদীপ্ত। তৎকালীন ছাত্রসমাজ ছিল দেশ প্রেমের কান্ডারী। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছিষট্টির ছয়দফা এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত রয়েছে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। ছাত্র ও যুব সমাজ ছিল দেশের সচেতন বিবেক স্বরূপ। কৃষক, শ্রমিক, আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করনে তাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের মতো কমিউনিষ্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নও নোয়াখালীতে শক্তিশালী ছিল। ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত। নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৯] বিশেষ করে নোয়াখালী জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং

৬। সাক্ষাতকার ; শেখ মোঃ আবদুল হাই ; তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বর্তমানে এডভোকেট , নোয়াখালী জজ কোর্ট।

৭। যদি আওয়ামী লীগ ওয়ালী ন্যাপের সাথে নির্বাচনী জোট করতো, তাহলে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন হতে শেখ মুজিবের প্রতি চ্যালেঞ্জ করার মত সম্ভবতঃ কেউই থাকতো না। কারণ ওয়ালী ন্যাপ পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল।

৮। সাক্ষাতকার ; সরোয়ার-ই-দীন, তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা (বর্তমানে এডভোকেট।

৯। সাক্ষাতকার ; নুরুল হক মিয়া ; এম,পি ও তৎকালীন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী পালনে ছাত্রলীগের পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়ন ছিল সব চাইতে সক্রিয়। নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, বিক্ষোভ, হরতাল ও কালোব্যাজ ধারণে ছাত্র সংগঠন গুলোর তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং স্বত:স্ফূর্ত।

বস্তুত: ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই ছাত্র যুব সমাজের মনে বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নটি দৃঢ় হতে থাকে। বিভিন্ন ছাত্র যুবকদের মনে এসময় স্বাধীনতাকে ঘিরে চেতনার স্ফুরন ঘটতে থাকে। এরকম একাধিক গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়। যারা "স্বাধীনতা" আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের কমিটি, সংসদ, সংস্থা ইত্যাদি পাড়া, মহল্লায় ও গ্রামে গোপনে গোপনে গঠন করেছিলেন। এরকম একটি সংস্থা ছিল 'বঙ্গ বাহিনী'। ১৯৬২ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গ বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি বিরাট আকৃতির ফুলের মালা দিয়ে পুরো শহীদ মিনার চত্বরকে আচছাদিত করা হয়। মালাটির মাঝে লেখা ছিল "ববা"। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য বঙ্গ বাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করা হয়। পর দিন "ইত্তেফাকে" এর ছবি বের হয়।[১০]

১৯৬৯ সনে নোয়াখালীর সন্তান, ১৯৬৭-৬৮ সনের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী যুব পরিষদ গঠণে উদ্যোগী হন। ফেরদৌস কোরেশী যুব পরিষদ গঠনের জন্য ঢাকায় টিপু সুলতান রোডে যে সভা আহবান করেন, তাতে বঙ্গ বাহিনীর কর্মী সমর্থকরা যোগ দেন। কিন্তু সংগঠনের নাম ও কর্মসূচীর প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংগঠনের নামের আগে "পূর্ব বাংলা" না "পূর্ব পাকিস্তান" হবে এটাই ছিল মূল বিতর্ক। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের অপর প্রাক্তন নেতা নোয়াখালীর সিরাজুল আলম খানের সাথেও তাদের আলোচনা হয়। এদের সাথে আরো যুক্ত হন প্রাবন্ধিক, কথা সাহিত্যিক, আহমদ ছফা ও নোয়াখালীর চৌমুহনী কলেজের ছাত্রনেতা শাহ আলম। তাঁদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে একটি ঘোষনা পত্র রচনা করার জন্য হারুন অর রশিদকে (মুক্তিযুদ্ধে রনাঙ্গন প্রতিনিধি) এবং গঠনতন্ত্র রচনা করার জন্য ছাত্রনেতা ফিরোজ কে দায়িত্ব দেয়া হয়। এসব ঘটনা যখন ঘটছে তখনও ১১ দফা প্রনয়ন করা হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশ্নে সিরাজুল আলম খান বলেন, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তার নেতৃত্বেই স্বাধীনতা আনতে হবে। কারন পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবের কথা শুনে এবং শুনবে।[১১]

তবে স্থানীয়ভাবে বৃহত্তর নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টি যৌথভাবে নেতৃত্ব দেয়। কমিউনিষ্ট পার্টি গোপনে এবং আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করত। যে দুজন সংগঠক এ দুঃসাধ্য কাজটি সংগঠিত করেছিলেন তাঁরা হচেছন তৎকালীন নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য (এম.এন.এ) নুরুল হক মিয়া এবং জেলা আওয়ামী লীগ সদস্য ও ফেনীর(এম,এন,এ) জাতীয় পরিষদ সদস্য খাজা আহমদ।[১২]

০। মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৃঃ-১৭৮।
১। পূর্বোক্ত।
২। সাক্ষাতকার ; মনযুর-উল-করিম (তৎকালীন জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী) প্রাক্তন সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী একবাক্যে স্বীকার করেন এই সংগঠকদের সাংগঠনিক দক্ষতার কথা। নুরুল হক মিয়ার পিতা মরহুম আবদুল মজিদ ছিলেন বেগমগঞ্জ থানার হাজীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নোয়াখালী জেলার পাট ও লবন ক্রয়ের এজেন্ট। যে কারণে তিনি প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হওয়ায় সমাজের কল্যান মূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নুরুল হক মিয়া ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র। বেগমগঞ্জ হাই স্কুলে নবম শ্রেনীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি আবুল হাসিম ও হোসেন শহীদ সৌহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের একনিষ্ট ভক্তে পরিণত হন। ফলে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবের সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি রাজনীতিকেই পেশা হিসাবে গ্রহন করেন। তিনি ১৯৬৫ সনে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

অন্য সংগঠক চিরকুমার খাজা আহমদ নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। বৃটিশ শাসিত ভারতের বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন ছাত্র জীবনেই। কলকাতার বামপন্থী নেতাদের সান্নিধ্যে এসে পুরো বিপ্লবী হিসাবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে শেরে বাংলা ও ভাসানীর সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ফেনী থেকে জয়লাভ করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির একজন নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯৭০ সনের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচন পরবর্তী সংকট কালে ফেনীর জণসাধারণকে সংগঠিত করে সম্পূর্ন প্রস্তুত রাখেন খাজা আহমদ। যে কারনে ৩ মার্চ ১৯৭১ ইং ফেনীতে কুমিল্লা থেকে কিছু সংখ্যক আর্মি আসলে জনতা তাদের প্রতিরোধ করে এবং ফেনী শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ২৬ মার্চ ই,পি, আর, সৈন্যরা ফেনীর সার্কেল অফিসে ঘাঁটি স্থাপন করে স্থানীয় জণসাধারণের উপর আক্রমন চালালে খাজা আহমদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনতা ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতিরোধ ও আক্রমনে অবাঙালী ই,পি,আর, সৈন্যদের হত্যা করে প্রায় একমাস ফেনী শহর শত্রুমুক্ত রাখা সম্ভব হয়। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক খাজা আহমেদ ১৯৭৬ সনের ২৯ মে ইন্তেকাল করেন।

উপকূলীয় মুসলিম অধ্যুষিত নোয়াখালীর বেশীর ভাগ মানুষ ছিল মুসলিমলীগ সমর্থক। ১৯৪৭ এর পর থেকে মুসলিমলীগের একটা অংশ প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির স্বার্থ দ্বন্দের কারণে নোয়াখালীতে সৎ নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংরেজ আমলে খান বাহাদুর আবদুল গোফরান খান ও রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী জেলা বোর্ডের নেতৃত্বে থাকার সময় নোয়াখালী জেলার প্রত্যেক থানায় কিছু লোককে নির্বাচিত করেন রাজনীতির জন্য। এ সমস্ত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন সম্পদশালী, সৎ ও সমাজ সেবক। এরাই পাকিস্তানে মুসলিমলীগের সমর্থক ছিল। এদের বেশীর ভাগই ছিল প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত। এই স্থানীয় এলিট শ্রেনী পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী, মাওলান ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমানের নীতি ও আদর্শের প্রতি সমর্থন জানান। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দেয়।[১৩]

১৩। সাক্ষাতকার ; নুরুল হক মিয়া ৪.৫.৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমলীগ সরকার চেষ্টা করেছিল তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য। কিন্তু বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল নোয়াখালীতে ঘন ঘন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মুসলিমলীগ সরকারের প্রতি নোয়াখালীবাসী বিরূপ হতে শুরু করে। কারন স্থানীয় সমস্যা সমাধানে মুসলিমলীগ সরকার ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় বারুদে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত কাজ করে ১৯৭০ সনের নির্বাচনের পূর্ব মুহুর্তের মহা প্রলয়ংকরী জলোচ্ছাস। এতে প্রায় দশ লাখ মানুষ মৃত্যু বরণ করায় নোয়াখালীসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী হাওয়ার পরিবর্তে এক শোকবিহ্বল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সমগ্র বাংলা থেকে দলে দলে ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা আত্মমানবতার সেবায় দূর্গত এলাকায় যাত্রা শুরু করে। তাদের ত্রান তৎপরতা, সেবা ও দেশ প্রেম দেখে নোয়াখালীবাসী মুসলিমলীগ ও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে।

এছাড়া সরকারি অবহেলা, অদূরদর্শিতা ও কান্ড-জ্ঞানহীনতা জনগনকে আরো ক্ষুব্দ করে তোলে। অধিকাংশ মৃতদেহ সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার পরও যারা জীবিত ছিল, মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিল, তারাও অসহায়ভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সরকারি উদ্ধার কার্য ও ত্রানতৎপরতা অনেক দেরীতে শুরু করায় নির্বাচনী উত্তেজনায় বিভোর হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী এসময় দূর্গত মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। তারপরও দূর্গত, দুঃস্থ মানুষকে বাঁচাবার উদ্যোগের ক্ষেত্রে সকল দিক থেকে খুব বেশী দেরী হয়ে যায়। চির সংগ্রামী ও আত্মবিশ্বাসী উপকূলীয়বাসী ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ও নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। সরকার এ অবস্থায় দূর্গত এলাকায় কয়েক দিনের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেয়।

এ অবস্থায় নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মানুষকে নতুন করে বাঁচার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাংগঠনিক তৎপরতায় মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। তাই ১৯৭১ সনের জানুয়ারী মাস থেকে অধিকার আদায়ের লড়াই শুরু হলে নোয়াখালীবাসীও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে গঠিত হয় সর্ব দলীয় সংগ্রাম পরিষদ। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলকে নিয়ে নুরুল হক মিয়া, আবদুল মালেক উকিল, শেখ মোঃ আবদুল হাই, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, আবু সাঈদ, খাজা আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে নোয়াখালীতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হয়। জাতীয় ভাবে ঘোষিত সকল কর্মসূচী সফল ভাবে পালিত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চৌমুহনী রেলওয়ে ময়দানে বিশাল জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে পুলিশ আক্রমন করে ৪/৫ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। পুলিশের সাথে সংর্ঘষে ১৫/২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। গ্রেফতার করা হয় জয়নাল আবেদীন, শেখ মোঃ আবদুল হাই ও মাহমুদুর রহমান বেলায়েতকে। গণআন্দোলন তুঙ্গে উঠলে এসকল বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়।[১৪]

১৪। সাক্ষাতকার ; শেখ মোঃ আবদুল হাই।

Dhaka University Institutional Repository

এসময় নোয়াখালী জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে জেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলে জনসমাবেশ ও প্রচারাভিযান চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের লক্ষ্যে জনমত গঠন করতে শুরু করেন এবং জনসাধারনকে সার্বিক প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। দলীয় নেতা কর্মীদেরকে সদা প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। চৌমুহনী বাজারের কাবলী বোর্ডিংয়ের সামনের রাস্তায়, মাইজদী শিশুপার্কে, ফেনীর মিজা ময়দান, ট্রাঙ্ক রোড, লক্ষ্মীপুরের কোর্ট বিল্ডিং ও মডেল স্কুলের মাঠে, রায়পুর মার্চেন্ট একাডেমী স্কুলের মাঠে এবং প্রত্যেক থানা সদরে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিটি থানায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে গণসমাবেশ মিছিলে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহন করতো। এ সময় প্রতিদিনই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধতো। কারন সরকারি পুলিশ বাহিনী উত্তেজিত জনতাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতো। জেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলে পোষ্টারিং করা হয়। স্থানীয়ভাবে অবশ্য কোন পোষ্টার বা লিফলেট ছাপানো না হলেও জাতীয়ভাবে ঢাকা থেকে যে সকল পোষ্টার, প্রচার পত্র পাঠানো হতো সে গুলিই প্রত্যেক থানায় থানায় লাগানোর ব্যবস্থা করা হতো।

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে চৌমুহনীর রেলওয়ে ময়দানে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী এক্ গণসমাবেশে বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এসমাবেশে বক্তৃতা করে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে জনগণকে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষনের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্বিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

<u>বৃহত্তর নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাঃ-</u> উপকুলীয় অঞ্চল নোয়াখালীর অধিবাসীগণ প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থানগত কারনে সংগ্রাম মুখর। নিত্যসঙ্গী ঘুর্নিঝড়, বন্যা, সাইক্লোনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে আজও নোয়াখালীর মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে করে জীবন সংগ্রামী হয়ে উঠেছে তারা। ফলে বার বার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। ভাষা আন্দোলনে শহীদ রফিক, শফিক, জব্বারের মত নোয়াখালীর বীর সন্তান শহীদ আবদুস সালামও রক্ত দিয়ে প্রমান করেছে যে কোন বড় ধরনের আত্মত্যাগে নোয়াখালীবাসী পিছ পা হয় না। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে নোয়াখালীবাসীও ছিল সোচ্চার। তারই ধারা বাহিকতায় চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির আন্দোলন এবং ছিষট্টির ৬ দফা সংগ্রামে সমগ্র অঞ্চলের সঙ্গে নোয়াখালী জেলাও সক্রিয় অংশ গ্রহন করে। এই আন্দোলনেরই বীর সৈনিক সার্জেন্টে জহুরুল হক অভিযুক্ত হন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। তার আত্মত্যাগ নোয়াখালীবাসীকে আরো বিক্ষুব্দ করে তোলে এবং ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের সূচনা করে। দেশ বাসীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নোয়াখালী বাসী বিক্ষোভ, সমাবেশ, হরতাল, ধর্মঘট পালন করে পাকিস্তানী শাসন শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে সারা নোয়াখালীতে দলীয় ও জাতীয় কর্মসূচী। ১৯৬৯ সনের আন্দোলন, বিক্ষোভ ও সংগ্রামে নোয়াখালীতে ৫ জন শহীদ হন। ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে নোয়াখালীর স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে একটা সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠে। শহর জন পথ ছেড়ে নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা ধুমায়িত ক্ষোভ দানা বাধতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহর থেকে যখন নিজ জেলা নোয়াখালীর গ্রামে গঞ্জে আসত, তখন তাদের সংস্পর্শে এসে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারান্তরালে ছিলেন, জনগণের এক বিরাট অংশ তখন তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও সংগঠকগন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এমনকি তৃনমূল পর্যায়েও জনগণকে সংগঠিত করে। এর সুফল পাওয়া যায় ১৯৭০ সনের নির্বাচনে। চির সংগ্রামী এই মানুষদের উপর চরম আঘাত আসে ১৯৭০ সনের ১২ নভেম্বর। ঘূর্নিঝড়ে লক্ষ লক্ষ প্রানহানি ঘটে। পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠির অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান যায় আরো বেড়ে। যারা বেঁচে ছিল তাদের জন্য আসেনি কোন সরকারি সাহায্য। ফলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আরো বেড়ে যায়।

এই অবস্থায় ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নৌকা মার্কা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করে। নির্বাচন উপলক্ষে নোয়াখালীবাসী ও শ্লোগান দেয়-পিন্ডি না ঢাকা-- ঢাকা ঢাকা। পদ্মা মেঘনা যমুনা- তোমার আমার ঠিকানা। তোমার নেতা আমার নেতা-শেখ মুজিব শেখ মুজিব। এসব জাতীয়তাবাদী শ্লোগান স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্খার স্বপ্ন জনগণকে আন্দোলিত করে। ১৯৭১ সনের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালীর রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে যায়। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতা এতে অংশ গ্রহন করে। এদিন ফেনীতে প্রচন্ড গণবিক্ষোভ হয়। জনতা ফেনীর মহকুমা প্রশাসক অফিসে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এবং পাকিস্তানী পতাকা পদদলিত করে। ফেনীর মহকুমা প্রশাসক ছিলেন অবাঙালী (পাঞ্জাবী)। এসময় ৩ মার্চ ১৯৭১ নোয়াখালীর তৎকালীন জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিম ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এক গুরুত্বপূর্ন সভা করছিলেন। এমন সময় ফেনীতে সেনাবাহিনীর একটি দল আসার খবর পাওয়া যায়। ফেনীর জাতীয় পরিষদ সদস্য খাজা আহমদ বলেন, যেহেতু জেলা ম্যাজিষ্টেটের অনুমতি নিয়ে আর্মি আসেনি সেহেতু বিকেলের মধ্যে সেনাবাহিনীকে অবশ্যই ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। পরে জানা যায় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিগ্রেডিয়ার ইকবাল শফি ফেনীতে সেনাবাহিনী পাঠায়।[১৫] সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী ফেনী শহর ছেড়ে চলে যায়। এসময় জনতা মহকুমা প্রশাসকের অফিস ও বাসায় হামলা করে। ভয়ে মহকুমা প্রশাসক পালিয়ে নোয়াখালীতে চলে আসে।

ইতিমধ্যে ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষনা অনুযায়ী নোয়াখালীতে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সাংসদ আবদুল মালেক উকিলকে সভাপতি করে গঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে গঠিত হয় নোয়াখালী জেলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এর নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান বেলায়েত ও মোমিন উল্লাহ মিয়া। গণবাহিনীও গঠিত হয়। এর

১৫। সাক্ষাতকার ; মনযুর উল করিম (অবসর প্রাপ্ত সচিব) তৎকালীন জেলা প্রশাসক নোয়াখালী। ২৪.৬.৯৮

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব দেন ফারুক মোজাম্মেল। ৪-৬ মার্চ অর্ধবেলা (সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত) হরতাল পালিত হয়। ৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী ঘোষনার দিন। ৭ মার্চ রেসর্কোস ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষন শোনার জন্য নোয়াখালীর প্রত্যেক থানা থেকে দুটি বাস ভর্তি লোক ঢাকায় আসে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করার আহবানের মধ্যে দিয়ে নোয়াখালীতেও প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এসময় হরতাল, বিক্ষোভ চলতে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জেলা প্রশাসক নিয়মিত বৈঠক করতে থাকেন এবং ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ঢাকার নির্দেশমত প্রস্তুতিও চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে (প্রাক্তন সচিব, বর্তমানে মন্ত্রী) নোয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এ,ডি,সি) হিসাবে পোষ্টিং দেয়া হয়। কিন্তু তিনি যোগ দান করেননি। ১১ মার্চ তিনি জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিম কে টেলিফোন করেন এবং বলেন যে জরুরী বার্তা নিয়ে আসছেন। রাত প্রায় ১২টায় একা জীপ চালিয়ে আসেন এবং জেলা প্রশাসককে বলেন যে-"যদি হাতিয়াতে অস্ত্র পৌছে দেয়া যায় তাহলে তা গ্রহন করা সম্ভবপর কিনা?" জেলা প্রশাসক বলেন "হাতিয়া সম্পর্কে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। হাতিয়ার চাইতে Main land (জেলার অভ্যান্তরে) এ অস্ত্র গ্রহন করা আরো বেশী সহজ ও সুবিধাজনক হবে।[১৬] রাতেই মহিউদ্দিন খান আলমগীর অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদান না করে ঢাকা ফিরে আসেন।

ইতি মধ্যে মুজিব, ভুট্টো, ইয়াহিয়া আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। জনগনও পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে থাকে। এর মধ্যে ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু "পাকিস্তান দিবস" [১৭] উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষনা করেন। ঐদিনের কর্মসূচী অনুসারে ভোর পাঁচটায় পতাকা উত্তোলন করার কথা। কোন্ পতাকা উঠবে এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ শুরু হয়। এসময় বর্তমানে এডভোকেট ও তৎকালীন নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিন উল্লাহ ঢাকা থেকে আনা একটি পতাকা সকলকে দেন।[১৮] তখন পাকিস্তান এবং বাংলা দেশের দুটি পতাকাই উত্তোলন করা হয়। কারন স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন রেকর্ড করবে যে জেলা প্রশাসন পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেনি। সেজন্য দুটি পতাকা উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঐ পতাকাকে সালাম করেন। এভাবে নোয়াখালীতে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এরপর ২৪ মার্চ নোয়াখালীতে একটা খবর রটে যে, ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানা আক্রান্ত হয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল এটি সত্যি নয়। পরের দিন অর্থাৎ ২৫ মার্চ সারা দিন আর কোন খবর পাওয়া গেল না। কোন কিছুই স্পষ্ট ছিলনা, আপোষ হলো কি হলো না। সন্ধ্যায় সি, আই, ডি, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি, আই, জি ফোন করে জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিমকে বলেন "আল্লাহ আল্লাহ"

১৬। সাক্ষাৎকার - মনযুর উলকরিম।

১৭। পাকিস্তান দিবসঃ ২৩শে মার্চকে পাকিস্তান দিবস হিসাবে ঘোষনা করার কারন হলোঃ ১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সিকান্দার হায়াত খান পাকিস্তান প্রস্তাবের চূড়ান্ত খসড়া তৈরী করেন। এই খসড়ায় বেশ কিছু সংশোধন করে ফজলুল হক তা পেশ করেন এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামান তা সমর্থন করেন। পাকিস্তান প্রস্তাব পেশের এই দিনটিকে পরবর্তীতে "পাকিস্তান দিবস" হিসাবে পালন করা হতো।

১৮। সাক্ষাৎকারঃ এডভোকেট মমিন উল্লাহ ২০-১২-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ২৬ মার্চ ভোর ৪ টায় জেলা প্রশাসকের কাছে ফোন আসে। বলা হলো আপনার জন্য মেসেজ আছে। কাগজ কলম নিন। VHF-এর মাধ্যমে মেসেজটি ছিল এরকমঃ Pakistani occupation soldiers have attacked Rajarbag Police Headquarters and Philkhana EPR Head quarters, - - - - -are Raised Barricade. Resist the enemy at all cost, whatever you have.[১৯] একই সঙ্গে নোয়াখালী পুলিশ রেঞ্জের ইনস্পেকটর সদরুল আলা খান চৌধুরীও বার্তাটি পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিলের কাছে। এর পর পরই রাস্তায় মিছিল বেরিয়ে পড়ে।

২৬ মার্চ সকালে টেলিফোন পাওয়ার পর সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে বসেন। সেখানে বার্তাটি জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিম পড়ে শোনান। সভায় আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাপ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সর্বসম্মত ভাবে শত্রুর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শুরু হয় শসস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয় বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, মাইজদী কোর্ট এবং ফেনীর মিজান ময়দানে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। পুলিশ এবং আনছার বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকও ট্রেনিংয়ে সহায়তা করেন। অস্ত্র চালনায় তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা এ সময় কাজে লাগান। ৩০৩ রাইফেল সরবরাহ করে প্রথমে ট্রেনিং শুরু হয়। ফেনীতে সংসদ খাজা আহমদের নিয়ন্ত্রনে প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

২৬ মার্চ ফেনীতে ১নং উইংয়ের অবাঙালী সহকারী অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফারুকীর নেতৃত্বে এক প্লাটুন ই, পি, আর, সৈন্য স্থানীয় জনগণের উপর আক্রমন চালায়। সে বাঙালী ই, পি, আরদের কাছ থেকে আগেই অস্ত্র কেড়ে নেয় এবং নিজের অনুগত বাহিনীসহ ফেনীর সার্কেল অফিসে ঘাটি স্থাপন করে। স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতিরোধ ২৬ মার্চ থেকে গড়ে উঠতে থাকে। পরদিন ২৭ মার্চ জনতা সার্কেল অফিস ঘেরাও করে ফেলে। সংঘর্ষে হানাদার বাহিনীর গুলিতে চার ব্যক্তি নিহত এবং দশ জন আহত হয়। ফলে জনতা আরো মারমুখী হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে ১নং উইং সদর থেকে বাঙালী নায়েক সুবাদার আফতাব উদ্দিন এক প্লাটুন সৈন্যসহ শালধার বাজার বি, ও, পিতে নায়েক সুবাদার বাদশা মিয়া ও তার প্লাটুনের সাথে একত্র হয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হন। এদের সাথে যোগ দেন স্থানীয় জনতা, ছাত্র, আনছার, মুজাহিদ, পুলিশ ও অবসর প্রাপ্ত সেনাসদস্যরা। ফলে ফেনীতে গড়ে উঠে এক বিরাট বাহিনী। সম্মিলিত এই বাহিনী ২৭ মার্চ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফের নেতৃত্বে সার্কেল অফিস (সি, ও, অফিস) আক্রমন করে। এ আক্রমনে অধিকাংশ অবাঙালী ই, পি, আর সৈনিক নিহত হয়। এদের মধ্যে ৭ জনকে ধরে নিয়ে এসে নোয়াখালীর সোনাপুরে হত্যা করা হয় এবং ১৬ জন বাঙালী ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্স (ই, পি, আর) সৈনিককে উদ্ধার করা হয়।[২০]

১৯। সাক্ষাৎকারঃ মনযুর উল করিম।

২০। আবু দেলওয়ার সম্পাদিত ; মুক্তি যুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, (ঢাকা-১৯৯৪) পৃঃ- ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় নোয়াখালী জেলার অভ্যান্তরে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য জাতীয় আইন পরিষদের সদস্য নুরুল হক মিয়া অবসর প্রাপ্ত সেনাসদস্যদের তালিকা নিয়ে তাদের খুজে বের করেন। তাদের হাতে ক্যাম্পের দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবে শুরু হয় নোয়াখালীতে প্রথম প্রতিরোধ এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ। আস্তে আস্তে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় নেতারা ভারতে চলে যেতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠিত হলে নেতারা মুজিব নগর সরকারের নির্দেশ মত মুক্তিবাহিনী গঠন করার জন্য কর্মী বাছাই শুরু করেন এবং তাদের ভারতে পাঠান।

২৫ মার্চ রাত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের চূড়ান্ত নির্দেশ পাওয়ার পর নুরুল হক মিয়া, আবদুল মালেক উকিল, খাজা আহমদ, শেখ মোঃ আবদুল হাই, শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার (কচি), মমিন উল্লাহ মিয়া, প্রফেসর হানিফ, মাওলান খালেদ সাইফুল্লাহ, মাহবুবুল আলম চাষীসহ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এবং জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিম ও অন্যান্য জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্মিলিত নেতৃত্বে নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

অবসর প্রাপ্ত সেনাসদস্য, ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে ট্রেনিং দেয়া শুরু হয় মাইজদী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এবং ফেনীর মিজান ময়দানে। ২৩ এপ্রিল পাকবাহিনী নোয়াখালী দখল করে নেয়া পর্যন্ত এখানে ট্রেনিং চলতে থাকে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নোয়াখালীর উধর্বতন নেতৃবৃন্দ ভারতে চলে যান এবং প্রবাসী সরকার গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় নোয়াখালীর নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ যে ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন তা নিম্নরূপঃ-[২১]

নাম	পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং	পদবী	মুক্তিযুদ্ধকালীন দায়িত্ব স্থান
খাজা আহম্মদ	১৪৬	শিবির প্রধান	ছোট খোলা
নুরুল হক মিয়া	১৪৭	ছাত্র উপদেষ্টা	পূর্বাঞ্চলীয় জোন
আবদুল মালেক উকিল	১৪৮	উপদেষ্টা সদস্য	ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তর
খালেদ মোঃ আলী	১৫০	সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা	সেক্টর নং-২
প্রফেসর মোঃ হানিফ	১৫১	শিবির প্রধান	রাধানগর যুব শিবির
এ,বি,এম, তালেব আলী	৪৩৮	শিবির প্রধান	রাজনগর যুব শিবির
মোহাম্মদ উল্লাহ	৪৪৪	উপদেষ্টা	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
বিছমিল্লা মিয়া	৪৪৫	শিবির প্রধান	রাজা নগর যুব শিবির
শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার	৪৪৭	শিবির প্রধান	বেলুনিয়া যুব শিবির ত্রিপুরা
আমিরুল ইসলাম	৪৪৯	শিবির প্রধান	কোনাবন্দ যুব শিবির
মাহবুবুল আলম চাষী	৬৬৯	ভার প্রাপ্ত সচিব	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
আ,ফ, ক, সফদার	৪৩৬	সদস্য	পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনিক অঞ্চল

২১। এ,এস,এম, সামছুল আরেফিন ; মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান (UPL) ১৯৯৫, পৃঃ-২৬ স্মারনী-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

খায়ের উদ্দিন আহমদ	৪৩৭	শিবির প্রধান	হরিসমুখ যুব শিবির
মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ	৪৪২	শিবির প্রধান	চাবিলাম প্রশিক্ষণ শিবির
নুরুল আহমদ চৌধুরী	৪৪৩	সংগঠক	
আবদুল মোহাইমেন	৪৪৬	সহকারী	জয়বাংলা পত্রিকা
ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ	৪৭৫	বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাংলাদেশ সরকার

উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন, পরিচালনা ও পরিকল্পনা প্রনয়নে বিশেষ অবদান রেখে নোয়াখালীসহ সমগ্র বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করতে বিশেষ অবদান রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধ কালীন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক কাঠামোঃ-

১।	আবদুল মালেক উকিল	সভাপতি
২।	নুরুল হক মিয়া	সাধারন সম্পাদক
৩।	আজিজুল হক এম, এ,	সাংগঠনিক সম্পাদক
৪।	খাজা আহমদ (ফেনী)	সদস্য
৫।	মোঃ আবদুর রশিদ	সদস্য
৬।	এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন	সদস্য
৭।	গাজী আমিন উল্যা	সদস্য
৮।	খালেদ মোঃ আলী	সদস্য
৯।	প্রফেসর মোঃ হানিফ	সদস্য
১০।	এ, এফ, কে, সফদার (ফেনী)	সদস্য
১১।	মৌলভী খায়ের উদ্দিন	সদস্য
১২।	এ,বি,এম, তালেব আলী (ফেনী)	সদস্য
১৩।	আবু নাসের চৌধুরী (কোম্পানীগঞ্জ)	সদস্য
১৪।	আবদুস সোবহান (সেনবাগ)	সদস্য
১৫।	মাষ্টার রফিক উল্লাহ মিয়া	সদস্য
১৬।	মোঃ সাখাওয়াত উল্যা এডভোকেট	সদস্য
১৭।	নুরুল আহমেদ কালু মিয়া	সদস্য
১৮।	এডভোকেট আক্তারুজ্জামান (রায়পুর)	সদস্য
১৯।	বিছমিল্লা মিয়া এডভোকেট	সদস্য
২০।	মোঃ আবদুল মোহাইমেন	সদস্য
২১।	শহীদ উদ্দিন এস্কেন্দার (কচি ভাই)	সদস্য
২২।	সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
২৩।	আমিরুল ইসলাম কালাম (হাতিয়া)	সদস্য
২৪।	ডাঃ আবদুল আউয়াল (লক্ষ্মীপুর)	সদস্য
২৫।	মুন্সী জালাল আহমেদ (ফেনী)	সদস্য
২৬।	আঞ্জুমান্দ বানু	মহিলা সম্পাদিকা
২৭।	হাজী মোঃ ইদ্রিস মিয়া	কোষাধ্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

২৮।	নাসির আহমেদ ভূইয়া	সদস্য
২৯।	মাওলানা ছায়ফুল আলম ইত্তেহাদী (রায়পুর)	সদস্য
৩০।	ডাঃ আবুল বাশার (লক্ষ্মীপুর)	সদস্য
৩১।	ডাঃ ভূপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী	সদস্য
৩২।	আলী ইমাম চৌধুরী	সদস্য
৩৩।	আ,ন,ম, আনোয়ার	সদস্য
৩৪।	মকবুল আহমেদ নেওয়াজপুরী	সদস্য প্রমুখ।

সূত্রঃ মাওলানা ছায়ফুল আলম ইত্তেহাদী, সদস্য, নোয়াখালী জেলা আওয়ামীলীগ ও সা. সম্পাদক রায়পুর থানা আওয়ামীলীগ ১৯৭০-৭১।

১৯৭০-৭১ সনে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কাঠামো-

১। মোঃ মমিন উল্লাহ, সভাপতি ২। মোঃ শাহজাহান, সাধারণ সম্পাদক ৩। জি, পি, জয়নাল (ফেনী), সদস্য ৪। শাজাহান কামাল (লক্ষ্মীপুর), সদস্য ৫। নবী নেওয়াজ চৌধুরী বকুল (রায়পুর), সদস্য ৬। হোসেন হায়দার (লক্ষ্মীপুর), সদস্য ৭। ফজলে এলাহী (নোয়াখালী), সদস্য ৮। প্রনব ভট্ট (নোয়াখালী), সদস্য ৯। মহিউদ্দিন লাভু (নোয়াখালী), কোষাধ্যক্ষ ১০। জয়নাল আবেদীন ১১। নুরুল আমিন, ১২। হাসান মাহমুদ ফেরদৌস ১৩। মোঃ ফারুক ১৪। গোলাম সারোয়ার ১৫। মমিনুল ইসলাম বাকের ১৬। মোঃ মহিউদ্দিন ১৭। ফুয়াদ পাশা কচি (হাতিয়া) ১৮। আঃ রাজ্জাক (কোম্পানীগঞ্জ) ১৯। হায়াত খান ২০। মুনছুর আহমদ (লক্ষ্মীপুর) প্রমুখ সদস্য।

সহ মোট ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল।

সূত্রঃ সাক্ষাতকারঃ মমিন উল্লাহ মিয়া- তৎকালীন সভাপ্রতি নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগ ও বর্তমান সাধারন সম্পাদক নোয়াখালী জেলা আওয়ামীলীগ।

মুক্তিযুদ্ধ কালীন নোয়াখালী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ছিলোঃ ১। শেখ মোঃ আবদুল হাই, সাধারন সম্পাদক ২। মোঃ আবু সাঈদ (লক্ষ্মীপুর), সম্পাদক ৩। খাদেম উল্লাহ (বেগমগঞ্জ) সম্পাদক ৪। আবু তাহের (ফেনী) সম্পাদক ৫। অধ্যাপক শাহজাহান (বর্তমান অধ্যক্ষ ইস্পাহানী ডিগ্রী কলেজ) সম্পাদক ৬। সুবাস চক্রবর্তী (চৌমুহনী) সম্পাদক ৭। মীর্জা আবদুল হাই (ফেনী) সদস্য ৮। শাহাব উদ্দিন (বেগমগঞ্জ) সদস্য ৯। সারোয়ার-ই-দীন (সুধারাম) সদস্য ১০। সফিকুর রহমান (কোম্পানীগঞ্জ) সদস্য ১১। ডাঃ নিজামুল হুদা (বেগমগঞ্জ) সদস্য ১২। ফজলুল হক (একলাসপুর নোয়াখালী) সদস্য ১৩। নুর মোহাম্মদ (চাটখিল) সদস্য প্রমুখ।

সূত্রঃ শেখ মোঃ আবদুল হাই ; তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, নোয়াখালী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি, বর্তমান আওয়ামীলীগ নেতা নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালী ন্যাপ সংগঠনের কার্যক্রম নোয়াখালী জেলায় যারা পরিচালনা করেন তাদের তালিকাঃ-

১।
মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ (সুধারাম), সভাপতি ২। শেখ মোঃ আবদুল হাই, সাধারণ সম্পাদক ৩। ডাঃ নিজামুল হুদা, সম্পাদক ৪। হেদায়েত উল্লাহ ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ ৫। আবু তাহের, সদস্য ৬। এডভোকেট মোশারফ হোসেন, সদস্য মহকুমা সভাপতি ৭। শামসুল আমিন (চাটখিল) ৮। জয়নাল আবেদীন (ফেনীর শ্রমিক নেতা) ৯। ডাঃ সালাহ উদ্দিন (ফেনী) ১০। গিয়াস উদ্দিন হায়দার (ফনী) ১১। আবদুস সাত্তার (ফেনী) ১২। আরিফুর রহমান (সুধারাম) ১৩। আবদুল হাদী (বেগমগঞ্জ) ১৪। এডভোকেট জয়নাল আবেদীন ১৫। ডাঃ আবদুল গফুর ১৬। খন্দকার আবদুল আজিজ ১৭। মিয়া আবু তাহের (লক্ষ্মীপুর) ১৮। তোসাদ্দেক হোসেন (রায়পুর) ৯। দেওয়ান আবুল কাশেম (রামগঞ্জ) প্রমুখ সদস্য।

সূত্রঃ শেখ আবদুল হাই।

নোয়াখালী জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক রূপঃ-

আবু সাঈদ, সভাপতি, খাদেম উল্লাহ, সাধারন সম্পাদক, নুর মোহাম্মদ, সদস্য, আবুল কালাম আজাদ, রঞ্জিত সাহা (বেগমগঞ্জ), মাহফুজ উদ্দিন (বেগমগঞ্জ), মজিবল হক মজিদ, জাফর উল্লাহ বাহার, নুর মোহাম্মদ, এ.বি.এম. ফারুক, মুখার্জী (লক্ষ্মীপুর), আবু তাহের মিয়া, অজি উল্লাহ (চাটখিল), রুহুল আমিন খান, সফি উল্লাহ (শহীদ) প্রমুখ সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনা

যুদ্ধ পরিকল্পনাঃ- স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য দু'ধরনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়- রাজনৈতিক ও সামরিক। প্রথমতঃ রাজনৈতিক পরিকল্পনা যার পটভূমি ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে তৈরী হতে থাকে। এর চূড়ান্ত ঘোষনা আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রেইসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষনে। তিনি ঘোষনা করেছিলেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এছাড়াও তিনি ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবান জানান। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশও দেন। সমগ্র জাতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার কথা জানিয়ে দেয়া হয়। এর পর থেকে একটি যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে বাঙালীরা প্রস্তুতি নিতে থাকে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। নোয়াখালী জেলায়ও গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের শাখা এবং সে অনুসারে নোয়াখালীতে যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীও প্রথম থেকে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহন করে। ১৯৭০ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের পর থেকে তারা বুঝতে পারে শান্তিপূর্ন উপায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে বিকল্প থাকে বাঙ্গালীদের দমন করা। বাঙ্গালীদের হাতে কোন অবস্থায় পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী ছিল না শাসক গোষ্ঠী। এই মনোভাবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় ১৯৭০ সনের ১৯ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঘোষনা করলেন ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের ভবিষৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে এবং এই বিষয়ে কোন আপোষ নেই, তখন ভুট্টো ঘোষনা করলেন যে, তার দলের সমর্থন ছাড়া কোন সংবিধান প্রণয়ন বা সরকার গঠন করা যাবে না এবং প্রয়োজন বোধে দুই পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রীও হতে পারে।[১] ১৪ মার্চ ভুট্টো এক অসম্ভব প্রস্তাব দিয়ে বলেন-"পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে"। ভুট্টোর এহেন উদ্ভট বক্তব্যে প্রমান হয় যে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভুট্টোই পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট তৈরি করে এবং এসব প্রস্তাবের মাধ্যেমে ভুট্টো কার্যত প্রথম পাকিস্তান ভাঙ্গার আনুষ্ঠানিক আয়োজন সম্পন্ন করে। কারন ভুট্টোর প্রস্তাব দুই পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রী ও দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বা দুই সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের স্বীকৃতি রাজনৈতিক মহলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করার জন্য ভুট্টোই লাগাতার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অতএব পূর্ব পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে তারা সময় ক্ষেপন করতে থাকে আলাপ আলোচনার অজুহাতে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করেও তা স্থগিত ঘোষনা করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। অবশেষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যার আদেশ দিয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ- সামরিক পরিকল্পনা গ্রহন করেন পাকিস্তানি বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত বাঙ্গালী সৈনিকগন। তারা এই পরিকল্পনা গ্রহন করেন শেষ মুহূর্তে। তারা ধারনা করেছিলেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার সুরাহা হবে। কারন পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠী তখন আলাপ আলাচনার জন্য ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যখন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো তখন তারা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত সামরিক পরিকল্পনা তিন ভাগে ভাগ করা যায় - (১) পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনা (২) পাকিস্তানি বাহিনীতে কর্মরত বাঙালী সৈনিকদের পরিকল্পনা এবং (৩) বাঙালী বেসামরিক বা মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনা।

<u>পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনাঃ-</u> পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গনহত্যা কার্যক্রম আকস্মিক এবং পরিকল্পনাহীন বলে অভিহিত করার কোন অবকাশ নাই। পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতৃবৃন্দ কয়েক সপ্তাহ ধরে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র মূলক ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ঠান্ডা মাথায় বাঙালী হত্যার পরিকল্পনা প্রনয়ন করে। সম্ভত:১৯৭০ সনের নির্বাচনের পর থেকে তারা প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৯৭১ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সেনাবাহিনীর নবম ও ষোড়শ ডিভিশনকে সর্বোচচ প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে বলা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই দুটি ডিভিশন ছিল সংরক্ষিত আক্রমনকারী বাহিনী।[২] কিন্তু বাঙ্গালীদের সন্দেহ মুক্ত রেখে পূর্বাঞ্চলে এই সব সৈন্য সমাবেশ যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো আবশ্যক ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসার সময় সেনা বাহিনীর অনেক সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে আসেন। যদিও ইয়াহিয়া এবং ভূট্টো নিঃসন্দেহ ছিল যে নতুন সংবিধান রচনায় ৬ দফাকে পাশ কাটানো মুজিবের পক্ষে কোন ভাবে সম্ভব পর নয়, তবুও তারা এমন ভাবে প্রচারনা চালান যে, রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে সদিচ্ছাপূর্ন আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমনকি ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট। এমনকি তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলতেও দ্বিধা করেননি। এমনি প্রতারনা মূলক আচরনের মাধ্যমে তিনি বাঙালীদের দৃষ্টি ভঙ্গিকে আড়াল করতে চেয়েছেন এবং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য প্রস্তুতি নিচিছলেন। ঢাকা থেকে তিনি পাখি শিখারের নামে সরাসরি ভূট্টোর লারকানাস্থ বাসভবনে গিয়ে উঠেন, সেখানে সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ জেনারেল হামিদ খান এবং তার প্রধান স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল পীরজাদা তার সাথে মিলিত হলেন। লারকানায় ভূট্টো, ইয়াহিয়া এবং উচচ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা বৃন্দ একত্রিত হওয়ার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ১৯৭১ সনের নয় মাস ব্যাপী গনহত্যার সূচনা, যা এই লারকানা চক্রান্তের ফসল বলে গন্য করা যায়।

১। মোহাম্মদ হাননান-<u>বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস</u>। পৃ- ২৯৭-২৯৮।

২। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম ; <u>লক্ষ প্রানের বিনিময়</u>। পৃ-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে সৈন্য এবং অস্ত্র মজুত করতে থাকে। সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ[৩] ঢাকাসহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সম্মেলন করেন। উক্ত জেনারেলগণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহন করেন এবং একই সঙ্গে একই সময়ে সমগ্র দেশে সুপরিকল্পিত ভাবে গণহত্যা শুরু করে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর কাল রাত্রে।

২২ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনীর রাওয়াল পিন্ডির সদর দপ্তরে সিনিয়র জেনারেলদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে ইয়াহিয়া ও তার জেনারেলরা যে সব সিদ্ধান্ত নিলেন, পরবর্তী কালে সে সিদ্ধান্ত সমূহ পাকিস্তানের জন্য বিপজ্জনক এবং সর্বনাশের কারন হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবত: এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল যে ক্ষমতা কিছুতেই বাঙালীদের হাতে দেয়া যাবেনা।

বরং পশ্চিম পাকিস্তানিদের সকল নির্দেশ মানতে তাদের বাধ্য করা হবে। জেনারেলরা হয়ত ভেবেছিল যে, সামরিক বাহিনী যদি পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের মনে ব্যাপক ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে বাঙালীরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রভুত্ব মেনে নিবে। ভূট্টোও কয়েক জন বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন- স্বায়ত্ব শাসনের ইস্যুটি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবি কর্তৃক প্রনীত। ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক হাজার বাঙালী শেষ করতে পারলেই সব কিছু ঠিক হযে যাবে। টিক্কা খানও বলেছিলেন - এক সপ্তাহ সময় পেলে পূর্ব পাকিস্তানে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।[৪] শুধু পাকিস্তানের গর্ভণর ভাইস এডমিরাল আহসান এবং ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান সাহেবজাদা ইয়াকুব খান নিরপরাধ লোককে হত্যা করার মত জঘন্য কর্মকান্ডে জড়ানোর মতো ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। পরিনতিতে দুজন আফিসারকেই তাদের পদ হারাতে হয়েছিল। জেনারেল রাও ফরমান আলী দম্ভভরে বলেছিলেন-"আমরা জানি আমাদের কি করনীয়, যে কোন মূল্যেই আমরা তা করব"। এবং ২৫ মার্চ রাত্র থেকে তাদের আক্রমনাত্মক সামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হয়।

৩। জেনারেল গন হলেন ১) লে,জে,টিক্কাখান, কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড, ২) মেজর জে, খাদেম হোসেন রাজা, জি,ও,সি, ১৪ ডিভিশন ৩) জে, আবদুল হামিদ খান, চীপ অব স্টাফ ৪) লে,জে, এ,এ, কে, নিয়াজি, কোর কমান্ডার ৫) মেজর জেনারেল আকবর হোসেন, ডাইরেকটর জেনারেল,ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স ৬) মে, জে, ওমর, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন ৭) মে, জে, কমর আলী মির্জা, প্রাক্তন ডাইরেক্টর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ৮) মে, জে, মিঠঠা খান, স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ কমান্ডার এন্ড কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল ৯) মে, জে, খোদাদাদ এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ১০) মে, জে, গুল হাসান, চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ ১১) মে, জে, রাও ফরমান আলী খান, সিভিল এফেয়ারস এডভাইজার ১২) বিগ্রেডিয়ার আনসারী, জি,ও,সি নবম ডিভিশন ১৩) মে, জে, নজর হুসেন শাহ ১৪) মে, জে, কাজি আবদুল মজিদ ১৫) লে, জে, পীরজাদা, পি,এস,টু জে, ইয়াহিয়া খান ১৬) মে, জে, জামশেদ ১৭) মে, জে, বাহাদুর শের। সূত্র-স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, ৯ম খন্ড, পৃ-১-২।

৪। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময়ে, পু-৫৭.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানি বাহিনীতে কর্মরত বাঙালী সৈনিকদের পরিকল্পনাঃ- ১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত-পাকিস্তান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত বাঙালী অফিসার ও সৈনিকগন ই, পি, আর সদস্য এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রথম পরিকল্পনা গ্রহন করেন নিয়মিত বাহিনীর বাঙালী সদস্যগন। কারন ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তান সামরিক সরকারের টালবাহানা বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে বাঙালী সেনাসদস্যদেরও বিচলিত করে। অজানা আতঙ্কে সকলেই দিনাতিপাত করতে থাকে। এমন অবস্থায় এক অবশ্যাম্ভাবী যুদ্ধের আভাসে কিছু বাঙালী সেনা অফিসার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহন করেন। "রাজনৈতিক নির্দেশ ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব নয়"- এই বিশ্বাসে অফিসারগণ বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা পেতে চেষ্টা করেন। একটি সুশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করতে হলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী দরকার। পাকিস্তানি বাহিনীতে কর্মরত বাঙালী দেশ প্রেমিক সৈন্যগণ শুরু থেকে রাজনৈতিক অচলাবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। অনেক বাঙালী পদস্থ কর্মকর্তা ও সৈন্যরা সাদা পোষাকে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষন শোনার জন্য রেইসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানিশাসক গোষ্ঠীর নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার ইতিহাস তাদেরও জানা ছিল। তাই তাদের মনেও সমগ্র বাঙালী জাতির ন্যায় বিক্ষোভের অগ্নি জ্বলজ্বল করছিল। এমতাবস্থায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন বিভিন্ন তৎপরতা চালাচ্ছিল তখন বাঙালী সৈনিকরাও তাদের করনীয় কি হবে সে পরিকল্পনা গ্রহন করতে শুরু করে। প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহনের প্রক্রিয়ায় তারা তৎপর হয়। ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রায় এগার জন সামরিক অফিসার শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সরাসরি অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সাধারণ সৈনিকগন সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য ৭ মার্চ থেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি গ্রহন করছেন বলে জানা যায়। তারা লক্ষ্য করেছেন আলোচনার আড়ালে পশ্চিমাঞ্চল থেকে অবাঙালী সেনাসদস্যদের ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় আগমন কোন অবস্থাতেই সুস্থ পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করেনা - এই বিবেচনায় সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর সামরিক অফিসারদের সতর্ক দৃষ্টি অব্যাহত থাকে এবং তারা স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ ইউনিটসহ সমমনাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও তা অক্ষুন্ন রাখতে সচেষ্ট থাকেন।[৫] কারন তারা বুঝতে পেরেছিল যে, হানাদার বাহিনীর প্রথম আক্রমনের শিকার হবে বাঙালী সৈনিকরা। কারন সশস্ত্র প্রতিরোধে তাদেরই অগ্রনী ভূমিকা থাকবে। তাই পাকিস্তানিবাহিনী শুরুতেই ই, পি, আর, ও পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে। ২৫ মার্চ রাত্রে পিলখানা এবং রাজার বাগ পুলিশ লাইনে আক্রমন করে নিরস্ত্র সৈন্যদের হত্যা করে।

সেনাবাহিনীর সৈনিকগণ মার্চের শুরু থেকেই ব্যাপারটি আঁচ করতে পারে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে চট্টগ্রাম, যশোর, কুমিল্লা ও অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত সৈনিকগণ আঁচ করতে পারেন কি ঘটতে পারে। ১০ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল মিঠঠা খান উপস্থিত হন চট্টগ্রামে। সেখানে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজ "এম, ভি, সোয়াত" থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দ্রুততার সাথে নামিয়ে ফেলার জন্য বাঙালী বিগ্রেডিয়ার মজুমদারকে কড়া নির্দেশ দেন।

৫। এ, এস, এম, সামছুল আরেফিন-মুক্তিযুদ্ধের পেক্ষাপটে ব্যাক্তির অবস্থান (ইউ,পি,এল,১৯৯৫) পৃ-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিগ্রেডিয়ার এম, আর, মজুমদার তাকে বললেন- 'এটা করতে গেলে জনতা মারমুখী হয়ে বাধা দেবে'। উল্লেখ্য যে অস্ত্রবাহী জাহাজ সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের শ্রমিক কর্মচারীরা এসকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারন তারা বুঝতে পেরেছিল এই অস্ত্র বাঙালীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। তাই তারা এই অস্ত্র খালাসে বাধা দেয়।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের বাঙালী সৈনিকদের মনে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হতে থাকে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রায় সকল বাঙালী ইউনিট সুযোগমত নিজেদের প্রতিরক্ষায় পাকিস্তানি সেনাইউনিট থেকে আপাতত নিরাপদ দুরত্বের সন্ধান করতে থাকে। কোন কোন ইউনিট প্রাথমিক অবস্থাতেই বিদ্রোহের মাধ্যমে পক্ষত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করে। এ সময় আরেকটি ঘটনা বাঙালী সৈনিকদের চিন্তিত করে তোলে। গোপনে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ২০ বালুচ রেজিমেন্টের কিছু সৈন্যকে বেসামরিক পোষাকে অবাঙালীদের সাথে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বেসামরিক পোষাকে হলেও সৈন্যরা সবাই ছিল সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত। এ দিকে ৩ মার্চ বিমান যোগে ২২ বালুচ রেজিমেন্টকে ঢাকা আনা হলো এবং গোপনে ঢাকার পিলখানাস্থ ই, পি, আর, সদর দপ্তরে পাঠানো হলো।

বাঙালী সৈনিকদের মধ্যে প্রথম কে যুদ্ধ পরিকল্পনা করেন তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারন যুদ্ধ পরবর্তীতে এ কৃতিত্বের দাবীদার অনেকে। মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম তাঁর "লক্ষ প্রানের বিনিময়ে" গ্রন্থে দাবী করেছেন- "ই, পি, আর-এর চট্টগ্রাম সেক্টর কমান্ডার এর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় তিনিই প্রথম বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন এবং ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সিনিয়র কর্মকর্তা মেজর জিয়াউর রহমান ও কর্নেল এম, আর, চৌধুরীকে জানান। তাঁরা প্রথমে বিদ্রোহ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।" অন্যদিকে মেজর জিয়াউর রহমান দাবী করেছেন[৬] তিনি এবং ক্যাপ্টেন অলি আহমদ বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রথম আলাচনা এবং পরিকল্পনা গ্রহন করেন। ১৭ মার্চ রাত সাড়ে নয়টায় গোপন বৈঠক করেন চারজন সামরিক বাহিনীর অফিসার। এই চারজন হচেছন- লে, কর্নেল এম, আর, চৌধুরী, মেজর জিয়াউর রহমান, নোয়াখালীর মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন অলি আহমদ।

তবে জিয়াউর রহমান স্বীকার করেছেন যে, ই, পি, আর, এর চট্টগ্রাম সেক্টর সদর দপ্তরের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিক এসে তার সাথে দেখা করন ২২ মার্চ। রফিক সরাসরি তাঁকে বললেন, সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদেরকে বিদ্রোহ ঘোষনা করতেই হবে। আপনার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। আপনি বিদ্রোহ ঘোষনা করুন। ই, পি, আর, দের সাহায্য পাবেন।

এদিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে খালেদ মোশারফ অল্প সময় থাকলেও অন্যান্য অফিসাররাও তার সাথে যোগাযোগ করে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনা গ্রহন করেন। একই সময়ে এবং একইভাবে দেশের বিভিন্ন ক্যান্টেনমেন্টে এবং বিভিন্ন

৬। মেজর জিয়াউর রহমান ; ২৬ মার্চ, ১৯৭২ সংখ্যার দৈনিক বাংলায় প্রকশিত (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, ৯ম খন্ডে সংকলিত, পৃ-৪১)

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্তে অবস্থানরত বাঙালী সৈনিকরাও নিজেদের মত করে পরিকল্পনা গ্রহন করেন যদিও একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হননি। কারন যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রন ছিল পশ্চিমাদের হাতে। নোয়াখালী জেলা যেহেতু কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মাঝামাঝি অবস্থিত তাই এই দুটি ক্যান্টনমেন্টের পরিকল্পনার অধীনে থেকে নোয়াখালীবাসীদের যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহন করতে হয়েছিল।

সে সময় ই, পি, আর, এ শতকরা আশি ভাগ বাঙালী এবং বিশ ভাগ অবাঙালী ছিল। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ ডেপুটেশনে এসে এই বাহিনী পরিচারলনা করতেন। অফিসারদের নব্বই ভাগই ছিল পাকিস্তানি। সমগ্রদেশে পাকিস্তানি গোষ্ঠীর অত্যাচার নিপীড়নের খবর তাদেরও অজানা ছিলনা। প্রত্যেক ই, পি, আর, সদস্যই গোপনে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সম্ভাব্য বিপদের আঁচ করতে পেরেছিল সকলেই। এ অবস্থায় প্রাথমিক যে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ-

১। যে কোন ঘটনার জন্য সতর্ক এবং প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যও তৈরী থাকতে হবে। পাকিস্তানিদের আকস্মিক আক্রমন প্রতিহত করে নিজেদের জীবন রক্ষার প্রস্তুতি নিলেই চলবে না, সে আক্রমন থেকে আমাদের জনগণকে রক্ষার প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

২। ই, পি, আর, এর অস্ত্রাগার এবং বেতারযন্ত্র গুলোর উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রন রাখতে হবে।

৩। সব যানবাহন নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে।

৪। পোর্ট, বিমান বন্দর এবং নেভাল বেইস এলাকায় সকল কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫। ঢাকার এবং সম্ভব হলে অন্যান্য ই, পি, আর, সেক্টরের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

৬। অত্যান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অবাঙালী সৈন্যদের অস্ত্র শস্ত্র থেকে ফায়ারিং পিন খুলে রাখতে অথবা নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং গোপন সংকেত মনে রাখতে হবে।

৭। এ ছাড়া ই, পি, আর, সৈন্যদের সর্বশেষ তালিকা সংগ্রহ করা হয়। এমনকি প্রতিটি দলে কতজন বাঙালী ও অবাঙালী সৈন্য আছে তারও বিস্তারিত বিবরন তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[৭]

ইতিমধ্যে ২৫ মার্চ রাত্রেই বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র প্রতিরোধের বার্তা দেশের সর্বত্র পৌছে যায় ই, পি, আর, -এর ওর্য়ালেসের মাধ্যমে। ২৬ মার্চ সকালে আওয়ামীলীগ নেতা হান্নান প্রথমে এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে। এই ঘোষনা বাংলার জনমনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

৭। মেজর রফিকুল ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময়। পৃঃ ৬৭-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক বা মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনাঃ- বেসামরিক বা মুক্তিবাহিনীর পরিকল্পনা বলতে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নিয়মিত বাহিনী ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগনকে বুঝায় -সরকারী প্রশাসনের সর্বোচচ পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পদের কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, ডাক্তার, আইনজীবি, নারী, বিভিন্ন পেশাজীবি, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনতা। বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করেছে একটি চরম আত্মত্যাগের জন্য। অতএব তারাও নিজেদের মত করে একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। নোয়াখালীতে এই পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষনের পর। নোয়াখালী জেলার প্রত্যেকটি থানা থেকে দুটি করে বাস ভর্তি নেতা ও কর্মীরা যোগ দিয়েছিল রেইসকোর্সের জনসভায়। জনসভা থেকে ফিরে প্রত্যেক থানায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। প্রশাসনের সঙ্গে এবং প্রত্যেক থানার বাঙালী পুলিশ ও আনসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীকে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (জহুরুল হক হল) সাধারণ সম্পাদক আ, ও , ম, সফিকুল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান নোয়াখালীতে চলে আসেন ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করার জন্য এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহনের কর্মী তালিকাভূক্ত করার জন্য। ২৪ মার্চে ইকবাল হলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় যে সিদ্ধান্ত হয় তা টেলিগ্রাম করে জানানো হয় লক্ষ্মীপুরে সফিকুল্লাহকে এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে মোস্তাফিজুর রহমানকে।[৮] ইতিমধ্যে ২৩ মার্চ নোয়াখালীতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা মোমিন উল্লাহ। জেলা প্রশাসকসহ সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ এই পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এরপর থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত সর্বস্তরের জনগণ একটা উত্তেজনাকর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাটান। ঢাকায় কি হচেছ না হচেছ কোন সঠিক খবর পাওয়া যাচিছল না। যোগাযোগ বিচিছন্ন। আওয়ামী লীগের নেতারাও কোন খবর দিতে পারছেন না। এমনি অবস্থায় ২৬ মার্চ ভোর তিনটার দিকে ঢাকা থেকে ই, পি, আর, এর ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষনা প্রত্যেক জেলারমত নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক ও আওয়ামী লীগনেতারা এই মর্মে বার্তা পান যে, "ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানিবাহিনী। শত্রুদের মোকাবেলা কর।"

এখবর জেলা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পর পরই রাস্তায় মিছিল বের হয়। সকাল আটটায় সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসন এবং সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক জরুরী বৈঠক বসে। এসভায় আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাপসহ সব দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলা প্রশাসক মনযুর-উল-করিম ঢাকা থেকে প্রাপ্ত বার্তা পড়ে শোনান এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা কি গ্রহন করা যায় তার মতামত আহবান করেন। সভাশেষে সর্বসম্মতভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা গ্রহনের সিদ্ধান্ত হয়। আওয়ামী লীগের আবদুল মালেক উকিল এবং মাহবুবুল আলম চাষীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শুরু হয় নোয়াখালীতে।[৯]

৮। সাক্ষাতকার; জনাব আ, ও, ম, সফিকুল্লাহ, জি, এস, ইকবাল হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯। সাক্ষাতকার; মনযুর-উল-করিম। ডি,সি, নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

জেলাসদরের নেতৃবৃন্দ এবং জেলা প্রশাসন প্রাথমিক যে পরিকল্পনা গ্রহন করেন তা ছিল নিম্নরূপঃ

১। যুদ্ধের জন্য আগ্রহী ছাত্র / যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন।
২। আনসার এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা আগ্রহী ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩। অবসর প্রাপ্ত সামরিকবাহিনীর সদস্য এবং ছুটিতে থাকা বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের খুজে বের করা এবং তাদের তালিকা প্রস্তুত করা।
৪। লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্র এবং বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা।
৫। প্রত্যেক থানায় যাতে অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহন করে সে ব্যবস্থা করা এবং
৬। নোয়াখালী জেলা যতদিন সম্ভব শত্রু মুক্ত রাখা।

নোয়াখালী জেলায় প্রথম ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয় মাইজদীতে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয় নোয়াখালী বালিকা উচচ বিদ্যালয়ে যাতে করে বাহির থেকে বুঝা না যায়। ফেনীর মিজান ময়দানেও আরেকটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। সর্ব প্রথম যিনি প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন তিনি হলেন রির্জাভ ইনসপেক্টর অব পুলিশ সদরুল আলা খান চৌধুরী (ময়মনসিংহের হাযরাত নগরের দেওয়ান পরিবারের সন্তান। তাঁর পুরো পরিবার পাকিস্তান আমলে শুটিংয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে।) এবং তাঁর সাথে ছিলেন সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা (ও, সি) নুর মোহাম্মদ চৌধুরী। এছাড়া জেলার প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রথমে ৩০৩ রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং শুরু হয়। পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যগণ ট্রেনিং দেয়া শুরু করেন। পরে নুরুল হক মিয়া অবসর প্রাপ্ত পাকিস্তান আর্মিদের তালিকা নিয়ে তাদের খুজে বের করেন এবং তাদের হাতে ক্যাম্পের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

প্রাথমিক ভাবে মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশের তরুন ছাত্র যুবকদের ট্রেনিং দেয়া শুরু হয়। কিন্তু এই ট্রেনিং শুরু হয় একেবারেই বিচ্ছিন্নভাবে। পরে ভারতের সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী (বি, এস, এফ) বিক্ষিপ্তভাবে এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। তাতে অস্ত্র ও অন্যন্য বিষয়ের সাহায্য ছিল একেবারেই অপ্রতুল। ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ছাত্র যুবকদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য ভারতের সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করে এ ব্যাপারে সম্মতি আদায় করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এই আয়োজন সম্পন্ন করে ৯মে থেকে। তবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয় দুহাজার ছাত্র ও যুবকের প্রথম দলের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। এর মেয়াদ ছিল মাত্র চার সপ্তাহ। মূলত: সাধারণ হালকা অস্ত্র চালনা ও বিস্ফোরক ব্যবহার শিক্ষাই এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ ছিল।[১০]

১০। মোহাম্মদ হাননান; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পৃ-৩৮৮-৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

জুন মাসের শেষের দিকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুহাজার ছাত্র ও যুবক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। এরা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সামান্য অস্ত্র সম্বল করেই পাকিস্তানি বাহিনীকে ইতস্তত: আক্রমন করতে থাকে। এরা ঢাকা-চট্টগ্রামে রেলপথসহ বিভিন্ন স্থল ভাগের যোগাযোগ বিচিছন্ন করে দেয়। পন্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়। বড় বড় সেতু ধ্বংস করে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচিছন্ন করে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বাঙ্গালী সহযোগিদের সন্ত্রাসের কারন হয়ে দাড়ায়। অনিয়মিত যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী এই ছাত্র তরুনদের গেরিলা বাহিনীর নাম দেয়া হয়েছিল "গণবাহিনী"। কিন্তু তারা জনগনের কাছে পরিচিত হল "মুক্তিবাহিনী" নামে। আবার কোথাও "মুক্তিযোদ্ধা" অথবা এফ, এফ (Freedom Fighter) নামেও তারা পরিচিতি লাভ করে। তবে 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটিই অপেক্ষাকৃত অধিক স্বীকৃতি পায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটিই ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশ সরকারের কাছে 'মুক্তিবাহিনী' ছিল অনিয়মিত বাহিনী। ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, আনসার, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী ছিল নিয়মিত বাহিনী।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ইং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নবগঠিত মন্ত্রীসভা ১৮ এপ্রিল ৭ জন ছাত্র নেতাকে দেশের ভেতর ছাত্র ও যুবকর্মী সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব প্রদান করেন। এটা ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ীমন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রিক্রুটিং এর দায়িত্ব ছাড়াও একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন, ট্রেনিং ও পরিচালনার অধিকার ও দায়িত্ব এই ৭ জনকে দেন। এই সাত জন ছাত্রনেতা হচেছন- ছাত্রলীগ ও ডাকসুর সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা ডাকসু সহ-সভাপতি আ, স, ম, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাহাজান সিরাজ, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, ও তোফায়েল আহমদ। ৭ জনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালনকারী ২ জন নেতা-আ,স,ম, আবদুর রব ও সিরাজুল আলম খান হচেছন নোয়াখালীর সন্তান।

সমগ্র বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনাকে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষন করতে হলে একে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করলে সহজবোধ্য হবে। যেমনঃ-

<u>প্রথম পর্যায়ঃ</u> ২৫ মার্চ থেকে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই পর্যায়ে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলেছিল তা মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ছিল পরিকল্পিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল সুষ্ঠ সামরিক পরিকল্পনা বিহীন। মুক্তিযুদ্ধের এই পর্যায়ে এদেশের জনগন অসংগঠিত হলেও স্বত:স্ফুর্ত ভাবে পাকিস্তানিসৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

<u>দ্বিতীয় পর্যায়ঃ</u> জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পর্যায়ে বাংলাদেশ বাহিনীকে পুর্নগঠন এবং সেকটরে বিভক্ত করে সব-সেকটরে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা হয়। এই পর্যায়ে 'কনভেন্শনাল' যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বন করে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গেরিলা তৎপরতা শুরু করা হয়। একই সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কনভেনশনাল যুদ্ধের জন্য কঠোর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায় ঃ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত এই পর্যায়ে গেরিলা তৎপরতা বহুগুন বৃদ্ধি পায়। এই সময় পুনর্গঠিত বাংলাদেশ বাহিনীর নিয়মিত ব্যাটালিয়ন সমূহ এবং সেক্টর ট্রুপস্ দ্বারা ভারত সীমান্তে নিকটবর্তী পাকিস্তানি অবস্থান সমূহ সব সেকটরেই কয়েকটি কনভেনশনাল আক্রমন পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। সীমিত লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত এসব আক্রমনের সাফল্য সামরিক ভার সাম্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে না পারলেও শত্রু অবস্থানে এসব আক্রমন আমাদের যোদ্ধাদের এবং জনগনের আস্থা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

চতুর্থ পর্যায়ঃ ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের এই পর্যায়ে রয়েছে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক ব্যাপক সামরিক অভিযান। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনা বাহিনী পরাজিত হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।[১১]

কিন্তু নোয়াখালীর যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিকে ভিন্ন ভাবে সাজানো যায়। যেমন-

প্রথম পর্যায়ঃ ২৬ মার্চ থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল সার্বিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহনের দিন। কারন এই সময় নোয়াখালী জেলা ছিল শত্রুমুক্ত। সারাদেশের গুরুত্বপূর্ন স্থান গুলো যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত তখন নোয়াখালীবাসী শত্রুর নাগালের বাইরে থেকে একটা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহনের সুযোগ পায়। বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ তাদের করনীয় কি তা স্থির করে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। জেলা প্রশাসনও এই সময় সম্ভবপর সবরকমের সাহায্য সহযোগিতা করে। আনসার এবং পুলিশ ক্যাম্প থেকে অস্ত্র নিয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। তরুন নেতারা এসময়ে সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করে। স্থনীয় আওয়ামী লীগের নেতারা এ সময়ে ভারতে চলে যান, ভারত সরকারের কাছ থেকে সাহায্য এবং সহযোগিতা আদায়ের জন্য। এ সময়ে ফেনী হাইস্কুলে একটি নিয়ন্ত্রন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এর নিয়ন্ত্রক ছিলেন ফেনীর এম, এন, এ খাজা আহমদ। সমগ্র নোয়াখালী থেকে ভারতে যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল ফেনীর বেলুনিয়া বর্ডার।

এ সময় নোয়াখালীবাসী আক্রান্ত হলে কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে সে পরিকল্পনা গ্রহন করতে থাকে। ৮ এপ্রিল মাহবুবুল আলম চাষীকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় নোয়াখালী জেলা জজ গাজী শামসুর রহমানের বাসায় একটা আলচনা সভা হয় ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে। এসময়ে একটা জীপে করে মেজর জিয়াউর রহমান আসেন এবং জেলা প্রশাসক মনযুর-উল-করিমের সঙ্গে যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।[১২] এসময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়

১১। মেজর রফিকুল ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময়ে; পৃষ্টা ২১৩-২৯৪।
১২। সাক্ষাতকার; মনযুর-উল-করিম; (অবসর প্রাপ্ত সচিব)

Dhaka University Institutional Repository

এবং ছাত্র যুবকদের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় পাঠানো হয় প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য। সেখানে আ,স,ম আবদুর রবের (ডাকসু ভি,পি,ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতা) সঙ্গে যোগাযোগ করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনী নোয়াখালীতে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ২৩ এপ্রিল থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নোয়াখালীতে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী যুবকদের সমন্বয়ে একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে।

এই যুদ্ধ ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত। পাকবাহিনীর অবাধ চলাচলে বাধা দেয়াই ছিল লক্ষ্য। স্থানীয় জনগনের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধ চলতে থাকে এসময়। এসময় চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করে।

তৃতীয় পর্যায়ঃ জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে সেপ্টম্বর পর্যন্ত এই পর্যায়ে বাংলাদেশ বাহিনীকে পুর্নগঠন এবং সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১ টি সেকটরে বিভক্ত করে সব-সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় করা হয়। লে, কর্নেল এম, এ, রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খন্দকার ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারন করা হয়। নোয়াখালী দুটো সেক্টরের মধ্যে পড়ে। ১ নং সেক্টরে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ মুহুরী নদীর পূর্ব এলাকা অর্থাৎ ছাগল নাইয়া থানা নিয়ে গঠিত ছিল। নোয়াখালী জেলার বাকী অংশ ২নং সেক্টরের সঙ্গে (কুমিল্লা, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ) যুক্তছিল।[১৩] এ সময় কনভেনশনাল যুদ্ধের পাশাপাশি নোয়াখালীতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়।

চতুর্থ পর্যায়ঃ অক্টোবরের প্রথম থেকে শুরু করে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর নিয়মিত ব্যাটালিয়ন সমূহ পরিকল্পিতভাবে আক্রমন পরিচালনা করে।

পঞ্চম পর্যায়ঃ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ যৌথ বাহিনীর আক্রমনে নোয়াখালী মুক্ত হয় ৭ ডিসেম্বর। নোয়াখালীর মুক্ত আকাশে উড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

সশস্ত্র প্রতিরোধে নোয়াখালীঃ- ২৬ মার্চ থেকে সারা দেশের মতো নোয়াখালী জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। যদিও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২২ এপ্রিল ১৯৭১, পর্যন্ত নোয়াখালী শত্রু মুক্ত ছিল, কিন্তু নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার ফেনী শহরের মধ্য দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহা সড়কের অবস্থানের কারণে এসময় ফেনীতে কিছু বিক্ষিপ্ত আক্রমন শত্রু বাহিনী পরিচালনা করে। তার পরও এপ্রিলের প্রায় পুরো মাস ফেনী শহর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রনে ছিল। উল্লেখ্য নোয়াখালীর ফেনীতে যুদ্ধের তীব্রতা বেশী ছিল।

১৩। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র; ১০ খন্ড, পৃ-৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চ রাতে সারা দেশে পরিকল্পিত ভাবে পাকিস্তান বহিনী গণহত্যা শুরু করলে ফেনীতে ১ নম্বর উইং এর সহকারী অধিনায়ক (অবাঙালী) ক্যাপ্টেন ফারুকীর নেতৃত্বে এক প্লাটুন ই, পি, আর, সৈন্য স্থানীয় জনগণের উপর আক্রমন চালায়। সে বাঙালী ই, পি, আর, সৈন্যদের কাছ থেকে আগেই অস্ত্র কেড়ে নেয় এবং নিজের অনুগত বাহিনীসহ ফেনীর সি, ও, অফিসে ঘাঁটি স্থাপন করে। স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতিরোধ ২৬ মার্চ সকাল থেকে গড়ে উঠে এবং ২৭ মার্চ জনতা সি, ও, অফিস ঘেরাও করে। হানাদার বাহিনী গুলি ছুড়লে ৪ ব্যক্তি নিহত এবং ১০ জন আহত হয়। ফলে জনতা আরো জঙ্গী হয়ে এঠে। এ পর্যায়ে ১নং উইং সদর থেকে বাঙালী নায়েক সুবাদার আফতাব উদ্দিন এক প্লাটুন সৈন্যসহ শালধর বাজার বিওপিতে নায়েক সুবাদার বাদশা মিয়া ও তার প্লাটুনের সঙ্গে একত্র হয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হন। এদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় জনতা, ছাত্র, মুজাহিদ আনসার, পুলিশ ও অবসর প্রাপ্ত সেনাসদস্যরা। ফলে ফেনীতে গড়ে উঠে এক বিরাট বাহিনী। সম্মিলিত এই বাহিনী ২৭ মার্চ ফ্লাইট ল্যাফটেন্যান্ট আবদুর রউফের নেতৃত্বে সি, ও, অফিস আক্রমন করে। এই আক্রমনে ক্যাপ্টেন ফারুকীসহ অধিকাংশ অবাঙালী ই, পি, আর, সৈন্য নিহত হয়। ১৬ জন বাঙালী ই, পি, আর সৈন্যকে সি, ও, অফিস থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।[১৪]

শুরু থেকেই নোয়াখালী সদর এবং ফেনী সদরে প্রশিক্ষণ শিবির এবং নিয়ন্ত্রন কক্ষ খোলা হয়েছিল। ফেনীতে নেতৃত্ব দিতেন খাজা আহমদ (এম, এন, এ) এবং নোয়াখালীতে নুরুল হক মিয়া ও আবদুল মালেক উকিল। যে কারণে এপ্রিলের প্রথম ভাগেই নোয়াখালীতে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে। ফেনীতে পুলিশ, আনসার, ই, পি, আর, প্রাক্তন সৈনিক ও ছাত্র জনতাকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠে এবং তাদের প্রতিরোধের মুখে পাকবাহিনী ফেনী শহরে প্রবেশ করতে না পেরে ৪ এপ্রিল অপ্রত্যাশিত ভাবে ফেনী শহরের উপর পাকবিমান বোমা বর্ষন শুরু করে। এই বিমান হামলায় শহরের বহু বাড়ী ঘর বিধ্বস্ত হয় এবং নিহত ও আহত হয় বহু নারী-পুরুষ ও শিশু। এই হামলার মুখে মুক্তিবাহিনীও শহরের উচু দালানের ছাদে উঠে বিমানের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে থাকলে একটি বিমানে আগুনে ধরে যায় এবং বিমানটির ধ্বংসাবশেষ ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তে গিয়ে পড়েছিল। অন্য বিমানটি পালিয়ে যায়।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে সৈন্য যাতায়াতের সময় মাঝে মধ্যে ফেনীতে বিক্ষিপ্ত আক্রমন পাল্টা আক্রমন চললেও ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ফেনী এবং নোয়াখালীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল। নোয়াখালীতে পাক হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে লাকসাম হয়ে। মুক্তিবাহিনী পূর্ব থেকে নোয়াখালীর প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা গ্রহন করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রবেশ পথে প্রতিরোধ স্থাপন করা হয়। এসময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নোয়াখালীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় সুবেদার লুৎফর রহমানের উপর। তিনি সুবেদার সিরাজুল হককে সঙ্গে নিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই, পি, আর, ও পুলিশের ৭৬ জন প্রকৃত নিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করে নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রুসেনাদের

১৪। আবু মোঃ দেলওয়ার সম্পাদিত- মুক্তি যুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (ডিসেম্বর ১৯৯৩) পৃ-৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

গতিবিধি লক্ষ্য করে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ স্থাপন করা হয়। পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রথম তিনি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন ১০ এপ্রিল লাকসামে। মাত্র ৭০ জন যোদ্ধা, দুটো এল, এম, জি, এবং বাকী সব ৩০৩ রাইফেল নিয়ে তিনি এই অভিযান পরিচালনা করেন। অতর্কিত এই আক্রমনে পাকবাহিনীর দুজন লেফটেন্যান্টসহ ২৬ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৬০ জন আহত হয়। ময়নামতি থেকে সরবরাহ ও সৈন্য পেয়ে পাকবাহিনী দ্বিগুন শক্তিতে মেশিনগান, মটার ও আর্টিলারির গোলাগুলি শুরু করলে তার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফলে পাকবাহিনী লাকসাম দখল করে নেয়। এর পর দৌলতগঞ্জ সেতু উড়িয়ে দিয়ে লাকসাম-নোয়াখালী যোগাযোগ বিচিছন্ন করে দেয়া হয়।[১৫]

২০ এপ্রিল নাথেরপেটুয়ায় মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে স্থলবাহিনীর আক্রমনের পাশাপাশি বিমান থেকে আক্রমন পরিচালনা করা হয়। তারপরও পাকবাহিনী অগ্রসর হতে না পেরে কয়েকটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে লাকসামের দিকে চলে যায়। ২১ এপ্রিল আবার শত্রুবাহিনী অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে সোনাইমুড়ী রেলষ্টেশনের নিকট তাদের এ্যামবুশ করা হয়। কিন্তু পাকবাহিনীর অত্যাধুনিক অশ্রসস্ত্র এবং মুক্তিবাহিনীর অস্ত্রের অভাবে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনী এই সুযোগে সোনাইমুড়ী দখল করে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হয়। ২৩ এপ্রিল পাকবাহিনী চৌমুহনী বাজারে অগ্নিসংযোগ এবং বেগমগঞ্জ টেকনিক্যাল হাইস্কুলে ঘাঁটি স্থাপন করে নোয়াখালীর মাইজদী পর্যন্ত দখল করে নেয়। মাইদজী পি, টি, আইতে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে।

এ সময় সুবেদার লুৎফর রহমানের বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং লোকবলের অভাবে তাঁর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। জেলা প্রশাসক মনযুর উল করিম এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল, নুরুল হক মিয়া, শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার, অধ্যাপক মোঃ হানিফ, আবদুর রব উকিল, শাখাওয়াত উল্যাহ উকিল, বিছমিল্লাহ মিয়া, রফিকুল্লাহ মাষ্টার, আবদুর রশিদ, গাজী আমিন উল্লাহ প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় সংঘবদ্ধ করা হয় এবং প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়া হয়। ২৪ এপ্রিল আওয়ামী লীগ নেতা গাজী আমীনউল্যাহ মিয়া প্রথম বারের মত অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য ভারতে চলে যান।[১৬] এছাড়া নোয়াখালীর উর্ধ্বতন আওয়ামীলীগ নেতারাও ভারতে চলে যান প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভের আশায়। কারণ ইতিমধ্যে ১৭ এপ্রিল প্রবাসী মুজিব নগর সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার ভারতের সর্বাত্মক সাহায্য এবং সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ শুরু করেছে এবং দেশের অভ্যান্তরে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে নীতি নির্ধারণ করছে।

ইতিমধ্যে পাকবাহিনী নোয়াখালী জেলার এক বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রনে আনে। পুরো শহর তাদের নিয়ন্ত্রনে। মুক্তিযোদ্ধারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেছে। ২৪ এপ্রিল জেলা প্রশাসকের গাড়ী পাক বাহিনীল টহল গাড়ীর সামনে পড়ে যায়। তারা জেলা প্রশাসককে খুজছিল। গাড়ীতে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মহকুমা প্রশাসক (এস, ডি, ও) এবং পুলিশ সুপার ছিলেন। তাঁদেরকে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে সবাইকে গালিগালাজ করে এবং জেলা প্রশাসক

১৫। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, নবম খন্ড (স্বাক্ষাতকার-সুবেদার লুৎফর রহমান) পৃ-১৯৮।
১৬। সাক্ষাৎকার-গাজী আমিন উল্যা

Dhaka University Institutional Repository

মনযুর উল করিমকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করা হয়। এর পূর্বেই নোয়াখালীর আনসার এডজুট্যান্ট হাবিব উল্লাহ খানকে ধরে নিয়ে আসে পাকবাহিনী। মেজর পারভেজের নির্দেশে হাবিব উল্লাহ খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এটা ছিল নোয়াখালীতে পাকবাহিনীর প্রথম পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।[১৭]

এ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। বিভিন্ন বাহিনী থেকে পালিয়ে আশা সৈন্যরা স্থানীয়ভাবে ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে লোকবল বাড়াতে থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদও আসতে থাকে। প্রাথমিক প্রতিরোধের শক্তি অর্জন করতে থাকে মুক্তিবাহিনী। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে একটা গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে মুক্তিযোদ্ধরা মাতৃভূমি রক্ষার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এসময় তার সঙ্গে যোগ দেন চট্টগ্রাম ই, বি, আর, সি থেকে পালিয়ে আসা হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারী, নায়েক সুবেদার ওয়ালী উল্লাহ, আলী আকবর পাটওয়ারী এবং ছুটিতে থাকা অনেক সেনা সদস্য। দলের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকায় তাদের মনোবল ও বাড়তে থাকে এবং শত্রুবাহিনীর উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

এদিকে পাকিস্তানি বাহিনী ২৪ এপ্রিল নোয়াখালী জেলার পশ্চিম সীমান্ত লক্ষ্মীপুর হয়ে রায়পুর পর্যন্ত দখল করার পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই লক্ষ্যে পাকবাহিনীর একটি গ্রুপ লক্ষ্মীপুরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকবাহিনীর সামনে একটি লাল জীপ ছিল। দুই শতাধিক পদাতিক বাহিনী হেটে রওয়ানা দেয় চৌমুহনী থেকে লক্ষ্মীপুরের উদ্দেশ্যে। জীপখানা ফেনাঘাটার পশ্চিমে জয়নারায়নপুর ব্রীজের কাছে পৌছলে ওঁৎপাতিয়া থাকা সুবেদার লুৎফর রহমানের প্রেরিত গ্রুপ কমান্ডার সফি উল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর গ্রুপটি পাকবাহিনীর জীপ লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। গাড়ীখানা অকেজো হয়ে গেলে পদাতিক বাহিনীর সৈন্যগণ মুক্তিবাহিনীর উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এ অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর গুলি শেষ হয়ে গেলে পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীদের ঘিরে ফেলে এবং পলায়নরত দুইজন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করে। এ ছাড়াও স্থানীয় চার জনকে হত্যা করে। চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার পুরো জ্বালিয়ে দেয় এবং দুইজন নিরীহ লোককে হত্যা করে।[১৮] এভাবে পাকবাহিনী লক্ষ্মীপুর হয়ে রায়পুর থানা পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রনে আনে।

অন্যদিকে এপ্রিলের শেষ নাগাদ ঢাকা-চট্টগ্রামে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য হানাদার বাহিনী শক্তিবৃদ্ধি করে ফেনীর উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে তারা কুমিল্লার দিক থেকে স্থলপথে আক্রমন চালিয়ে ফেনী দখল করে নেয়। ফেনীর পতনের পর মুক্তিবাহিনী পূর্ব দিকে ছাগলনাইয়ায় অবস্থান নেয়। সেখানে চাঁদগাজীতে তারা একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। মেজর জিয়া ও মেজর খালেদ মোশারফের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত চাঁদগাজীর যুদ্ধ ছিল দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ যুদ্ধ। এ অবস্থায় মোটামুটি সমগ্র নোয়াখালী জেলায় পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭। সাক্ষাতকার মনযুর উল করিম, তৎকালীন জেলা প্রশাসক নোয়াখালী (অবঃ সাবেক সচিব)।
১৮। মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী 'সি' জোন-সম্পাদক-কারী করিম উল্লাহ, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৯ এপ্রিল ১৯৭১ আবির পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় নোয়াখালীতে অবস্থানরত সকল সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, মুক্তিযোদ্ধাদের হাজির হওয়ার অনুরোধ করা হয়। আমন্ত্রনের দায়িত্ব পালন করেছেন আবির পাড়ার আবুল খায়ের ভূঁইয়া, গাজী আমিন উল্যাহ, ছালেহ আহমেদ ভূঁইয়া, আতিক উল্যাহ, সুলতান আহমেদ, ছাত্রনেতা সফি উল্যাহ ও কারী করিম উল্লাহ। উক্ত সভাতে সুবেদার লুৎফর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। সকল বাহিনীর সদস্যদের মধ্য হতে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবেদার অলিউল্লাহ, সুবেদার শামছুল হক, হাবিলদার মমতাজ, হাবিলদার রুহুল আমিন ও হাবিলদার জামালকে গ্রুপ কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই সময় গণপরিষদ সদস্য খালেদ মোহাম্মদ আলী ভারত থেকে এসে বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর এবং মাইজদীতে মুক্তিবাহিনী সংগঠনের কাজ জোরদার করেন। ২ মে ১৯৭১ আবির পাড়ায় আওয়ামী লীগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকের মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। খালেদ মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি এবং আবুল খায়ের ভূঁইয়াকে সেক্রেটারী করা হয়। শহীদ রুহুল আমিন (খিলপাড়া), গাজী আমিন উল্যাহ, আলী আহাম্মদ চৌধুরী, কারী করিম উল্লাহ, আবদুর রব চেয়ারম্যান (জিরতলা) সহ ৩১ জনকে সদস্য করে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় গাজী আমিন উল্যাহকে সর্ব সম্মতিক্রমে আগরতলায় যোগাযোগ করে অস্ত্র সরবরাহ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সুবেদার লুৎফর রহমানকে অস্ত্র সরবরাহ করতেন।[১৯]

ইতিমধ্যে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। ১লা মে বগাদিয়ায় নায়েক সিরাজ এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে বগাদিয়া সেতুর কাছে এ্যামবুশ করে। এ জায়গা দিয়ে একখানা জীপসহ ৩ খানা তিনটনী লরী কিছু দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হবার সময় নায়েক সুবেদার সিরাজ পাকবাহিনীর উপর আক্রমন চালায় এবং প্রথম ও শেষ গাড়ীর উপর অনবরত গুলি চালালে ৩ টনী একখানা গাড়ী সম্পূর্ন ধ্বংস হয়। এখানে ১৫/২০ জন পাকিস্তানিসেনা নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। পরক্ষণে পাকবাহিনী ৩ ইঞ্চি মর্টার ও মেশিনগানের গুলি ছুড়তে শুরু করলে মুক্তিবাহিনী পশ্চাদপসারণ করে। পাকসেনারা কয়েকটি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এখানে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়।[২০]

৬ মে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে পুনরায় ফেনা ঘাটায় সংঘর্ষ হয়। পাকবাহিনী চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়ক পথে চলাচল করছিল। নায়েক সফি তার দল নিয়ে ফেনাঘাটা পুলের নিকট এ্যামবুশ বসায়। অনেক্ষন অপেক্ষা করার পর চন্দ্রগঞ্জের দিক থেকে তিনখানা পাকসৈন্য বোঝাই ট্রাক চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মুক্তিবাহিনী অতর্কিতে আক্রমন চালায়। পাকসেনার বুঝে উঠার আগেই বেশ কয়েকজন শত্রুসেনা নিহত হয়। পরমুহুর্তে তারা ভারী মেশিনগান দিয়ে পাল্টা আক্রমন চালায়। পাকসেনাদের মেশিনগানের গুলিতে একই নামের (ইসমাইল) দুই জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের একজনের বাড়ী আমিশাপাড়া বাজারের পশ্চিমে সাতঘরিয়া,

---

১৯। কারী করিম উল্লাহ ; মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী 'মি' জোন (ডিসেম্বর/৯৮) পৃ-১২।
২০। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র -৯ম খন্ড, পৃ-২০১-২০২।

Dhaka University Institutional Repository

অপরজনের বাড়ি রামগঞ্জ থানায়। দুইজনকে পদিপাড়ায় সামধিস্থ করা হয়।[২১] ফেনাঘাটা যুদ্ধ ও অপারেশনের পর মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের মধ্যে নতুন করে সাহসের সঞ্চার হয়। ৯ মে নায়েক সুবেদার অলি উল্লাহ্ বগাদিয়াতে পুনরায় এ্যামবুশ করে। এদিনকার যুদ্ধে পাকসেনাদের দুজন জে, সি, ও নিহত হয়। আক্রমন পাল্টা আক্রমনে শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। এসময় চৌমুহনী-লক্ষীপুর সড়কে আবারও সংঘর্ষ ঘটে।

১০ মে রাত ১১টায় হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে রায়পুর থানা আক্রমন করা হয়। ভোর ৪.৩০ টা পর্যন্ত আক্রমন পাল্টা আক্রমন চলে। একজন চৌকিদার নিহত হয় এই আক্রমনে। ভোর ৫ টায় মুক্তিবাহিনী সরে পড়ে।[২২] মে মাসেই পাকবাহিনী রামগঞ্জে ক্যাম্প স্থাপন করে রামগঞ্জ এম, ইউ, সরকারি হাই স্কুলে। তারা লক্ষীপুর থেকে দালাল বাজার হয়ে রামগঞ্জ আসা যাওয়া করত। ১১ মে সুবেদার অলি উল্লাহ্, নায়েক আবুল হোসেন এবং লক্ষীপুরের প্লাটুন কমান্ডার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর দল নিয়ে মীরগঞ্জ বাজারের পাশে এ্যামবুশ করা হয়। শত্রুবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমনের ভয়ে একখানা গরুর গাড়ী সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। গরুর গাড়ী খানা পুতেরাখা মাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড শব্দে সেটি কয়েক হাত উপরে উঠে যায়। প্রচন্ড শব্দে হানাদার সৈন্যরা এতই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে, যে তারা কয়েক জন অস্ত্র ফেলে প্রানপনে পালানোর চেষ্টা করে। তখনই শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলি। পাকিস্তানি সৈন্যরাও নিজেদের সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমন করে। এসময় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে পশ্চিম পার্শ্ব থেকে পাকবাহিনীর উপর রাইফেল থেকে গুলি ছুড়লে পাকবাহিনীর একজন কর্মকর্তা তখন চিৎকার করে বলে উঠে "এধার মুক্তি ওধার মুক্তি হ্যায়" মুক্তিযোদ্ধাদের দুদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাকসৈন্যরা জীপ ফেলে দিয়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে পালাতে শুরু করে। পলায়নরত অবস্থায় একজন গ্রাম চৌকিদার তাদের পথ দেখিয়ে রামগঞ্জের দিকে নিয়ে যায়।[২৩] এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া বেশ কিছু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অস্ত্র হলো- ৫টি স্বয়ংক্রিয় চাইনিজ রাইফেল, ৬ টা চাইনিজ স্টেনগান, ১টা রকেট লাঞ্চার, ১টা এল, এম, জি, এবং অনেক বোমা ও গোলাবারুদ। তাদের ফেলে যাওয়া জীপটি বিজয় নগর গ্রামের একটি বাড়ীতে মাটির নীচে পুতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর পাকবাহিনী এসে জীপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পাকসেনারা নোয়াখালী থেকে লাকসাম হয়ে ফেনীর পথে রেলপথে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয় মে মাসের শেষের দিকে। পরিকোট পুলের নিকট প্রায় একদিন যুদ্ধ চলে। তাদের ত্রিমুখী আক্রমনের মুখে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ঐদিনই পাকবাহিনী বিমান আক্রমন চালায় ফেনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। মুক্তিযোদ্ধারা তখনো পাকসেনাদেরকে তিনদিক থেকে আটকে রেখেছিল নোয়াখালীর পশ্চিম দিকে, ও ফেনীর উত্তর দিকে বুরবুরিয়া ঘাট এলাকায়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা একদিন গুনবতীতে অপেক্ষা করার পর অতর্কিতে ফেনীর তিনদিক

২১। পূর্বোক্ত
২২। সাক্ষাতকার - হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারী, তাং ২৫-৭-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঘিরে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধারা মরিয়া হয়ে বারঘন্টার মত তাদেরকে বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের ভারী অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে ফেনী ছাড়তে বাধ্য হয় এবং ভারতের সীমান্তে একিনপুরে ফেনীর সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়। একিনপুর থেকে ৪ কোম্পানী সৈন্য নিয়ে শুভপুর, বুরবুরিয়া ঘাট, মুহুরী নদী ও ছাগল নাইয়া ফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেয় ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে। পাকসেনারা এসময় অতর্কিতে ছাগল নাইয়ার দিকে অগ্রসর হয়। তারা জানতনা এ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে। কিছু সংখ্যক পাকসেনা মুহুরী নদী পার হতেই অতর্কিত তাদের উপর হামলা চালান হয়। এযুদ্ধে অনেক পাকসৈন্য নিহত হয়। দুদিন পর্যন্ত পাকসেনাদের মৃতদেহ এখানে পড়ে থাকে।[২৪]

এভাবে বিক্ষিপ্ত ও অপরিকল্পিত ভাবে খুব হালকা অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ করে চলে ভারী আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত পাকবাহিনীকে। সমগ্র মে মাস চলে এধরনের প্রতিরোধ। সমস্ত বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত নোয়াখালী জেলাতে ও পাকবাহিনী বিশাল ঘাটি স্থাপন করে নোয়াখালীর চৌমুহনী টেকনিক্যাল হাইস্কুলে। এসময় তারা আবার "রাজাকার" বাহিনী গঠন করে তাদের এদেশীয় দোষরদের দ্বারা। আসলে শব্দটি হচ্ছে রেজাকার।[২৫] 'রেজা' আরবী শব্দ এবং 'কার' ফারসী শব্দ যুক্ত হয়ে রাজাকার শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ স্বেছায় যারা কাজ করে। যারা জামাতে ইসলামের সদস্য ছিল তারা রাজাকার বাহিনীতে স্বেছায় নাম লিখিয়েছিলো-বাংলাদেশের জন্মকে প্রতিরোধ করার জন্য। ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে তাদের তৎপরতা শুরু হলেও প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষ তৎপরতা শুরু করে জুন মাসের প্রথম থেকে। ফলে পাকবাহিনীর লোকবল আরো বেড়ে যায়। এদেশীয় স্থানীয় দোষররা জেলার প্রত্যান্ত অঞ্চল পর্যন্ত চিনত এবং জানত সেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ও খোঁজ খবর নেয়া সহজ হত। এতে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুকালের জন্য কোনঠাসা হয়ে পড়ে। মূল শহর ও থানা সদরে কিছু পাকসেনা বহু সংখ্যক রাজাকার নিয়ে অবস্থান করে এবং নির্দিষ্ট দুরত্বে রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করে যাতে খুব সহজে পাকবাহিনী যাতায়াত করতে পারে। এসময় পাকবাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচার বেড়ে যায়। হত্যা নারীধর্ষন অগ্নি সংযোগ, লুটপাঠ চলতে থাকে। এ অবস্থায় জুনের প্রথম থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধের নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এপ্রিলের শেষ এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রত্যেক জেলার মত নোয়াখালী জেলায় ও খবর পাঠানো হয় যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানোর। নোয়াখালীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষকরে ছাত্র ও যুব নেতা আ,ও,ম, সফিক উল্লাহ (লক্ষীপুর), মাহমুদুর রহমান বেলায়েত (চাটখিল), মোস্তাফিজুর রহমান (বেগমগঞ্জ), শাহজাহান কামাল (লক্ষীপুর), ওবায়দুল কাদের (কোম্পানীগঞ্জ), আবদুল ওয়াদুদ (ফেনী), কাজী নুরুন্নবী (ফেনী) ছাকায়েত উল্লাহ (রামগঞ্জ) ডি,পি,জয়নাল (ফেনী) প্রমুখ বেশ কিছু ছাত্র যুবককে সংগঠিত করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাতে যান। উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে ৪৫ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহন করে নোয়াখালী প্রবেশের জন্য প্রথম একটি দল গঠন করা হয়। এই দলের নেতা নিযুক্ত হন মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। এই যোদ্ধাদের নাম দেয়া হয়

২৩। সাক্ষাতকার রফিকুল হালদার চৌধুরী; প্রধাণ শিক্ষক বিজয়নগর হাই স্কুল। (মুক্তিযোদ্ধা)

২৪। সাক্ষাতকার ; মেজর এনামুল হক চৌধুরী (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র -৯ম খন্ড) পৃ-৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

বি,এল,এফ, (B.L.F= Bangladesh Liberation Force)। প্রকাশ্যে মুজিব বাহিনী। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বি,এল,এফ, বাহিনী প্রথম নোয়াখালীতে প্রবেশ করে। সিদ্ধান্ত হয় কনভেনশনাল আর্মিদের সঙ্গে এই বাহিনী একত্রে যুদ্ধ করবেনা। এদের নেতৃত্বে যুদ্ধ হবে পৃথক সম্পূর্ন গেরিলা পদ্ধতিতে। তাই বি,এল,এফ, বাহিনী নোয়াখালীকে তিনটি জোনে ভাগ করে - নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর। নোয়াখালীর দায়িত্বে মোশারফ হোসেন, ফেনীর দায়িত্বে কাজী নুরুন্নবী ও লক্ষ্মীপুরের দায়িত্বে আ,ও,ম সফিক উল্লাহ। মূল দায়িত্বে মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। এছাড়া থানাভিত্তিক কিছু দায়িত্ব বন্টন করা হয়। রায়পুর থানার দায়িত্বে ছিলেন নবী নেওয়াজ চৌধুরী বকুল, রামগঞ্জ থানার দায়িত্বে ছাকায়েত উল্লাহ, রামগতিতে মোশাররফ হোসেন, কোম্পানীগঞ্জে ওবায়দুল কাদের, ফেনী সদর থানার দায়িত্বে ভি,পি,জয়নাল , সেনবাগ থানার দায়িত্বে মোহাম্মদ ফারুক, বেগমগঞ্জ থানার দায়িত্বে ডাঃ আনিছুল হক, সুধারাম থানার দায়িত্বে শহীদ ওয়াহিদুর রহমান, হাতিয়া থানার দায়িত্বে অধ্যাপক অলি উল্লাহ প্রমুখ। বি,এল,এফ বাহিনী সুবেদার লুৎফর রহমানের কনভেনশনাল আর্মিদের সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নোয়াখালীতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।[২৬]

জুন মাসের প্রথম দিকে পুরো নোয়াখালী পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। ভারত সীমান্ত বরাবর কিছু এলাকা ছাড়া আর কোন অঞ্চল তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে ছিল না। যে কারণে পরবর্তী পর্যায়ের যুদ্ধ স্বাভাবিক নিরমেয় হবে দীর্ঘস্থায়ী এক গেরিলা যুদ্ধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের মত এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের আশংকা করছিল অনেকে। কিন্তু বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত- এই গভীর বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যায়ী হয়ে উঠেছিল বাংলার জনগন ও মুক্তিযোদ্ধরা। কিন্তু সেটা কি ভাবে তা কেউ বুঝতে পারছিল না। কারণ- ভারত আমাদেরকে সাহায্য করলেও চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ তখনও পশ্চিম পাকিস্তানিদের সরাসরি সাহায্য ও সমর্থন করছিল। ভারতের মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তখনও দ্বিধাগ্রস্থ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে। এপর্যায়ে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন শীঘ্র সম্ভরপর নয় বলে সকলের মনে ধারনা জন্মে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি জড়াতে পারে এমন লক্ষন তখন দেখা যাচ্ছিলনা। বলতে গেলে অক্টোবর পর্যন্ত ভারত দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। তবুও সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে ভারতকে। কারণ ততদিনে ভারতে পৌঁছে যাওয়া এক কোটি শরনার্থীকে এক বছর নূন্যতম খাদ্য সরবরাহ ও থাকার বন্দোবস্ত করতে বছরে ৫২৫ কোটি টাকা দরকার। অথচ বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল মাএ ১১২কোটি ৫০ লক্ষের মত। অবশিষ্ট ৪১২ কোটি ৫০লক্ষ টাকা ভারতকে বহন করতে হবে তার নিজস্ব ভান্ডার থেকে।[২৭] ভারতের পক্ষে এভার সাধ্যাতীত হয়ে উঠে। এছাড়া শরনার্থীরা ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় গ্রহন কারীর অনকে সমস্যার সৃষ্ট করে.। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা, হিংসা, একের প্রতি অপরের সহানুভূতি ও সৌজন্য বোধ না থাকায় এবং শৃংঙ্খলার অভাবে সুষ্ঠভাবে স্বাভাবিক কাজ কর্ম পরিচারনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন কারীদের মধ্যে ছাত্ররাই ছিল সম্ভবতঃ সবচাইতে বেশী

২৫। মোহাম্মদ হাননান - বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধের ইতিহাস, পৃ-৪২২।
২৬। স্বাক্ষাতকার ; মাহমুদুর রহমান বেলায়েত ও আ,ও,ম, সফিক উল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ভাবে সচেতন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ওরা ছিল গভীর ভাবে আত্মনিবেদিত। কিন্তু ছাত্ররা দলীয় রাজনীতিতে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং তাদের অভ্যান্তরীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু ধরণের জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে কৃষকরাই ছিল ভালো সম্পদ, স্বাধীনতার জন্য তারা ছিল আন্তরিক এবং নিবেদিত প্রান। নিজেদের আভ্যন্তরীন কোন্দলে এসময় সাময়িকভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ দূর্বল হয়ে পড়ে। উপরোক্ত আশঙ্কায় একটা স্বল্পস্থায়ী প্রচন্ড গতি সম্পন্ন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এসমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব-এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধিত হয়।

জুলাই মাসের ১১-১৫ পর্যন্ত কলকাতার ৮, থিয়েটার রোডে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সবসেক্টর কমান্ডার এবং প্রবাসী সরকারের উধ্বতন নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- কর্নেল এম, এ.জি. ওসমানী, লে. কর্নেল এম. এ. রব, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার, মেজর কিউ. এন. জামাল, মেজর সি. আর. দত্ত, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে. এম. সফি উল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর মীর শওকত আলী, উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এ. আর. চৌধুরী, মেজর রফিকুল ইসলাম ও মেজর এম. এ. জলিল। পাঁচ দিনের এই সম্মেলনে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়, বিভিন্ন ধরণের সমস্যা এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। লে. কর্নেল এম. এ. রব বাংলাদেশ বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত হন। কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ন যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হচ্ছে।

১। বিভিন্ন সেকটরের সীমা নির্ধারণ।
২। গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা যেমন ৫/১০ জনের গেরিলা দল, এ্যাকশন গ্রুপ, গোয়েন্দা সেল, গেরিলা ঘাটি ইত্যাদি গঠন।
৩। নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যদের পুনর্গঠন করতে হবে ব্যাটালিয়ন, ফোর্স এবং সেকট্র ট্রুপস হিসাবে।
৪। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণকৌশল গ্রহন, যেমন- ক) ক্রমাগত রেইড ও এ্যামবুশ চালিয়ে পাকিস্তানিদের হতাহতের সংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের চলাচলের ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্য বৈদ্যুতিক খুটি, সাব ষ্টেশন ইত্যাদি উড়িয়ে দিয়ে কলকারখানা সমুহ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার মাধমে সব কলকারখানা অচল রাখা।

খ) পাকিস্তানিদের রপ্তানী বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

গ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম আনানেয়ার ব্যবহারযোগ্য রেলওয়ে ওয়াগন ও বগি, নৌযান ও অন্যান্য যানবাহন পরিকল্পিত উপায়ে ধ্বংস করতে হবে।

ঘ) রণকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তব যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে।

২৭। মেজর রফিকুল ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময়ে ; পৃ-২১৫-২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) আমাদের রণকৌশলের কারণে পাকিস্তানিরা ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ার পর গেরিলারা তাদের বিচ্ছিন্ন দলগুলোর উপর মরণ আঘাত চালাবে একের পর এক।[২৮]

কনফারেন্সে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষন করে বাংলাদেশকে এগারটি সেকটরে বিভক্ত করা হয়ঃ-

১ নং সেকটরঃ

ক) এলাকাঃ চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা, নোয়াখালী জেলার ছাগল নাইয়া থানা নিয়ে এসেকটর গঠিত।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ পাঁচ।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ২১০০ সৈন্য। এর মধ্যে ১৫০০ ই,পি,আর, সদস্য ২০০ পুলিশ, ৩০০ সেনাবাহিনীর সদস্য এবং ১০০ নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য।

ঘ) গেরিলাঃ ২০,০০০ যোদ্ধা। এর মধ্যে ৮০০০ গেরিলা ছিল বিভিন্ন দলে সুসংগঠিত। গেরিলাদের ৩৫ শতাংশ এবং সেকটর ট্রুপস্ সকল সদস্যকে অস্ত্রও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়।

ঙ) সেকটর কমান্ডার-ঃ মেজর রফিকুল ইসলাম।

২নং সেকটরঃ

ক) এলাকাঃ ফরিদপুরের পূর্বাঞ্চল, ঢাকা শহর সহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ বাদে) এবং নোয়াখালী জেলা (ছাগলনাইয়া থানা বাদে)

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ ছয়।

গ) সেকটর ট্রুপস্ এবং কেফোর্স ঃ ৪০০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ৩০০০০ যোদ্ধা

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মেজর খালেদ মোশাররফ (৭১ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

৩ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার আখাউড়া- আশুগঞ্জ রেললাইনের উত্তরাংশ, সিলেট জেলার লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইনের দক্ষিণাংশ, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা নিয়ে এ সেকটর গঠন করা হয়।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ দশ।

গ) সেকটর ট্রুপস্ এবং এস, ফোর্স ঃ প্রায় ২৫০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ প্রায় ১০০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মেজর কে,এম, সফিউল্লাহ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) এবং মেজর নুরুজ্জামান (অক্টোবর-ডিসেম্বর) পর্যন্ত।

৪ নং সেকটর ঃ

২৮। মেজর রফিকুল ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময়ে (পৃ-২২৫-২২৯)।

Dhaka University Institutional Repository

ক) এলাকা ঃ সিলেট জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেকটর গঠন করা হয়। পশ্চিম সীমান্ত -তামাবিল-আজমীরগঞ্জ-লাখাই লাইন। দক্ষিণ সীমান্ত -লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইন।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ ছয়।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ২০০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ৮০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মেজর সি, আর, দত্ত।

৫ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ সিলেট জেলার তামাবিল- আজমীরগঞ্জ লাইনের পশ্চিম অংশ।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ ছয়।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ৮০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ৭০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মীর শওকত আলী।

৬ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ যমুনার পশ্চিমে রংপুর ও দিনাজপুর জেলা, দিনাজপুরের রানী শঙ্কইল- পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ লাইনের উত্তরাংশ ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ-পলামবাড়ী লাইনের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে এ সেকটর গঠিত হয়েছিল।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ পাঁচ।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ১২০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ৬০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ উইং কমান্ডার কে, এম, বাশার।

৭ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ সমগ্র রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর ও রংপুর জেলার অংশ বিশেষ।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ আট।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ২,০০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ১০,০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ প্রথমে মেজর নাজমুলহক (যুদ্ধের সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হন) এবং পরে মেজর কিউ এম, জামান।

৮ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার সমগ্র এলাকা, ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা। অর্থাৎ উত্তরে পদ্মা নদী, পদ্মা যমুনার মোহনা থেকে মাদারীপুর পর্যন্ত এর পূর্ব সীমান্ত এবং মাদারীপুর-সাতক্ষীরা কাল্পলিক লাইন ছিল দক্ষিণ সীমান্ত।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ সাত।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ২,০০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ৭,০০০ যোদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগষ্ট পর্যন্ত) এবং মেজর এম,এ, মঞ্জুর (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

৯ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ সমগ্র বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে) এবং ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ ও গোপালগঞ্জ।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ আট।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ ৭০০ সৈন্য।

ঘ) গেরিলা ঃ ১০,০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মেজর এম,এ জলিল।

১০ নং সেকটর ঃ

এই সেকটরের কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিলনা। এই সেকটরটি গঠিত হয়েছিল কেবল মাত্র নৌ কমান্ডোদের নিয়ে বিভিন্ন নদীবন্দর ও শত্রুপক্ষের নৌযান গুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এদের বিভিন্ন সেকটরে পাঠানো হতো। লক্ষ্যবস্তুর গুরুত্ব এবং পাকিস্তানিদের প্রস্তুতি বিশ্লেষন করে অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো এবং তার উপর নির্ভর করত অভিযানে অংশ গ্রহনকারী দল সমুহে যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে। যে সেকটরের এলাকায় কমান্ডো অভিযান চালান হতো, কমান্ডোরা সেই সেকটর কমান্ডোরের অধীনে কাজ করত। নৌ অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেকটর অর্থাৎ ১০ নং সেকটরের আওতায় চলে আসত।

১১ নং সেকটর ঃ

ক) এলাকা ঃ কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা। উত্তরে যমুনা নদীর তীরে বাহাদুরাবাদ ঘাট ও ফুলছড়ি ঘাট এই সেকটরের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

খ) সাবসেকটর সংখ্যা ঃ আট।

গ) সেকটর ট্রুপস্ ঃ এক ব্যাটালিয়ান ।

ঘ) গেরিলা ঃ ২০,০০০ যোদ্ধা।

ঙ) সেকটর কমান্ডার ঃ মেজর এ, তাহের।[২৯]

সেকটর সমূহের সীমানা নির্ধারণ ও কমান্ডার নিয়োগের পর সেনা বাহিনী, ই,পি,আর, ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে একটি নতুন নিয়মিত যোদ্ধা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বেসামরিক জনগণের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। "আক্রমন কর, সরে পড়"- এই কৌশল অবলম্বন করে

২৯। মেজর রফিকুল ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময় (পৃ-২১৮-২৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

গেরিলারা সারাদেশ ব্যাপী পাকিস্তানিদের উপর আক্রমন চালাতে থাকবে। প্রতিদিন এমনি অসংখ্য ছোট বড় আক্রমনে পাকিস্তানিদের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলবে, তাদের লোক ক্ষয় হতেই থাকবে অব্যাহতভাবে, এবং ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকবে তাদের মনোবল।

ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের কৌশলে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে ভারতের তেজপুরে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। এদের প্রথম দলটি নোয়াখালীতে প্রবেশ করে ১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জন এবং কমান্ডার ছিলেন সরওয়ার-ই-দীন (বর্তমানে এডভোকেট, নোয়াখালী জজ কোর্ট)। এদলটি নোয়াখালীতে এসে ঘাটি স্থাপন করে রামগঞ্জ থানার দশ ঘরিয়া ইউনিয়নে। এরপর আরো অনেক দল এসে যোগদেয় লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও ফেনীতে। মোট ৪৫০ জন সদস্য নোয়াখালী জেলায় আসে। এদের বলাহত বিশেষ গেরিলা বাহিনী। কোড নাম ডেল্টা সেকটর। ভারতে হেড অফিস ছিল ক্রেপস্ হোস্টেল, আগরতলা। ন্যাপ (ভাসানী) ও মোজাফফর ন্যাপ একটা কমিটি করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে এদের ট্রেনিং দেয়া হত। ভারত সরকার তখন আওয়ামী লীগ সরকারকে চাপ দিয়ে ন্যাপ সমর্থিত মুক্তি বাহিনীকে দেশের অভ্যান্তরে পাঠায় সেপ্টেম্বর মাসে।[৩০] এরা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে লজিং থেকে গ্রামের লোককে প্রশিক্ষণ দিত কিভাবে যুদ্ধ করবে এবং কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে। এমনি করে গ্রামের প্রত্যেকটি নারী পুরুষকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো যাতে করে ঐ গ্রামে হানাদার বাহিনী প্রবেশ করলে আর নির্বিঘ্নে বের হতে না পারে। দিনের বেলায় তারা ঘোরাফেরা করত বা কৃষি কাজ করত এবং রাতের বেলায় যুদ্ধ করত। এরাও বিভিন্ন সেকটর কমান্ডের অধীনে থেকেই যুদ্ধ করত।

নোয়াখালী জেলা ছিল দুটি সেকটরের অধীনে। ১ নং সেকটরের অধীনে ছিল ফেনীর ছাগলনাইয়া থানা। বাকী পুরো নোয়াখালী জেলা ছিল ২ নং সেকটরের অধীনে। ২ নং সেকটরের সেকটর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। পরে তিনি 'কে' ফোর্সের দায়িত্ব পেলে সেকটর কমান্ডার হন মেজর হায়দার। এই সেকটরের অধীনে ছিল প্রায় ৩০,০০০ এর মতো গেরিলা এবং নিয়মিত সৈন্য ছিল প্রায় ৪,০০০। নিয়মিত বাহিনীর তিনটি রেগুলার বেঙ্গল ব্যাটালিয়ান ছিল, যা পরবর্তী কালে কে ফোর্স (খালেদ ফোর্স) নামে পরিচিতি পায়। নবম বেঙ্গল, দশম বেঙ্গল এবং চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২ নং সেকটরকে আবার ছয়টি সাব সেকটরে বিভক্ত করা হয়। ক) গঙ্গাসাগর আখাউড়া এবং কসবা সাবসেকটর,কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন। এই সাবসেকটর কসবা-আখাউড়া, সাইদাবাদ মুরাদনগর, নবীনগর এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া পর্যন্ত অপারেশন চালাত। খ) মন্দভাগ সাবসেকটরের কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গাফফার। এদলটি মন্দভাগ রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে কুটি পর্যন্ত অপারেশন চালাত। গ) শালদানদী, সাবসেকটরের কমান্ডার ছিলেন মেজর সালেক চৌধুরী। এদলটি শালদা নদী, নয়নপুর

২৮। স্বাক্ষাতকার ; এডভোকেট সরওয়ার-ই-দীন (নোয়াখালী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আবহায়ক, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাং ১৮-১২-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এবং বুড়িচং এলাকা পর্যন্ত অপারেশন চালাত। ঘ) মতিনগর সাবসেকটর, কমান্ডার ছিলেন লে. দিদারুল আলম। এদলটি গোমতির উত্তর বাধ থেকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত অপারেশন চালাত। ঙ) নির্ভরপুর সাবসেকটর এর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর ও লে, মাহবুব। এ সাবসেকটরটি কুমিল্লা থেকে লাকসাম ও চাঁদপুর পর্যন্ত অপারেশান চালাত। চ) রাজনগর সাবসেকটর এর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ ও লে, ইমামুজ্জামান। এদলটি বেলুনিয়াসহ লাকসামের দক্ষিণ এলাকা এবং সম্পূর্ন নোয়াখালী জেলায় অপারেশন চালাত। সেকটর গঠনের পর মুক্তিবাহিনীর রণনীতি, রণকৌশল গ্রহন এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের পরিমান বাড়তে থাকে।[৩১]

এদিকে পাকবাহিনী ও তাদের আক্রমন শক্তিশালী করার জন্য তাদের বাহিনী পুনর্গঠন করে। ঢাকা হেডকোর্য়াটার সহ ১৪ ডিভিশন ছিল তখন পূর্বাঞ্চলে একমাত্র ডিভিশন। এখন এই ডিভিশনটিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, আখাউড়া এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া এলাকায় যুদ্ধের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ১৪ ডিভিশনকে এখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বিগ্রেড নিয়ে পুনর্গঠিত করা হয়। এই ডিভিশনের ৫৭ বিগ্রেড ছিল ঢাকায়। এখন ৫৭ বিগ্রেডকে পশ্চিম সেকটরে ঝিনাইদহে পাঠিয়ে সেখানে সদ্য আসা ৯ ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১০৭ বিগ্রেড প্রথম থেকেই যশোহরে ছিল। বিগ্রেডটিকে সেখানে রেখে ৯ ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ২৩ বিগ্রেডও রংপুরেই থেকে গেল। কিন্তু এটি চলে আসল উত্তর পশ্চিম সেকটরে সদ্য আসা ১৬ ডিভিশনের অধীনে। সিলেট এলাকায় যুদ্ধকরার জন্য ১৪ ডিভিশকে দেয়া হয় সদ্য আগত ২০২ বিগ্রেড, মৌলভীবাজারে যুদ্ধ করার জন্য ৩১৩ বিগ্রেড এবং আখাউড়ায় যুদ্ধ করার জন্য ২৭ বিগ্রেড। ১৪ ডিভিশনের হেড কোর্য়াটার ব্রাহ্মানবাড়িয়ায় স্থাপিত

কুমিল্লা-লাকসাম-ফেনী ফ্রন্টের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত নবগঠিত ৩৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের (এডহক) হেডকোর্য়াটার ছিল চাঁদপুরে। এই ডিভিশনের ১১৭ বিগ্রেড ছিল কুমিল্লায়। যুদ্ধ শুরুর আগে কুমিল্লায় অবস্থানরত ১৪ ডিভিশনের ৫৩ বিগ্রেড এখন চলে আসে ৩৯ ডিভিশনের অধীনে এবং এটিকে লাকসাম-ফেনী ফ্রন্টের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ৯৭ স্বতন্ত্র ইনফ্যান্ট্রি বিগ্রেডকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩২]

এভাবে পূর্বাঞ্চলে যেখানে প্রথমদিকে ছিল একটি মাত্র পাকিস্তানি ডিভিশন, সেখানে এখন ঐ সংখ্যা বেড়ে হয় মোট পাঁচটি ডিভিশন। তবে যেহেতু ৯,৩৬ ও ৩৯ ডিভিশনের তিনটি করে বিগ্রেড ছিল না, সেজন্য এই পাঁচটি ডিভিশনে সম্মিলিত সমর শক্তি ছিল চারটি পরিপূর্ন ইনফ্যান্টি ডিভিশনের শক্তির সমতুল্য।

পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তানিদের এই অস্বাভাবিক সমর শক্তি বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর পুনর্গঠন ও পুর্নবিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই পুনর্গঠনের পাশাপাশি প্রতি সেকটরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা

৩১। আবু মোহামএদলওয়ার হোসেন- মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড)
৩২। মেজর রফিকুর ইসলাম ; লক্ষ প্রানের বিনিময়ে , পৃ- ২৪১-২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

চালিয়ে যাওয়া হয় অব্যাহত ভাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের উদ্দ্যমকে অদমিত এবং পাকিস্তানিদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ অব্যাহত রাখার জন্য অসংখ্য রেইড, এ্যামবুশ, ও আক্রমন চালানো হয়েছে। জুলাই থেকে গেরিলা এবং সম্মুখ সমরে সমানভাবে আক্রমন পরিচালনা করতে থাকে হানাদর বাহিনীর উপর। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত নোয়াখালীতেও চলে পরিকল্পিত আক্রমন। নোয়াখালীতে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আক্রমনের বিবরণ নিম্নে বর্নিত হলো ঃ-

১। <u>বেলুনিয়া যুদ্ধ</u> ঃ- নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধ গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ন যুদ্ধ হচেছ ফেনীর বেলুনিয়া যুদ্ধ। বেলুনিয়া ১৭ মাইল লম্বা এবং ১৬ মাইল চওড়া বাঙ্ক। ভারত সীমান্তবর্তী বেলুনিয়া অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারটি মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনী উভয়ের জন্য রণকৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ন ছিল। বেলুনিয়া ফেনী শহর থেকে ১২ মাইল দুরে অবস্থিত। পাকবাহিনী মে মাস থেকে এই স্থানটি দখলের চেষ্টা চালায়। মুক্তিসেনারা ১ নং ও ২ নং সেকটর কমান্ডারদের নির্দেশে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে বান্দুয়াতে (ফেনী থেকে ২ মাইল দুরে) এবং লে, ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে অপরদিকে প্রতিরোধ ব্যুহ গড়ে তোলে। মুন্সির হাটে (বান্দুয়া থেকে ৪ মাইল দুরে) মুক্তিবাহিনীর মজবুত আরেকটি ঘাটি ছিল। মুন্সির হাটের মুহুরী নদীর পশ্চিম পাড় থেকে শুরু করে পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত এই প্রতিরক্ষা ব্যুহ ছিল ৪ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বেলুনিয়া থেকে মুন্সির হাট এই ১২ মাইল এলাকা ছিল পুরোপুরি মুক্ত এলাকা। পাকবাহিনী সর্ব প্রথম বেলুনিয়া এলাকায় প্রবেশ করে৭ জুন। ১০ জুন থেকে তারা ব্যাপক আক্রমন শুরু করে। তারা ধ্বংস প্রাপ্ত বান্দুয়া সেতুর উপর বাশের সাঁকো তৈরী করে যখন পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। মুক্তিবাহিনী সেই মুহুর্তে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে সাঁকোর উপরের প্রায় ৫০ জন পাকসেনা গুলির আঘাতে পানিতে পড়ে যায়। কিছুক্ষন পর পাকবাহিনী তাদের গোলন্দাজদের সহায়তায় আবার আক্রমন চালায়। এবারও পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে মুক্তিবাহিনী। কিন্তু পরবর্তী কালে পাকবাহিনীর আক্রমন ব্যাপক হবার কারনে মুক্তিবাহিনী পিছুহটে মুন্সির হাটে এসে সমবেত হয়। এবার পাকবাহিনী সাফল্য লাভ করে এবং সামনের দিকে সিলোনিয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তারা মুক্তিবাহিনীর মূলঘাটির উপর বৃষ্টির মত গুলি বর্ষন করে চলে। এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক পাকসেনা নদীর তীর ধরে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের কাছাকাছি চলে আসে। আর কিছুসংখ্যাক পাকসেনা নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এমতাবস্থায় মুক্তিবাহিনীর মর্টার ও মেশিনগানের আঘাতে প্রচুর পাকসেনা হতাহত হয়। এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর পুতেরাখা মাইন ফিল্ডের অভ্যান্তরে পাকবাহিনী এসে পড়ে। তাদের পায়ের চাপে একের পর এক মাইন বিস্ফোরিত হতে থাকে। পাকসেনাদের দেহগুলো একের পর এক মাইনের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পাকবাহিনীর একটি দল মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি বাঙ্কারের কাছে উপস্থিত হলে মুক্তিবাহিনীর গ্রেনেডের আঘাতে পাকবাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়। এমনি এক বিপর্যয়কর অবস্থায় মধ্যে পাকবাহিনী পশ্চাদপসারণ করে পালাতে থাকে। মুক্তিবাহিনী পলায়নরত শত্রুদের উপর ব্যাপক মর্টার ও মেশিনগানের আঘাত হেনে শত্রু সেনাদের অধিকাংশ হত্যা করতে সক্ষম হয়। অবশিষ্টরা আর্টিলারি গোলার কভারে আনন্দপুর পাক ঘাটিতে পালিয়ে যায়। এই সংঘর্ষের পর পাকসেনাদের ৩০০ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এদের অনেকের কবর এখনো ফেনীতে আছে[৩৩]।

৩৩। <u>স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র</u> -১০ খন্ড (স্বাক্ষাতকার-মেজর খালেদ মোশাররফ)।

Dhaka University Institutional Repository

পাকবাহিনী বেলুনিয়ায় নিজেদের এই চরম বিপর্যয়ের ফলে প্রতিশোধ নিতে বড় রকমের অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান, স্বয়ং ফেণীতে আসেন বেলুনিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। ২নং সেকটর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশারাফ এধরনের আশঙ্কা থেকে মুক্তিবাহিনীকেও প্রস্তুত করতে থাকেন। এপর্যায়ে মন্দভাগ সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন গাফফার চতুর্থ বেঙলের 'সি' কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সাহায্যের জন্য বেলুনিয়ায় সমবেত হন। ১৭জুলাই রাত আটটায় পাকবাহিনী মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর ব্যাপক আক্রমন চালায়। এসময় চারদিকে অন্ধকার এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানিরা তিনটি হেলিকপ্টার যোগে ছত্রীবাহিনী নামিয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, লে, ইমামুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন গাফফারের দল পাকবাহিনীর মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পাকিস্তানিদের আক্রমনের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকলে মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৮ জুলাই পাকবাহিনীর হাতে বেলুনিয়ার পতন ঘটে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার বেলুনিয়াতে সংঘর্ষ হয়। আক্রমন পাল্টা আক্রমন চলতেই থাকে। পুনঃপুনঃ আঘাতের ফলে পাকসেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ফেনীর দক্ষিণে তাদের কামানের অবস্থান গড়ে তোলে।

১লা অক্টোবর রাত ১১ টায় মুক্তিবাহিনীর একটি দল পাকসেনাদের মুন্সির হাট অবস্থানের উপর আক্রমন চালায়। মুন্সির হাট পাকসেনাদের জন্য বেলুনিয়া সেকটরে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন ঘাটি ছিল। কারণ এই ঘাটির মাধ্যমে বেলুনিয়ার পশ্চিম দিকে তাদের অবস্থান গুলোতে সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। মুক্তিবাহিনীর আক্রমনের মুখে পাকসেনারা মুন্সির হাট ঘাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ২ অক্টোবর পরশুরামের অবস্থানের উপর আক্রমন চালায়। এতে ২৫/৩০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এসময় পাকসেনারা মজুমদার হাট এবং চিতলিয়াতে তাদের অবস্থান গুলোতে আরো সৈন্য সমাবেশ করে। মুক্তিবাহিনী পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে বেলুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থানে পাকবাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমন অব্যাহত রাখে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে।

বিখ্যাত বেলুনিয়া যুদ্ধ পুনরায় সংঘটিত হয় নভেম্বর মাসে। ১৮ জুলাই পাকবাহিনীর হাতে বেলুনিয়ার পতনের পর থেকে বেশীর ভাগ অংশ তাদের দখলে ছিল। পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, মুন্সির হাট, বেলুনিয়া ও ফেনীর অংশ বিশেষ ছিল পাকবাহিনীর শক্তঘাটি। ইতিমধ্যে ২/৩ নভেম্বর লাতুমুরায় মেজর আইন উদ্দিন তার নবম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে পাকসেনাদের উপর তীব্র আক্রমন রচনা করে বসেন। পাকবাহিনী আপ্রান চেষ্টা করেও লাতুমুরায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। তবে এই সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীর চরম ক্ষয়ক্ষতি হয়। এখানে তিনজন অফিসার ও চল্লিশজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং ৬০ জন আহত হয়। সেকটর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে তাই বেলুনিয়া থেকে ফেনী পর্যন্ত সব শত্রুঘাটি ধ্বংস করার দায়িত্ব দেন। এ অভিযানে যোগ দেয়ার জন্য নির্দেশদেন দ্বিতীয় বেঙ্গলের আরো একটি কোম্পানীকে, যার নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোর্শেদ। মিলিত বাহিনী একসঙ্গে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ঘাটি চিতলিয়া, পরশুরাম, বেলুনিয়ায় আক্রমন চালায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে পরশুরাম ও চিতলিয়ার মাঝে পাকসেনাদের সরবরাহ লাইনের সড়কটি বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি নেয়া হয়। ৬ নভেম্বর ১০ম বেঙ্গলের একটি

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পনী গোলন্দাজ বাহিনী ও মর্টারের সহায়তায় চিতলিয়ার উত্তরাংশে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর প্রচন্ড আক্রমন চালায়। প্রায় চার ঘন্টা যুদ্ধের পর ১০ম বেঙ্গলের কোম্পানীটি চিতলিয়ার উত্তরাংশে দখল করে নিয়ে সালিয়া এবং ধানীকুন্ডার মাঝখানের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পরশুরাম ও ফেনীর মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হয়। এর ফলে বেলুনিয়ার উত্তরাংশে পাকসৈন্যরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। একজন অফিসার সহ ১২ জন পাকসেনা যুদ্ধে নিহত এবং পাঁচ জন বন্দী হয়। এই সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীর মর্টার প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার ইয়ার আহমদ শহীদ হন এবং আরো পাঁচজন আহত হয়। বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়। ৮ নভেম্বর বেলুনিয়া ও পরশুরামের পাকবাহিনীর অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী পুনরায় আক্রমন চালায়। মুক্তিবাহিনী ছাড়াও এই অভিযানে মিত্রবাহিনী অংশ গ্রহন করে এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ক্যাপ্টন জাফর ইমামের নেতৃত্বে এই বাহিনী বেলুনিয়া থেকে ফেনী রেললাইনের পার্শ্বে বেশ কিছু বাঙ্কার গড়ে তোলে। পাকবাহিনীর সঙ্গে এই পথে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী বিমান থেকে গুলি বর্ষনের মাধ্যমে আক্রমন রচনা করে। মুক্তিবাহিনী এখানে ভারী মেশিনগানের সাহায্যে বিমান আক্রমনের পাল্টা জবাব দেয়। শত্রুদের একটি জঙ্গী বিমান মেশিনগানের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে শালিয়ার নিকট ভূপাতিত হয়। বাকী দুটো বিমান পালিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর হামলায় পাকসেনারা বেশীক্ষন টিকে থাকতে পারেনি। শত্রু বাহিনীর বেশীর ভাগ সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়। ৯ নভেম্বর তারিখে মুক্তিবাহিনীর দখলে পরশুরাম ও বেলুনিয়া চলে আসে। শত্রু সেনাদের বাঙ্কারে ৪৯ জন আহত পাকসেনাকে পাওয়া যায়। এই বিপর্যয়ের ফলে শত্রু পক্ষের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। চিতলিয়া ঘাটির পাকসেনারা পালিয়ে মুন্সির হাটে চলে আসে। তখনো শত্রু পক্ষের দখলে ফেনীর বহু এলাকা ছিল। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দলটি আরো অগ্রসর হয়ে নীলক্ষেতে ঘাটি স্থাপন করে। এ সংবাদ পেয়ে পাকবাহিনী পিছু হটে চিতলিয়া থেকে ফুলগাজির শক্ত ঘাটিতে এসে মিলিত হয়। ফুলগাজীর ঘাটিতে মুক্তিবাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকবাহিনী বান্দুয়া রেলষ্টেশনের কাছে ঘাটি স্থাপন করে। অন্য দিকে মুক্তিবাহিনী কালিরহাট ও পাঠান নগরে শত্রুদের মুখোমুখি ঘাটি স্থাপন করে। দক্ষিণে সোনাগাজীতেও মুক্তিবাহিনীর একটি দল ছিল। এভাবে তিনদিক দিয়ে পাকসেনারা চাপের সম্মুখীন হয়। তবে সোনাগাজীতে গেরিলারা ছিল ওঁৎপেতে। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাধ্য হয়ে পাকবাহিনী যখন এপথ দিয়ে পালাবে তখন আকস্মিক আক্রমনে তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে। বাস্তবে পাকবাহিনী এপথে না গিয়ে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ হয়ে লাকসামে পালিয়ে যায়। ফলে ফেনীর একটা বড় অংশ বিশেষ করে বেলুনিয়া মুক্ত হয়।

এই সময় পাকবাহিনী তাদের মূলঘাটি ফেনীতে পিছিয়ে নেয়। ফলে 'কে' ফোর্স হেডকোয়াটার থেকে পূনঃ আক্রমনের নির্দেশ আসে। এই নির্দেশ অনুযায়ী 'কে' ফোর্স হেডকোয়াটার কোরবান অবস্থান থেকে দক্ষিণে বেলুনিয়াতে স্থানান্তারিত হয় এবং বেলুনিয়া সেকটরে ৪র্থ বেঙ্গলকেও এই যুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী 'কে' ফোর্সকে অতিসত্বর ফেনী মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪র্থ বেঙ্গল ফেনীর দিকে অগ্রসর হয়। ১০ম বেঙ্গল লক্ষীপুর হয়ে ছাগলনাইয়ার দিকে অগ্রসর হয়। 'কে' ফোর্সের এই দুই ব্যাটালিয়ানের প্রচন্ড চাপে পাকসেনারা টিকতে না পেরে তাদের অগ্রবর্তী ঘাটি পাঠাননগর ও দক্ষিণ মুন্সির হাট

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে পিছন দিকে পালিয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে 'কে' ফোর্স ছাগলনাইয়া ও ফেনীর উপকণ্ঠে পাকসেনাদের উত্তর পশ্চিম দিকে সম্পূর্ন ভাবে ঘিরে ফেলে এবং পাকসেনাদের অবস্থান গুলোর উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচন্ড আক্রমন চালায়, উপায়ান্তর না দেখে ৬ ডিসেম্বর পাকসেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর সেতু হয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর দুপুরে 'কে' ফোর্স ফেনীকে শত্রুমুক্ত করে।[৩৪]

বেলুনিয়ার এই বিখ্যাত যুদ্ধের বিবরণ, এর রণকৌশলগতদিক এবং বিজয়ের নেপথ্যে মুক্তিবাহিনীর আত্মদানের ইতিহাস বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের স্টাফ কলেজে পড়ানো হয়। ১৯৭৩ সালে এই রণাঙ্গন পরিদর্শনে আসে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ২১ জন বিগ্রেডিয়ার ও মেজর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার।[৩৫]

২। শালদা নদীর যুদ্ধ ঃ- নোয়াখালী জেলার ফেনীতে অপর গুরুত্ব পূর্ন যুদ্ধ ছিল শালদা নদীর যুদ্ধ। শালদা নদী ও শালদা রেলস্টেশন ছিল পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের জন্য রণকৌশলগত ভাবে গুরুত্ব পূর্ন এলাকা। পাকবাহিনী এপথে রসদ সরবরাহ করত। তাই এস্থানটির দখল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ কালে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার আক্রমন-পাল্টা আক্রমন চলে। ১৮ জুন বেলা আড়াইটায় শালদা রেলস্টেশনের কাছে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সুবেদার ওয়াহাব এই যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখান। এখানে মুক্তিবাহিনীর গোলার আঘাতে পাকবাহিনীর অস্ত্র ভর্তি ট্রলিতে আগুন ধরে যায়। এখান থেকে মুক্তিবাহিনী বেশ কিছু গোলাবারুদ সংগ্রহ এবং খাদ্য সম্ভার ও হস্তগত করে। ক্যাপ্টেন গাফফারের অধীনে মন্দভাগ সাব-সেকটরের যোদ্ধারা শত্রুসেনাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ১৯ জুলাই শত্রুসেনাদের একটি কোম্পানী শালদা নদীতে নৌকা যোগে অগ্রসর হয়। শালদা নদীতে সুবেদার ওয়াহাবের নেতৃত্বে শত্রুসেনাদের উপর অতর্কিতে আক্রমন চালায়। এই আক্রমনে অন্তত:পক্ষে ৬০/৭০ জন শত্রুসেনা হতাহত এবং অনেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রান হারায়। এই আক্রমনে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল কাইয়ুম, ৫৩তম গোলন্দাজ বাহিনীর কুখ্যাত অফিসার ক্যাপ্টেন বোখারীসহ ৩/৪ জন অফিসার এবং ৮/১০ জন জুনিয়র অফিসারকে নিহত করতে সক্ষম হয়।

শত্রুসেনারা শালদা নদীতে তাদের এই বিপর্যয়ের পর নিজেদের বাহিনীকে পিছনে হটিয়ে কুটিতে নিয়ে যায়। ফলে মন্দভাগ ও শালদানদীতে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ কুটিতে পাকবাহিনী ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন গাফফার তার সাব-সেকটর মন্দভাগের অবস্থান আরো এগিয়ে নিয়ে মন্দভাগ বাজারে নিয়ে তাদের অবস্থান আরো সুসংহত করেন। শত্রুসেনারা বেলুচ রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানী সামনে রেখে অগ্রসর হয়। ক্যাপ্টেন গাফফারের দলটি অতর্কিতে আক্রমন চালালে শত্রুসেনাদের দুটো কোম্পানী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ঘন্টা খানেক পর পাকসেনারা শালদা নদীর দক্ষিণ তীরের

৩৪। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র -১০ম খন্ড (স্বাক্ষাতকার - মেজর খালেদ মোশাররফ)
৩৫। আবু মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন - মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, পৃ-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। সুবেদার ওয়াহাব এপথে এ্যামবুশ পজিশনে ছিলেন। ফলে তাদের হাতে অগ্রসরমান দলটির বিপর্যয় ঘটে। তার পরও ক্যাপ্টেন গাফফার ও সুবেদার ওয়াহাবের দলটি বিপর্যস্ত পশ্চাদপসরনরত পাকসেনাদের পিছু ধাওয়া করেন। সামনে ছিল ধানক্ষেত, পানি ভর্তি ডোবা। শত্রুসেনাদের অনেকে সেই পানিতে ডুবে এবং গুলির আঘাতে নিহত হয়। যুদ্ধশেষে এখানে পাকবাহিনীর ১২ জনের লাশ পাওয়া যায়। এযুদ্ধের ফলে ৮টি মেশিনগান, ১৮ টি এল. এম. জি. ১৫০টি রাইফেল, ১টি রকেট লাঞ্চার, ২টি মর্টার ও প্রচুর গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। নিহত পাকসেনাদের মধ্যে ছিল একজন ক্যাপ্টেন, একজন লেফটেন্যান্ট ও কয়েক জন জুনিয়র কমিশন অফিসার।

পাকবাহিনীর এই বিপর্যয়ের পর তারা নদীপথে লঞ্চ, স্টিমার ও স্পীডবোটের সাহায্য নিতে শুরু করে। তারা শালদা নদী ও মন্দভাগে ক্যাপ্টেন গাফফার ও মেজর সালেকের বাহিনীকে বারবার আঘাত করতে থাকে। পাকবাহিনী ২৬ জুলাই শালদা নদীর অবস্থান থেকে মথরো সেতুর কাছে এসে সমবেত হয়। তারা সেতুর চারদিকে বাঙ্কার তৈরীর প্রস্তুতি নেয়। মেজর সালেকের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর দলটি আগরতলার কাছে অবস্থান নেয় এবং পাকসেনাদের উপর মর্টার নিক্ষেপ করে। পাকবাহিনী যুদ্ধে টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে ৪ জন পাকসেনা নিহত হয়। শালদা নদীতে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকসেনাদের যুদ্ধ সারা জুলাই ধরে চলে। ক্যাপ্টেন গাফফারের নেতৃত্বে শালদা নদীর শত্রু অবস্থানের উত্তর দিকে চতুর্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানী শত্রুদের ঘিরে ফেলে। দক্ষিণ দিকে আগরতলা ও কাটামোড়ায় মেজর সালেক চতুর্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানী দিয়ে পাকসেনাদের শালদানদী অবস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। পাকসেনাদের পিছন থেকে সরবরাহের রাস্তা একমাত্র নদী ছাড়া প্রায় সবই বন্ধ হয়ে যায়। নদী পথেই গোপনে মাঝেমধ্যে পাকসেনাদের অবস্থানে রসদপত্র সরবরাহ করা হতো। এই সরবারাহ পথে পাকসেনাদের এ্যামবুশ করার জন্য মেজর সালেক একটি প্লাটুন সতর্কতার সঙ্গে শত্রুসেনাদের অবস্থানের পিছনে পাঠিয়ে দেন। এই প্লাটুনটি ১লা আগষ্ট রাতে শালদানদীর পশ্চিমে নদীর উপর এ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। রাত ১টায় ১৫০ জন সৈন্য ও অন্যান্য সরবরাহসহ পাকসেনারা তাদের শালদা নদীর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সৈন্য ও রসদসহ শত্রুদের নৌকা গুলো যখন এ্যামবুশ অবস্থানের আওতায় চলে আসে, তখন মেজর সালেকের প্লাটুনটি মেশিনগান ও হালকা মেশিন গানের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। আধ ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে পাকসেনাদের ৬০/৭০ জন হতাহত হয় এবং ৪/৫ টি নৌকা ডুবে যায়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ৪ জন যোদ্ধা শহীদ হন।

এরপর মেজর সালেক ১০ আগষ্ট একটি প্লাটুন নিয়ে শালদা নদীর পশ্চিমে কুমিল্লা সি এন্ড বি রোডের কাছে শিদলাই গ্রামে ঘাটি স্থাপন করেন। মুক্তিবাহিনীর অন্য দলগুলো এরইমধ্যে শক্তিশালী ঘাটি স্থাপন করে ফেলে। শালদা নদী, মন্দভাগ এবং এর চার দিকে মুক্তিবাহিনী প্রায়ই আক্রমন রচনা করত। ফলে পাকবাহিনীর হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর আক্রমনে পাকবাহিনীর অন্তত ৬০ জন শালদা নদীর যুদ্ধে নিহত হয়। বাধ্য হয়ে শত্রুরা শালদা স্টেশন ছেড়ে নয়ানপুর গ্রাম ও শালদানদী গোডাউনে তাদের ঘাটি গড়ে তোলে। মন্দভাগেও শত্রু অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনীর গোলার আক্রমনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382727

পাকসেনাদের প্রায় ১৫০ জন হতাহত হয়। পাকসেনারা অবস্থান ত্যাগ করে ব্রাহ্মন পাড়ায় অবস্থান নেয়। পাকবাহিনী ১১ আগষ্ট সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মেজর সালেকের বাহিনী নাগাইশ গ্রামে ১৫ আগষ্ট তাদের উপর আক্রমন চালায়। এযুদ্ধে ১১ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনাদের তিনটি নৌকা সেদিনই শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মন পাড়ায় যাওয়ার সময় শালদা গ্রামের কাছে আক্রান্ত হয় এবং ১০ জন পাকসেনা নিহত হয়।

১৬ আগষ্ট পাকসেনাদের দুটি শক্তিশালী প্লাটুন নাগাইশ গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। সুবেদার নজরুল ও সুবেদার মুনিরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী নাগাইশ পৌঁছার আগেই তাদের উপর আকস্মিক আক্রমন চালালে ২৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। এই অবস্থায় পাকসেনারা পিছু হটতে থাকে। ১৭ আগষ্ট ব্রাহ্মন পাড়ার নদী পথ দেখানোর জন্য পাকসেনারা একটি বিশাল বাহিনীসহ নদী পথে অগ্রসর হয়। মুক্তিবাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে নৌকা আরোহীসহ ১৮ জন পাকসেনা নিহত হয়। ১৯ আগষ্ট দুপুরে পাকসেনারা তিনটি নৌকাসহ শালদা নদী থেকে ব্রাহ্মন পাড়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মুক্তিবাহিনী নাগাইশের কাছে আক্রমন চালায়। তীব্র আক্রমনে পাকবাহিনীর দুটো নৌকা ডুবে যায় এবং ২০ জন সৈন্য প্রান হারায়। বাকী সৈন্যরা তীরে নেমে মুক্তিবাহিনীকে আক্রমন করে বসে। প্রায় চার ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধে পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। ঐদিনই মুক্তিবাহিনীর কামানের আঘাতে শালদা নদীর নিকটবর্তী গুদামে অবস্থিত পাকবাহিনীর একটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ৮ জন সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। ২৩ আগষ্ট শালদা নদী এলাকায় আবার যুদ্ধ হয়। সেনের বাজারে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধে পাকসৈন্যদের ৭ জন নিহত হয়।

২৬ আগষ্ট ব্রাহ্মন পাড়ার কাছে পাকসেনাদের ৬টি নৌকার উপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমনে বেশ কয়েকজন পাকসেনা নিহত হয়। কয়েকটি নৌকা নিয়ে পাকবাহিনী পালিয়ে নাগাইশ গ্রামের দিকে গেলে সুবেদার নজরুলের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী নৌকায় আক্রমন করে। এতে ১৮ জন পাকসেনা ডুবে মারা যায়। এই যুদ্ধে ছাত্র গেরিলা আবদুল মতিন শহীদ হন। ২৭ আগষ্ট পাকসেনারা শশীদল গ্রামের কাছে সৈন্য সমাবেশ করে সেনের বাজারের দিকে অগ্রসর হয়ে। পাকসেনাদের এই দলটি মর্টারের গোলার সাহায্যে সেনের বাজারের উপর আক্রমন চালায়। সমস্ত দিনব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে শত্রুবাহিনীর গুলি বিনিময় চলে। শেষে পাকবাহিনী সন্ধ্যায় দিকে পিছু হটতে থাকে। এ যুদ্ধে ১৫ জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৮ আগষ্ট পাকবাহিনী ব্রাহ্মন পাড়া থেকে ৫টি নৌকা চেপে শালদা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তিবাহিনীর বাধার মুখে তাদের ৫টি নৌকা ডুবে যায়। এখানে একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৩০ জন পাকসেনা হতাহত হয়। এরফলে পাকসেনাদের জন্য নদীপথে অগ্রবর্তী ঘাটি গুলোতে সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া একই দিনে পরশুরাম থানার কাছে পাকবাহিনীর একটি টহলদার গ্রুপের উপর আক্রমন চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর ৭জন পাকসেনাকে হত্যা করে। দুঘন্টা সংঘর্ষের পর পাকসেনারা মর্টারের সাহায্যে আক্রমন চালিয়ে গেরিলাদের হাত থেকে প্রান বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আরেকটি মুক্তিসেনাদল ফেনী বেলুনিয়া সড়কের উপর হাসানপুর সেতু ধ্বংস করে দেয়। শুধু তাই নয় শালদা নদীর কাছে একটি

Dhaka University Institutional Repository

পাকবাহিনীর টহলদার দলের দুজন সদস্যকে তারা গুলি করে হত্যা করে। এদের একজনের নাম হাবিলদার আজিজ এবং অন্য জনের নাম হাবিলদার রহমানগুল। আগষ্টের শেষ নাগাদ বিমান হামলায় মুক্তিবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফলে শালদানদী স্টেশন পাকবাহিনী দখল করে নেয়। এদিকে মেজর খালেদ মোশাররফ শালদা স্টেশন পুনরুদ্ধারে মুক্তিবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ক্যাপ্টেন গাফফারের কমান্ডে শালদা নদীর উত্তর বায়েকে একটি কোম্পানী, ক্যাপ্টেন আশরাফের কমান্ডে নয়নপুর সড়কে এক কোম্পানী এবং মেজর সালেকের নেতৃত্বে একটি কোম্পানী শালদা নদী রেলস্টেশনের পশ্চিমে মোতায়েন করেন। ক্যাপ্টেন পাশার কমান্ডে আর্টিলারি বাহিনী মন্দভাগে অবস্থান নেয়। মর্টার সেকশন নিয়ে সুবেদার জব্বার বায়েকের পিছনে সার্পোট সেকশন হিসাবে পজিশন নেয়। এই অভিযানের সার্বিক কমান্ডে থাকেন স্বয়ং মেজর খালেদ মোশাররফ।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে পাকসেনারাও বেলুনিয়া ও শালদানদী এলাকায় তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ৬ সেপ্টেম্বর পাকসামরিক বাহিনী নয়নপুরে বিপুল সৈন্য সামাবেশ করে। রাত ৩ টায় পাকবাহিনীর দুটো প্লাটুন সিলোনিয়া নদী অতিক্রম করে। মুক্তিবাহিনী আক্রমন চালিয়ে ১৫ জনকে হত্যা করে। অবশিষ্ট সৈন্যরা মর্টারের শেল বর্ষন করার মাধ্যমে নিজেদের বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরদিন বিকেল চারটায় পাকসেনাদের আরেকটি শক্তিশালী দল পশ্চিমে মুহুরী নদী অতিক্রমের চেষ্টা করে। মুক্তিবাহিনী বাধা দিলে একজন অফিসার সহ ১৫ জন পাকসৈন্য নিহত হয়। পাকসেনারা তাদের আক্রমন অব্যাহত রাখে এবং মুক্তিবাহিনী টিকে থাকতে না পেরে পিছু হটে যায়। পাকবাহিনী তাদের আক্রমনের চাপ অব্যাহত রাখে। পরে মুক্তিবাহিনী পাল্টা আক্রমনে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১০ সেপ্টেম্বর মুহুরী নদী পার হয়ে প্রচন্ড আক্রমন চালায় পাকবাহিনী। সমস্ত দিনের এ আক্রমন মুক্তিবাহিনী প্রতিহত করে। তবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও মুক্তিসেনারা পাকবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। শত্রুদের উপর মুক্তিবাহিনী এবার চাপ অব্যাহত রাখে। ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর একটি দল কামানের সাহায্যে পরশুরামের পাক ঘাটিতে আক্রমন চালিয়ে ৭ জন পাক সেনাকে হত্যা করে। পাকবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ফেনীর দক্ষিণে কামানসজ্জিত অবস্থান গড়ে তোলে। সেখান থেকে তারা মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর গুলিবর্ষন করতে থাকে। এআক্রমনের ফলে মুক্তিবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে।

১৪ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানী তিনটি মর্টারসহ পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমন চালায়। ফেনী থেকে পাকসেনাদের কামান গুলো থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর প্রচন্ড আক্রমন চালানো হতে থাকে। মুক্তিবাহনীর গোলন্দাজ বাহিনীও পাকসেনাদের ফেনী অবস্থানের উপর পাল্টা আক্রমনা চালায়। দুঘন্টা স্থায়ীযুদ্ধে পাকবাহিনীর ১০ জন সদস্য নিহত, ১৬ জন আহত এবং তারা নিজেদের অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনীর ঘাটির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এবং তারা গোলাগুলি বন্দ করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর ফেনীতে পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। পরের দিন শালদা নদীর পাকঘাটিতে মুক্তিবাহিনী আক্রমন চালিয়ে পাকবাহিনীর ক্ষতি সাধন করে। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর ২০/২৫ জন সদস্য হতাহত হয়। শালদার অবস্থান থেকে পাকসেনাদের বিতাড়নের পর

মুক্তিবাহিনী পরশুরামের অনন্তপুরে পাক ঘাটিতে আক্রমন চালায়। এতে ১০ জন পাকসেনা নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। এর একদিন পর অনন্তপুর গ্রামের অবস্থানের উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমন চালিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করে।

২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাকসেনাদের নয়নপুর অবস্থানের উপর আক্রমন চালিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। ৩০ সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন পাশা পাকবাহিনীর উপর প্রথম আর্টিলারির গোলা নিক্ষেপ করে। ক্যাপ্টেন আশরাফের উদ্দ্যেগ ও নেতৃত্বে নয়নপুরে শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমন চালানো হয়। এই আক্রমনের মুখে পাকবাহিনী নয়নপুর ছেড়ে শালদা নদী রেলস্টেশনের মূল ঘাটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফলে নয়নপুর মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে। ক্যাপ্টেন গাফফারকে শালদা নদী স্টেশন দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৩৬]

১লা আক্টোবর রাত ১১ টায় পাকবাহিনীর মুন্সির হাট এবং শালদা অবস্থানের উপর একযোগে আক্রমন চালানো হয়। ২অক্টোবর শালদায় শত্রু ঘাটির উপর আক্রমন চালালে ৯ জন পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা তাদের অবস্থান গুলোকে রক্ষা করার জন্য ২ ও ৩ অক্টোবর ফেনী থেকে মুন্সির হাট ও চিতলিয়াতে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সমাবেশ করে। ৩ অক্টোবর পাকসেনাদের একটি দল মুক্তিবাহিনীর অনন্তপুর ও ধানিকুন্ডা অবস্থানের উপর আক্রমন চালায়। সম্মুখ যুদ্ধে ২৫/৩০ জন পাকসেনা নিহত হয়। অবশ্য পরে পাকবাহিনী অনন্তপুরে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি ট্রেঞ্চ দখল করে নেয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সৈনিক শহীদ হন। এ ঘটনার পরের দিনই পাল্টা আক্রমন চালিয়ে মুক্তিবাহিনী অনন্তপুর ও ধানিকুন্ডা পুর্নদখল করে। পুর্নদখলের এই লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকসেনাদের ৪০/৫০ জন হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর একজন মাত্র সদস্য এখানে শহীদ হন। ৪ অক্টোবর চিতলিয়া ঘাটির উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমন চালায়। পুরো অক্টোবর জুড়ে আক্রমন পাল্টা আক্রমন চলতে থাকে।

শালদা নদীর পাক ঘাটির উপর বড় ধরনের অভিযান পরিচালিত হয় নভেম্বরে। শালদা নদী এলাকায় শত্রুদের ঘাটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। এই ঘাটির উভয় পার্শ্ব দিয়ে শালদা নদী প্রবাহিত হওয়ায় শত্রুদের উভয় দিকটা সম্পূর্ন নিরাপদ ছিল। পূর্ব দিকে রেলওয়ে স্টেশন ও উচু রেললাইন সম্মুখবর্তী এলাকায় শত্রুদের নিরাপত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে। এই অবস্থানটিকে নিয়মিত প্রথায় আক্রমন করে সফল হওয়া দুস্কর ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ঘাটিটিকে তিনদিক থেকে আক্রমন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন গাফফার ও নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন শালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্বে পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নেয়। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদী ও গুদাম ঘরের পশ্চিমে নদী অতিক্রম করে অবস্থান নেয়। সুবেদার বেলায়েতের নেতৃত্বে আরেকটি প্লাটুন শালদা নদীতে শত্রু ঘাটির বিপরীতে অবস্থান নেয়। সুবেদার ওয়াহাবের নেতৃত্বে একটি কোম্পানী নিরাপত্তা মূলক অবস্থান গ্রহন করে। এছাড়া পাকসেনাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার জন্য চারটি ছোট রেইডিং পার্টিকে বড় ধুশিয়া, চান্দলা, গোবিন্দপুর,

৩৬। আবু মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন - মুক্তিযোদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

কায়েমপুর শত্রুঘাটির দিকে পাঠানো হয়। ১৫ নভেম্বর রাতে পাকসেনাদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য শত্রু ঘাটির উপর হালকা আক্রমন চালানো হয়। পাকবাহিনী মর্টার ও কামানের গোলার সাহায্যে এর জবাব দেয়। ভোরের দিকে গোলাবর্ষন বন্ধ হয়ে যায়। আক্রমন শেষ হয়েগেছে ভেবে পাকসেনারা পরদিন সকালে কিছুটা অসর্তক হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের সুযোগ নেয়। উল্লেখ্য যে, শত্রুরা সাধারণত: রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর সাম্ভাব্য আক্রমনের জন্য যতটা সর্তক থাকত, দিনের বেলায় ততটা প্রস্তুত থাকত না।

এমতাবস্থায় পাকসেনাদের এই অসর্তকতার সুযোগ নিয়ে মুক্তিবাহিনী সকাল আটটায় শত্রুদের উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচন্ড আক্রমন চালায়। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি পশ্চিম দিকে শালদা নদী গুদামঘরের পরিখায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর এবং নায়েক সুবেদার সিরাজ পূর্ব দিকের পাহাড়ী এলাকার অবস্থান থেকে ঐ একই অবস্থানের উপর আক্রমন চালায়। নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ হোসেন সুবেদার বেলায়েতের অবস্থান থেকে নদীর অপর তীরের পরিখা গুলোতে আক্রমন চালিয়ে চারটি পরিখা ধ্বংস করে দেয়। সুবেদার বেলায়েতও তার দলের প্রচন্ড আক্রমনে শালদা নদীর তীরবর্তী এলাকা সম্পূর্ন শত্রুমুক্ত হয়। ফলে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানরত পাকসেনাদের সঙ্গে শালদা নদী গুদাম ঘরে অবস্থানরত পাকসেনাদের যোগাযোগ সম্পূর্ন বিচিছন্ন হয়ে যায় এবং তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে দূর্বল হয়ে পড়ে। প্রচন্ড আক্রমনে টিকতে না পেরে গুদাম ঘরে অবস্থানরত পাকসেনারা নয়নপুর রেলস্টেশনের দিকে পালাতে থাকে। সুবেদার মঙ্গল মিয়ার দলটি গুদামঘর এলাকা দখল করে নেয়। সুবেদার বেলায়েত ও নায়েক সুবেদার সিরাজের প্রচন্ড আক্রমনে শালদা নদী রেলস্টেশনে অবস্থানকারী পাকসেনারা পালিয়ে নয়নপুরের দিকে চলে যায়। দুপুর নাগাদ সমগ্র শালদা নদী এলাকা শত্রুমুক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। পাকসেনারা নয়নপুর ঘাটি থেকে মর্টার ও কামানের আক্রমন চালায় এবং শালদা নদী গুদাম ঘর দখলের চেষ্টা চালায়। সুবেদার বেলায়েতের পাল্টা আক্রমনে শত্রুসেনারা পালিয়ে যায়। কিন্তু দূর্ভাগ্য জনক যে, এই যুদ্ধে সুবেদার বেলায়েত শহীদ হন।

শালদা নদী এলাকা দখল একটা দুঃসাহসিক অভিযানের অংশ ছিল। এ অভিযানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিসেনাদের হস্তগত হয়। এরপর অনেক চেষ্টা করেও পাকবাহিনী শালদা নদী এলাকা দখল করতে পারেনি। এ কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন গাফফার ও শহীদ বেলায়েতকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন।[৩৭]

৩। <u>লক্ষীপুরের যুদ্ধ</u> ঃ- মে মাসে রাজাকার গঠনের পর পাকবাহিনীর সহায়তা করার জন্য প্রত্যকটি থানায় রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। কোন কোন ক্যাম্পের দায়িত্বে পাকসেনারা থাকত। কিন্তু পাকসেনাদের তুলনায় রাজাকারের সংখ্যা ছিল বেশী। তখনো ভারত থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা নোয়াখালীতে প্রবেশ করেনি। নিয়মিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম হওয়াতে এবং ভারী অস্ত্রের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা

৩৭। <u>স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র</u> প্রথম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা কোন ঠাসা অবস্থায় ছিল। ফলে তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঝটিকা আক্রমন চালিয়ে শত্রুদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় লক্ষ্মীপুরের দায়িত্বে নিয়োজিত হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর বাহিনী কিছুটা পশ্চাদপসরন করে লক্ষ্মীপুর থেকে রামগঞ্জের সমিতির হাট, কালিয়াপুর গ্রামে ঘাটি স্থাপন করেন এবং স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দলে যোদ্ধারা সংখ্যা বাড়ানেরর চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে জুন মাস থেকে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলারা আসতে শুরু করে নোয়াখালীতে।

২১ জুন হাবিলদার আবদুল মতিন অতর্কিতে দালাল বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমন করে একজন মিলিশিয়া সহ ১৬ জন রাজাকারকে হত্যা করে ও তাদের ক্যাম্প ধ্বংস করে দেয়। ২৫ জুন রাতে মতিন পাটওয়ারী লক্ষ্মীপুরের বাগবাড়ি রাজাকার ক্যাম্প মর্টারের সাহায্যে আক্রমন করলে কয়েক জন রাজাকার হতাহত হয় এবং শত্রু পক্ষের কয়েক জন গুপ্তচর ধরা পড়ে। অপর দিকে সুবেদার শামসুল হকের হাতে একজন রাজাকার কমান্ডার ধরা পড়ে। ৩০ জুন হাবিলদার আবদুল মতিনের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিসেনা লক্ষ্মীপুর থেকে কালির বাজার অগ্রগামী মিলিশিয়া ও রাজাকারদের উপর প্রচন্ড আক্রমন চালালে কয়েকজন হতাহত হয়। রাজাকাররা কালীর বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।[৩৮]

১৭ জুলাই রামগঞ্জের উত্তরে নরিমপুর হতে এক কোম্পানী পাকরেঞ্জার্স ও রাজাকার দল অগ্রসর হতে থাকলে হাবিলদার জাকির হোসেনের নেতৃত্বে এক প্লাটুন মুক্তিসেনা তাদের উপর আক্রমন চালায়। বেশ কিছুক্ষন গুলি বিনিময়ের পর শত্রুরা রাজাকারের দুটি মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে হাবিলদার জাকির মৃত রাজাকার দ্বয়ের দাফনের ব্যবস্থা করেন। মান্দারী বাজারে রাজাকারদের ছোট্ট একটি ক্যাম্প ছিল। ১৯ জুলাই সুবেদার লুৎফর রহমানের নির্দেশে সুবেদার অলি উল্লাহ, হাবিলদার মতিন ও শাহাবুদ্দিন মান্দারী শত্রু ক্যাম্পে আক্রমন চালায়। শত্রুদের কয়েক জন হতাহত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর দুই জন যোদ্ধা শহীদ হন।

পাকিস্তানিরেঞ্জার্স ও রাজাকারগন রায়পুর এল, এম, হাইস্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। ৬ আগষ্ট সন্ধ্যায় সময় মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা দল শত্রুদের এই ক্যাম্পে আক্রমন চালায়। ফলে ৯ জন রাজাকার হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর একজন যোদ্ধা আহত হন। ৮ আগষ্ট আরেকটি গেরিলা দল পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দলকে লক্ষ্মীপুরের দালাল বাজারে এ্যামবুশ করে ১৫ জন শত্রুসেনাকে হত্যা করে। পাকসেনা ও রাজাকারগন লক্ষ্মীপুর থানায় চন্দ্রগঞ্জ প্রতাপ হাইস্কুলে একটি ঘাটি স্থাপন করে। ১৫ আগষ্ট রাত এগারটায় মুক্তিবাহিনী এই ঘাটি আক্রমন করলে প্রায় ৪০ জন শত্রুসেনা হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমনে পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জের এম, ইউ, হাইস্কুলে ঘাটি স্থাপন করে। সুবেদার আলী আকবর পাটওয়ারীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর একটি দল ২০ সেপ্টেম্বর এই ঘাটির উপর আক্রমন চালায়।

৩৮। সাক্ষাতকার - হাবিলদার আবদুর মতিন পাটওয়ারী (২৫.৭.৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় দুঘন্টার যুদ্ধে ১৪ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট পাকসেনা ও রাজাকারদের একটি দল রামগঞ্জ বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ৫০ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল এই খবর পেয়ে রামগঞ্জ বাজারের পূর্ব দিকে এ্যামবুশ করে। শত্রুরা এ্যামবুশের আওতায় চলে আসলে গুলি চালানো হয়। এতে ২০ জন পাকসেনা ও রাজাকার নিহত ও ২৭ জন আহত হয়। আরো ২ জন আহত পাকসেনা হাসপাতালে মারা যায়।[৩৯]

রাজাকারসহ পাকসৈনাদের একটি দল রামগঞ্জ থেকে লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় ১০টি গাড়ীর বহর নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংবাদ পেয়ে সুবেদর আলী আকবর পাটওয়ারী ও হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা মীরগঞ্জ বাজার ও ফজল চৌধুরীর হাটের নিকট পাকসেনাদের উপর আক্রমন চালায়। এই আকস্মিক আক্রমনের ফলে পাকসেনারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাকসেনারা গাড়ী থেকে নেমে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করতে থাকে। উভয় পক্ষের মধ্যে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। এতে শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। ১লা আক্টোবর গেরিলাদল রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় রাজাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আক্রমন চালিয়ে ৪০ জন রাজাকারকে হত্যা করে। ২রা অক্টোবর ছাত্র কমান্ডার একরামের নেতৃত্বাধীন একটি গ্রুপ রামগঞ্জে রাজাকারদের আক্রমন করে। অপর দিকে সুবেদার ইসাহাক পানিওয়ালা বাজার আক্রমন করে ৪জন রাজাকার হত্যা করে। ১০ অক্টোবর পাকসেনাদের একটি দল লক্ষ্মীপুর থেকে রামগঞ্জ যাবার পথে কাজীর দিঘির পাড়ে গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমনে এটি ধ্বংস হয়।[৪০]

আক্রমন করতে গেলে দেখতে পায় যে, রাজাকাররা লুণ্ঠিত কাপড় বন্টনে ব্যস্ত। সেই অবস্থায় আক্রমন চালিয়ে কয়েকজন রাজাকারকে হত্যা করেন। অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। লুণ্ঠিত কাপড় মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এসময় মীরগঞ্জ বাজারের ক্যাম্পের রাজাকাররা আত্মসমর্পনের জন্য সুবেদার গুৎফর রহমানের নিকট দুখানা পত্র পাঠায়। দ্বিতীয় পত্র পাওয়ারপর এডভোকেট আক্কারুজ্জামানকে পাঠান হয় আত্মসমর্পনের শর্ত নির্ধারণ ও মধ্যস্থতা করার জন্য। সুবেদার অলিউল্লাহকে পাঠান হয় সতর্কতার সাথে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। পূর্ব শর্ত অনুযায়ী রাজাকাররা লাইন ধরে অস্ত্ররেখে দুহাত উপরে তুলে নায়েক সুবেদার অলি উল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে। সংখ্যায় ছিল ৩৭ জন রাজাকার ও ২৭ জন পুলিশ। কয়েক দিন পর তাদের মুক্তিবাহিনীতে আত্মীকরন করা হয়। দুজন বিশ্বাস ঘাতকতা করে ধরা পড়লে হত্যা করা হয়।[৪১]

লক্ষ্মীপুরের প্রধান দালাল ননী মিয়া চৌধুরী চেয়ারম্যান এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। লুটতরাজ, নারী ধর্ষন, গনহত্যা, বাড়ীঘর পোড়ানো, হানাদার বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর সন্ধ্যান দেওয়া ছিল তার কাজ। অবশেষে ২৩ অক্টোবর সুবেদার অলি উল্লাহ তার দল নিয়ে এই দালাল বাহিনীর উপর আক্রমন চালিয়ে জীবন্ত অবস্থায়

৩৯। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র - ১০ম খন্ড।
৪০। পূর্বোক্ত (স্বাক্ষাতকার- মেজর খালেদ মোশাররফ)

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী বিশ্বাস ঘাতক দালাল ননী চেয়ারম্যানকে বন্দী করে। জনতার উপস্থিতিতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর পাতা মাইনে লক্ষ্মীপুরগামী একটি পাকবাহিনীর ট্রাক উল্টে গেলে ড্রাইভার নিহত হয়। ১৩ নভেম্বর সুবেদার লুৎফর রহমানের বাহিনী লক্ষ্মীপুর বাগবাড়িতে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমন করলে বহু রাজাকার হতাহত হয়।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর বাহিনী লক্ষ্মীপুর থানা, বাগবাড়ি ও বটু চৌধুরীর দালানে অবস্থানরত রাজাকার বাহিনীর উপর আক্রমন চালায়। রাজাকাররাও পাল্টা আক্রমন চালায়। এসময় রাজাকার দালাল হারিস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে রাজাকাররা হাবিলদার আবদুল মতিনের নাম ধরে মাইকিং করতে থাকে আত্মসমর্পন করার জন্য। এসময় মুক্তিবাহিনী ট্রেচার লাঞ্চার দিয়ে ফায়ার করলে রাজাকার ক্যাম্পে আগুন ধরে যায়। তখন রাজাকাররা ভবানীগঞ্জের দিকে পলিয়ে যায়। ৪২ জন পুলিশ এ দিন মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। লক্ষ্মীপুর মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে আসে। কিন্তু ৩ দিন পর অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর রাজাকার মাওলানা আবদুল হাইয়ের কমান্ডে একদল রাজাকার আবার লক্ষ্মীপুর আসে। এদিন প্রথমে হাবিলদার আবদুর মতিনের বাহিনী রায়পুর আক্রমন করলে রায়পুর থেকে রাজাকারগণ পালিয়ে লক্ষ্মীপুর দিকে আসে এবং লক্ষ্মীপুরে মাওলানা আবদুর হাইয়ের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। আবদুল মতিনের বাহিনী পিছু ধাওয়া করলে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১০৮ জন রাজাকার বন্দী হয় এবং বাকীরা পালিয়ে মাইজদীর দিকে চলে আসে।[৪২] ফলে ৬ ডিসেম্বর রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর পুরোপুরি মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে আসে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে লক্ষ্মীপুরে।

৪। <u>নোয়াখালী অঞ্চলের কয়েকটি যুদ্ধ</u> ঃ- নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চলের চাইতে পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধ গুলো কিছুটা ভিন্ন ধরনের। নোয়াখালীর পূর্ব দিকে অর্থাৎ ফেনী অঞ্চল ছিল ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও রেলসড়কের কারনে রণকৌশলগত দিকথেকে এই অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল বেশী। সেই তুলনায় নোয়াখালী সদর এবং আরো পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব কম থাকায় এ অঞ্চলে যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কম ছিল। এছাড়া নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে পাকিস্তানিসেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম এবং রাজাকারের সংখ্যা ছিল বেশী। মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়ে এবং নোয়াখালীর প্রত্যান্ত অঞ্চলে গেরিলাদের সঙ্গে পাকসেনাদের তুলনায় রাজাকারদের সঙ্গেই সংঘর্ষ বেশী হয়েছে।

২ নং সেকটরের অধীন ৬নং সাবসেকটরের নিয়ন্ত্রনে ছিল নোয়াখালী জেলা। এই সাব সেকটরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, মেজর খালেদ মোশাররফের নির্দেশে নোয়াখালীর পশ্চিম অঞ্চলকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারজন সুবেদারকে এই সব এলাকার গেরিলা এবং নিয়মিত বাহিনীর তত্ত্বাবধানের ভার দেয়া হয়। সোনাইমুড়ী, রামগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ এলাকার ভার সুবেদার আলী আকবর

৪১। মুক্তিযোদ্ধের দলিল-১০ম খন্ড (স্বাক্ষাতকার-সুবেদার লুৎফর রহমান)।
৪২। স্বাক্ষাতকার - হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারী (২৫.৭.৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

পাটওয়ারী, নোয়াখালী সদরের ভার সুবেদর লুৎফর রহমান, দক্ষিণ ফেনীর ভার সুবেদার জব্বার এবং লক্ষ্মীপুর ও রায়পুরের ভার সুবেদার আবদুর মতিন পাটওয়ারীর উপর আরোপিত হয়। এলাকা বিভক্তির পর স্থানীয় কমান্ডাররা সম্মিলিত গেরিলা ও নিয়মিত বাহিনীর পূর্ন সহযোগিতায় তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে।

৩ জুন সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে বজরার কুখ্যাত দালাল, পাকসামরিক বাহিনীর অন্যতম সহযোগী সিরাজুল ইসলাম (ছেরু মিয়া) এর গোপন আস্তানা বজরা স্কুলের পূর্ব দিকে রাতের বেলায় আক্রমন চালানো হয় এবং চার জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়। কিন্তু চতুর ছেরু মিয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দেশ মুক্ত হবার পর মুক্তিবাহিনী তাকে হত্যা করে। ৬ জুন মাইজদীতে রাজাকার ক্যাম্পে হাত বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং এতে রাজাকার কমান্ডার সহ চার জন নিহত হয়। ১১ জুন চন্দ্রগঞ্জ সেতু উড়িয়ে দেয়া হয়। ১৬ জুন পাকসেনা ও রাজাকার মিলে প্রায় দুই শতাধিক পদাতিক বাহিনী সুবেদার লুৎফর রহমানের এলাকা আক্রমনের জন্য নদনা সেতু থেকে পশ্চিম দিকে রওয়ানা হয়। সেতুর অল্প পশ্চিমে সুবেদার অলি উল্লাহ, সুবেদার শাসছল হক, হাবিলদার মস্তাজ প্রায় শতাধিক মুক্তিবাহিনী নিয়ে পাকবাহিনীর উপর আক্রমন চালায়। সুবেদার লুৎফর রহমান নিজেই এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ৬ ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে ৭/৮ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। ২৩ জুন আপানিয়া সেতুর নিকট কয়েকজন দালালসহ দুজন পাকসেনা সম্ভবতঃ মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করছিল। ঠিক সেই সময় নায়েক সুবেদার শামছল হক ও হাবিলদার মস্তাজ পাকসেনা দুইজনকে হত্যা করে, দালালরা পালিয়ে যায়। ২৪ জুন বগাদিয়ায় পাকসেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

৪ জুলাই পাকসেনাও রাজাকারবাহিনী ভোর রাতে আর্টিলারিসহ গজারিয়া গ্রামে আক্রমন চালায়। প্রায় ২টা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী ব্যর্থ হয়ে চৌমুহনী টেকনিক্যাল স্কুলে তাদের ঘাটিতে ফিরে যায়। এখানে ৪/৫ জন রাজাকার হতাহত হয়। ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। ২৩ জুলাই সাহেবজাদা সেতু ধ্বংস করে নোয়াখালীর সাথে রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ১৪ আগষ্ট নায়েক সুবেদার শামছল হকের নেতৃত্বে বসুর হাটে পাকসেনাদের আক্রমন করা হয়। এ আক্রমনে শত্রুদের একখানা জীপ নষ্ট করে দেয়া হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। এই যুদ্ধে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ২ জন গুরুতর আহত হয়। সিপাহী নুরুন্নবীর বৃদ্ধাঙ্গুলী গুলির আঘাতে উড়ে যায়। ২৬ আগষ্ট মিলিশিয়া ও রাজাকার বাহিনীর একটি বিরাট দল আমিন বাজার থেকে আমিশা পাড়ার দিকে অগ্রসর হচেছ- এ খবর পেয়ে সুবেদার লুৎফর রহমানের নির্দেশে মুক্তিবাহিনী আক্রমনের প্রস্তুতি নেয়। শত্রুরা আমিন বাজারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে সুবেদর অলি উল্লাহ ত্রিমুখী আক্রমন শুরু করে। শত্রুরা পিছু হটতে শুরু করলে সুবেদার লুৎফর রহমানের বাহিনী পিছন থেকে আক্রমন শুরু করলে শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এসময় জনসাধারণ চারদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে মুক্তিবাহিনীর গুলি চালাতে অসুবিধা হয়। এ সুযোগে শত্রুরা অস্ত্র ফেলে জনসাধারণের মধ্যে মিশে যায়। এখানে ৩ জন রাজাকার নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। রাজাকার মাওলানা মিজানুর রহমান অস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

অগাষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় রাজাকার আলবদরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। সেজন্য নোয়াখালীর পরিষদ সদস্য বর্গের পরামর্শে সুবেদার লুৎফর রহমান নোয়াখালীকে আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করে অন্যান্যদের হাতে দায়িত্ব অর্পন করেন মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার জন্য। নোয়াখালী সদর মহকুমাকে চার ভাগ করা হয়। দক্ষিণ পশ্চিমাংশের দায়িত্ব সুবেদার লুৎফর রহমান, পূর্ব দক্ষিণের দায়িত্ব সুবেদার অলি উল্লাহ, পূর্ব-উত্তরের দায়িত্ব নায়েক সুবেদার শামছুল হক ও পশ্চিম উত্তরের দায়িত্ব নায়েক সুবেদার ইসাহাকের উপর অর্পিত হয়।

ইতিমধ্যে বহু ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারত থেকে নোয়াখালীতে আসে প্রচুর পরিমান অস্ত্র নিয়ে। গেরিলাদের বিক্ষিপ্ত আক্রমনের শত্রুবাহিনী দিশে হারা হয়ে পড়ে। ২১ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনীর ৬টি ট্রুপস্ রাজগঞ্জের চর্তুদিকে পাক-রাজাকার বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য অবস্থান নেয়। ২৬ সেপ্টেম্বর জরুরী প্রয়োজনে ৫টি ট্রুপস্কে প্রত্যাহার করে অন্য এলাকায় অপারেশন চালানোর জন্য পাঠানো হয়। শত্রুরা গোয়েন্দা মারফত ৫টি ট্রুপস্ প্রত্যাহারের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজগঞ্জে বাকী একটি ট্রুপস্ের উপর আক্রমন চালায়। পাকবাহিনী মাইজদী বাজার থেকে ছয়ানী রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মর্টার ও মেশিনগানের গুলি বর্ষন করতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার হাসেম দৃঢ়তার সাথে পাকবাহিনীর আক্রমন প্রতিহত করতে থাকে। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে আবুল হাসেম প্রায় ২৩ জন শত্রু সেনাকে হত্যা করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর অন্যান্য দলথেকে সময়মত সাহায্য না পাওয়ায় এবং গোলাবারুদ পুরিয়ে যাওয়ায় পাকবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে এবং মুক্তিযোদ্ধা হাসেম, রফিক ও সবুজকে হত্যা করে।

২৯ আষ্টোবর পাকবাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্ট লাকসাম থেকে কামান ও রকেটর সাহায্যে গোলাবর্ষন করতে করতে সোনাইমুড়ী থেকে চাটখিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পথে মুক্তিবাহিনী বাধা দিলে তুমুল লড়াই শুরু হয়। ২/৩ ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কয়েকজন হতাহত হয়। হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে একই বাড়ীর ৫ জন নিরীহ লোক নিহত হয়। ৩০ অক্টোবর ওদার হাট রাজাকার ক্যাম্প আক্রমন করে ২৬ জন রাজাকারকে বন্দী করা হয় এবং পরে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৭ নভেম্বর মাইজদী হাসপাতালে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনী আক্রমন চালায়। ২২ নভেম্বর ভোকেশনাল স্কুলে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমন চালান হয়। এবং ৫/৬ জন রাজাকার হতাহত হয়। ২৯ নভেম্বর পাকবাহিনী একটি পিকাপ ভ্যানে দুজন স্ত্রীলোককে নিয়ে যাওয়ার সময় বগাদিয়ার নিকট হাবিলদার আউয়াল গাড়িটি আক্রমন করে। এসময় পিছন থেকে আরো কিছু শত্রু সৈন্য উপস্থিত হলে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। ২/৩ ঘন্টা গুলিবিনিময়ের পর শত্রুরা স্ত্রীলোক ২ জন রেখেই পালিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয়। ১লা ডিসেম্বর চন্দ্রগঞ্জ বাজারে পাকসেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। ৪ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার নায়েক আবুল হোসেনের নেতৃত্বে নোয়াখালীর গুরুত্ব পূর্ন সেতু গুলি ধ্বংস করে দেয়া হয়। পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনী এসময় খুবই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং কুমিল্লার দিকে পালাতে শুরু করে। পলায়নপর পাকসেনা ও রাজাকারদের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় এ্যামবুশরত মুক্তিবাহিনীর খন্ড খন্ড যুদ্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে ৬ ডিসেম্বর ফেনী এবং লক্ষ্মীপুর মুক্ত হলে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুদিক থেকে গেরিলাদের আক্রমন এবং ফেনীর দিক থেকে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর অগ্রসর হবার খবর পেয়ে শত্রু বাহিনী লাকসাম হয়ে কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী মুক্ত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নোয়াখালীর মুক্ত আকাশে পতপত করে উড়তে থাকে।

<u>স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীদের তৎপরতা</u> ঃ- ডানপন্থী ও বামপন্থী বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় বিরোধীতাকারী দল হচ্ছে- জামাতে ইসলামী দল, এদলটি সচেতন ভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুধু বিরোধীতাই করেনি, তার সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘকে (বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির) নিয়ে পাকিস্তান রক্ষার জন্য একটি শশস্ত্র দল গড়ে তোলে। সারা দেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা, ধর্ষন, লুটতরাজকে এরা শুধু সমর্থন, প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন ও সহযোগিতাই করেনি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি সাংবাদিকদের এরাই নির্বচারে ধরে এনে নির্মম ভাবে হত্যা করে এবং গনিমতের মাল বলে হাদিসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বাঙালি মেয়েদের জোর করে ভোগ করাকে সিদ্ধ বলে—ঘোষনা করে। সারা দেশের মতো নোয়াখালী জেলায় ও এই সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা পাকিস্তান-রক্ষার নামে তাদের অপতৎপরতা শুরু করে এবং কোথাও ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করে।

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞে অবতীর্ন হওয়ার পর সেনাবাহিনী ই, পি, আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, যুবক ও সকল স্তরের দেশ প্রেমিক জনতার সমন্বয়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে, ৪ঠা এপ্রিল জামাতে ইসলামীর নেতা গোলাম আজম পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর টিক্কা খানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং ৯ এপ্রিল টিক্কা খানের সঙ্গে স্বাক্ষাত করে তিনি ছাত্র-যুবকদের নিয়ে একটি সহযোগী বাহিনী সৃষ্টির পরামর্শ দেন। পাকিস্তান সরকার গোলাম আজমের পরামর্শ গ্রহন করে রাজাকার বাহিনী গঠন অধ্যাদেশ জারী করেন।[৪৩] জামাতের পাশাপাশি কতিপয় ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল পাকিস্তান সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে। ৫ এপ্রিল নুরুল আমিনের নেতৃত্বে ২২ জন রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে গোলাম আজম ও খাজা খায়ের উদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাত করে রাজনৈতিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার গোলাম আজম ও নোয়াখালীর হামিদুল হক চৌধুরী (অবজারভার গ্রুপের মালিক) টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাত করে নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন[৪৪]। ৯ এপ্রিল ১৪০ জন সদস্য নিয়ে ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। ১৪ এপ্রিল এই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "শান্তি কমিটি" রাখা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী কলে রাজাকার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রন এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

৪৩। এ,এস,এম, সামছুল আরেফিন - <u>মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান</u>।
৪৪। মোহাম্মদ হাননান- <u>বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস</u>। পৃ-৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালী জেলার যে সকল ব্যক্তিত্ব শুরু থেকেই পাকিস্তান সরকারকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছিল তারা হলেন-(১) হামিদুল হক চৌধুরী পিতা- আক্কু আলী চৌধুরী গ্রাম-রামনগর, থানা-ফেনী, জনসংযোগ কর্মকর্তা, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, কার্যকরী সদস্য, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। (২) মাওলানা আবদুল জব্বার খদ্দর পিতা- আবদুল হামিদ, গ্রাম-গনক, থানা-সেনবাগ, কার্যকরী সদস্য, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। (৩) মাওলানা মোহাম্মদ উল্যাহ (হাফেজ্জী হুজুর) গ্রাম- লুধুয়া, থানা-রায়পুর, কার্যকরী সদস্য, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। (৪) ওবায়দুল্লাহ মজুমদার, থানা-ছাগল নাইয়া, ফেনী, কার্যকরী সদস্য এবং পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী। (৫) এডভোকেট সহিদুল ইসলাম পিতা-আহমেদ আলী মিয়া, গ্রাম-ভাটিয়া, থানা-সুধারাম, আহবায়ক-শান্তি কমিটি নোয়াখালী জেলা। (৬) খায়েজ আহমেদ-আহবায়ক-শান্তি কমিটি, ফেনী মহকুমা। (৭) গোলাম মোস্তফা-আহবায়ক-শান্তি কমিটি, নোয়াখালী সদর মহকুমা। (৮) অধ্যাপক মহিউদ্দিন চৌধুরী পিতা- আবদুল ওহাব, গ্রাম-শমসেরাবাদ, থানা-লক্ষ্মীপুর। (৯) শফিকুল্লাহ পিতা-রওশন আলী পন্ডিত, গ্রাম-লামচরী, থানা-লক্ষ্মীপুর। (১০) গোলাম সারওয়ার গ্রাম-হাবিবপুর, থানা-লক্ষ্মীপুর। (১১) মাহবুবুর রহমান গ্রাম-চাটখিল, থানা-রামগঞ্জ ছাত্র নেতা, এন, এস, এফ,(বর্তমান বি, এন, পি, নেতা ও এম, পি এবং এরশাদ সরকারের মন্ত্রী)।[৪৫] উল্লেখিত ব্যক্তিদের তৎপরতা ও সহযোগিতায় নোয়াখালীতে প্রত্যেক থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে এই কমিটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় এবং ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়ানোর কারণে নোয়াখালী জেলার প্রায় বেশীর ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগন শান্তি কমিটিতে কাজ করেন। পরবর্তীতে যখন তারা বুঝতে পারেন যে, আসলে একমিটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা এবং কর্মকান্ডে লিপ্ত তখন অনেকে পক্ষ ত্যাগ করেন। তবে অনেকে দ্বৈত ভুমিকা ও পালন করেছেন। একদিকে তারা পাকসেনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে স্থানীয় জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেছেন অন্য দিকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে পাকসেনাদের অবস্থান ও যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নোয়াখালীবাসী ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। এর প্রমান ১৯৪৮ সনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ১৫৪টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৩ টি মাদ্রাসা।[৪৬] তাদের এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইসলাম পন্থী দলগুলো বিশেষ করে জামাতে ইসলামী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। নোয়াখালীর মাদ্রাসা গুলোর ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এই সংগঠনের জনপ্রিয়তা ছিল বেশী। ইসলাম ধর্ম ও কোরানের অপব্যাখ্যাকারী মাওলানা মওদুদীর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে জামাতীরা অগ্রাধিকার দেয়। তাই জামাত নেতা গোলাম আজমের পরামর্শে লে, জে, টিক্কা খান ১৯৭১ সনের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স/৭১ জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে ১৯৫৮ সনের আনসার এ্যাকট বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয় কারন আনসার মোজাহিদ বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করে। এই অর্ডিন্যান্সের

৪৫। এ,এস,এম, সামছুল আরেফিন- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান(ইউ, পি, এল) পৃ-৩৮৪-৪২০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাবলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রে সজ্জিত করা হবে বলে জানানো হয়। যদিও মে মাসেই খুলনায় জামাতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান শাখার সহকারী আমীর মাওলানা এ. কে. এম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামাত কর্মী নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। কিন্তু সরকারিভাবে অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে জুন মাসে প্রত্যেক জেলার মত নোয়াখালীর জেলা প্রশাসন থেকেও রাজাকার বাহিনী গঠনের জন্য সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক থানা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে বলা হয়। চাকুরী রক্ষার্তে নোয়াখালী জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে কিছু দাপ্তরিক উদ্যোগ নেন।[৪৭]

কিন্তু সরকারি উদ্দোগের চাইতেও রাজনৈতিক উদ্দ্যেগে বিশেষ করে জামাতের তৎপরতায় নোয়াখালীতে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় এবং খুব দ্রুত এর সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। কোম্পানী কমান্ডার থেকে নীচের দিকের সকলেই রাজাকার কমান্ডারদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। উপরের স্তরের সকলেই ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। শান্তি কমিটির মাধ্যমে রাজাকারদের নির্বাচন করা হতো। নোয়াখালীতে এই বাহিনীর বেশীর ভাগ সদস্য ছিল মাদ্রাসার মোহাদ্দেস ও মোদাচ্ছের। দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ছাড়াও গ্রামের বহু যুবকদের অস্ত্র ও অর্থের লোভ দেখিয়ে এই বাহিনীতে ভর্তি করা হয়।

পাকবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নোয়াখালীর নামকরা মাদ্রাসা ও পাকক্যাম্প গুলোতে রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিচালিত হত। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল দেড় সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ। প্রশিক্ষণ শেষে রাজাকারদের হাতে ৩০৩ রাইফেল তুলে দেয়া হত। শুধু কমান্ডারদের জন্য ষ্টেনগান বরাদ্ধ করা হত। নোয়াখালীর যে সকল মাদ্রাসার রাজাকার গঠনে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা ছিল সেগুলো হলোঃ- নোয়াখালী কারামতিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী ইসলামীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সোনাইমুড়ী হামেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চাটখিল আলীয়া মাদ্রাসা, সেনবাগ সিনিয়র মাদ্রাসা, ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা, ছাগল নাইয়া ইসলামীয়া মাদ্রাসা, সোনাগাজী সিনিয়র মাদ্রাসা, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া লক্ষ্মীপুর, টুমচর ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা।

নোয়াখালী জেলার সদর মহকুমার রাজাকার কমান্ডার ছিলেন সিরাজুল হক এবং ফেনী মজকুমার কমান্ডার আবদুল হালিম চৌধুরী।[৪৮] এদুজনের নেতৃত্বে সমস্ত নোয়াখালীর রাজাকার বাহিনী পরিচালিত হত। যদিও পাকবাহিনীর সদস্যদের কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালিত হত। নোয়াখালীর জেলার পশ্চিমাঞ্চলে রাজাকারদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষ হয়েছে বেশী যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজাকার বাহিনী স্থানীয় অধিবাসী বিধায় এলাকার প্রত্যান্ত অঞ্চল ছিল তাদের চেনা। সে কারনে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতা কর্মীদের খোজ খবর তারা

৪৬। মোঃ ফখরুল ইসলাম- বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস (পৃ-৬৯-৭৪)।
৪৭। সাক্ষাতকার- মনযুর-উল করিম- তৎকালীন ডি,সি, নোয়াখালী (অবসর প্রাপ্ত সচিব)

Dhaka University Institutional Repository

পাকবাহিনীকে জানাত। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পাকবাহিনী নোয়াখালীতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর আক্রমন চালাত। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমনে বিপর্যস্ত পাকবাহিনীকে পালিয়ে আসার পথ রাজাকাররাই দেখাত। তবে যুদ্ধের চাইতে রাজাকার বাহিনী নোয়াখালীতে লুটতরাজ ও ব্যক্তি শত্রু খতম করতে বেশী উৎসাহী ছিল। তারা টাকার বিনিময়ে অনেক নিরীহ লোককে ধরে এনে নির্যাতন ও হত্যা করত। এছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীঘর, দোকানপাট, লুট ও অগ্নিসংযোগ করত এবং নারীদের উপর নির্যাতন করত। বেশীর ভাগ হিন্দুদের সম্পত্তি এসময় রাজাকার ও তাদের সহযোগীরা দর্খল করে নেয়। এছাড়া গরু, ছাগল, হাস, মুরগী জোর করে ধরে নিয়ে পাকবাহিনীকে দিত। তাছাড়া পাকবাহিনী এবং তাদের ক্যাম্প গুলোর নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে রাজাকার বাহিনী কাজ করত। মহকুমা সদর ও থানা সদরের বাইরের ক্যাম্প গুলোতে রাজাকার অবস্থান করত। গেরিলারা এই সমস্ত ক্যাম্প গুলোই বেশী আক্রমন করত। জুন মাস থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত নোয়াখালীর পশ্চিমাঞ্চলে বেশীর ভাগ যুদ্ধ হয়েছে রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে। এই সমস্ত রাজাকারদের সঙ্গে স্বল্প সংখ্যক পাক সেনাও ছিল।

তারা একদিকে যেমন নিরীহ বাঙালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে অন্য দিকে পাকিস্তান সরকারে যোগদিয়ে মন্ত্রীও হয়েছে। ১৯৭০ সনের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩১০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের ১৬৭ আসনে এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে আওয়ামীলীগ জয়লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ১০টি মহিলা আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সনের গণহত্যার পর তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে অধিকাংশ সংসদ সদস্য অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন এবং ঐ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সরকার এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ সরকারে যোগদানকারী ৭৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ১৭১ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করে- ঐ আসন গুলোতে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ৭-১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, এই উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত ছিল।

নোয়াখালী জেলায় যাদের সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে তারা হলেন - জাতীয় পরিষদ সদস্য-১) খাজা আহমদ নোয়াখালী-২ আসন, ২) নুরুল হক- নোয়াখালী-৩ আসন, ৩) খালেদ মোঃ আলী- নোয়াখালী-৬ আসন, ৪) অধ্যাপাক মোঃ হানিফ- নোয়াখালী-৭ আসন। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য- (১) খয়ের উদ্দিন আহমদ- নোয়াখালী-২ (২) এ, বি, এম, তালেব আলী-নোয়াখালী-৩ (৩) মাষ্টার রফিকুল্লাহ মিয়া-নোয়াখালী-৬ (৪) নুরুল আহমেদ চৌধুরী-নোয়াখালী-৮, (৫) মোহাম্মদ উল্লাহ নোয়াখালী-৯, (৬) এডভোকেট বিছমিল্লাহ মিয়া -নোয়াখালী-১০, (৭) আবদুল মোহাইমেন-নোয়াখালী-১১।

নোয়াখালীর একমাত্র সংসদ সদস্য ওবায়দুল্লাহ মজুমদার নোয়াখালী-১, যিনি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়ে ২৬.৩.৭১ তারিখে

৪৮। এ,এস,এম, সামছুল আরেফিন- মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান পৃ-৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭	নোয়াখালী-১০ আসন, রামগঞ্জ/ লক্ষ্মীপুরের অংশ	১। ইমদাদুল হক	পি,ডি,পি
৮	নোয়াখালী-১১ আসন, লক্ষ্মীপুর/ সুধারামের অংশ	১। এ,বি,এম, মহিউদ্দিন চৌধুরী	জামাতে ইসলাম
৯	নোয়াখালী-১২ আসন, লক্ষ্মীপুর/ সুধারাম	১। ফয়েজ আহমদ	জামাতে ইসলাম
১০	নোয়াখালী-১৩ আসন, রামগতি	১। আবদুল ওয়াদুদ	জামাতে ইসলাম

এদের অনেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। যে সকল আসনে উপ-নির্বাচন হওয়ার কথা তা আর হতে পারেনি। ৬ ডিসেম্বর এক আদেশ বলে পাকিস্তান সরকার নির্বাচন স্থগিত ঘোষনা করে। ততক্ষনে নোয়াখালীর বেশীর ভাগ অংশ শত্রুমুক্ত করে মুক্তিবাহিনী স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দেয়। পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় উক্ত দোষররা পালিয়ে যায়।[৫১]

<u>ভারতের ভূমিকা</u> ঃ- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগনের সাহায্য এবং ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহনের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৭১ সনে ২৬ মার্চের পর থেকে ভারতীয় বি,এস,এফ, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আসছে এবং এই সহযোগিতা ১৫মে পর্যন্ত দেয়। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর পুনর্গঠন এবং শক্তি বৃদ্ধির পর যুদ্ধের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে সবকিছুতে ভিন্নতর সমন্বয় সাধন, প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ সেই মুহূর্তে বি, এস, এফ, এর ছিলনা। তাই ১৬মে ভারতীয় সেনাবাহিনী বি, এস, এফ, এর কাছ থেকে বাংলাদেশের অস্বাভাবিক ঘটনাবলী মোকাবিলার এবং সামরিক তৎপরতা চালাবার পূর্ন দায়িত্ব গ্রহন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা হয় এবং প্রতি মাসে ২০,০০০ (বিশ হাজার) গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে

৫১। [তথ্য সংগ্রহের সময় তাদের ভয়ে অনেকেই রাজাকারদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করতে সাহস পাচ্ছেন না। রাজাকার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একটা ভয় এখনো মানুষের মধ্যে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। সহজে কেউ রাজাকারদের নাম ঠিকানা বলতে চান না। তবু যতদুর সম্ভব রাজাকারদের নাম পাওয়া গেছে তা উল্লেখ করা হলোঃ- ১)অধ্যাপক ফজলে আজিম ২) অধ্যাপক তত্ত্বিক উল্লাহ(চৌমুহনী কলেজ) ৩) আনোয়ার হোসেন(রামগঞ্জ) ৪) আবদুল করিম উকিল(মাইজদী) ৫) চাঁদতারা মৌলভী ৬) সিরাজুল ইসলাম (চৌমুহনী) ৭) বাচচু মিয়া (সোনাপুর) ৮) এডভোকেট শামছুল আলম (রামগতি) ৯) আলী আকবর ঠিকাদার ১০) ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ খসরু ১১) মকবুল আহমদ উছুলপুরী ১২) মাহমুদ আহমেদ মোক্তার ১৩) আবদুর রশীদ জয়াগী ১৪) আনোয়ার উকিল ১৫) এডভোকেট শারু মিয়া ১৬) প্রিন্সিপাল আবদুল জব্বার(লক্ষ্মীপুর) ১৭) মোঃ হারিস মিয়া চেয়ারম্যান (লক্ষ্মীপুর) ১৮) মনিরুজ্জামান চেয়ারম্যান লক্ষ্মীপুর ১৯) মাওলানা রেহান উদ্দিন (লক্ষ্মীপুর) ২০) মাওলানা আবদুর হাই (কমান্ডার লক্ষ্মীপুর) ২১) মাওলানা নজরুল ইসলাম (কমান্ডার রায়পুর থানা) ২২)ফজলুল হক (রায়পুর) ২৩) কুনাত চৌধুরী (রায়পুর) ২৪) জাকারিয়া (রায়পুর) ২৫) হাফেজ শুক্কুর (রায়পুর) ২৬) ছালাম উল্লাহ চৌধুরী (রায়পুর) ২৭) ছফি উল্লাহ(শায়েস্তা নগর) ২৮) আনোয়ার উল্লাহ হাফেজ (রায়পুর) ২৯) সুলতান আহমেদ (ধামড়া হাফেজ) (রায়পুর) ৩০) নবী উল্লাহ (রায়পুর) ৩১) আবদুল গনি (রায়পুর) ৩২) আনোয়ার উল্লাহ (উত্তর রায়পুর) ৩৩) জিতু মিয়া চৌধুরী (রায়পুর) ৩৪) পানা মিয়া হাজী (রায়পুর) ৩৫) মিজানুর রহমান (রামগঞ্জ) ৩৬) রফিক উল্লাহ (রামগঞ্জ) ৩৭) লাল মিয়া (রামগঞ্জ) ৩৮) মনির আহমদ (গনিপুর বেগমগঞ্জ) ৩৯) থোকা মিয়া, পিতা-নাদেরুজ্জামান (হাজীপুর) ৪০) সুলতানুজ্জামান (বেগমগঞ্জ) ৪১) আবদুস সালাম, পিতা-আবদুর রশিদ (হাজীপুর, বেগমগঞ্জ) ।]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যাতে করে গেরিলাদের মোকাবিলায় পাকিস্তানি বাহিনী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যেমন চলছিল এসব পরিকল্পনা, অন্য দিকে সময়ের সাথে সাথে ভারত ও পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলে একটা অবশ্যাম্ভাবী যুদ্ধের দিকে।

সেপ্টেম্বর থেকেই ভারতে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। ডিভিশনাল এবং কোর হেড কোয়ার্টার গুলো অগ্রবর্তী স্থান সমূহে অবস্থান গ্রহন করতে থাকে। সরবরাহ ব্যবস্থা ও রণপ্রস্তুতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্ভাব্য সংঘর্ষ স্থল অভিমুখী সড়ক নির্মান, সেতুগুলির রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতের কাজ পূর্ন উদ্যমে শুরু করে। কতগুলো ইউনিট সীমান্তবর্তী ঘাটি সমূহে অবস্থান নেয়। ভূপ্রকৃতি এবং সাম্ভাব্য রণাঙ্গনের অবস্থা বিশ্লেষনসহ ব্যাপক পর্যবেক্ষণ তৎপরতা চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতগুলো গুরুত্ব পূর্ন ঘটনা ঘটে। এগুলো পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতার উপর নতুন প্রভাব বিস্তার করে। ঘটনা গুলোর একটি হচেছ ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর। চুক্তি অনুযায়ী দুদেশ কোন সংকট এবং বহিঃশত্রুর আক্রমনের মুখে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে অঙ্গীকার করে। ভারত এতদিন পর্যন্ত খুব সর্ন্তপনে ও সাবধানে এগিয়ে চলছিল। কারন পাকিস্তান সমর্থক চীনের কাছ থেকে আক্রমনের একটা ভয় ভারতের ছিল। চুক্তির পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্যের ব্যাপারে ভারতের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে যায়। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে গেরিলারা নতুন উদ্যমে পাকবাহিনীর উপর হামলা চালাতে থাকে। গেরিলাদের মধ্যে যেন নতুন করে প্রানের সঞ্চার হয়। প্রতিদিনই সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজ চলতে থাকে। প্রকাশ্য দিনের বেলাতেও হামলা ও এ্যামবুশ শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় ও পাকিস্তানিউভয় পক্ষের কামানের গর্জনে সীমান্ত এলাকা হয়ে উঠে চরম উত্তেজনাময়।

এদিকে ২৮ সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশী পাইলটরা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। গোড়াপত্তন হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। প্রায় একই সময় পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ৪৫ জন নৌসেনা নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীরও গোড়াপত্তন হয়। সেপ্টেম্বরে দুটি নৌযানও সংগ্রহ করা হয়। এম,ভি, পলাশ ও এম,ভি, পদ্মা নামের জাহাজ দুটি ছিল কলকতা বন্দর কমিশনারের। প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ করে এগুলোকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়। অক্টোবরের মধ্যে দুটো জাহাজই অভিযান শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে।[৫২]

ইতিমধ্যে ১২ অক্টোবর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষনে বাংলার অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য বরাবরের মত ভারতকে দোষারূপ করেন এবং সচেতনভাবে মুক্তিবাহিনীর কথা এড়িয়ে যান। বুঝা যাচিছল তিনি ভারত আক্রমনের একটা অযুহাত খুঁজছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটি মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করে বাংলাদেশের সমস্যা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি

৫২। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র - দশম খন্ড, পৃ-২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য দিকে ফিরানো যাবে। তার সমর অধিনায়করাও সে ধরনের একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। ২৩ অক্টোবর পাকবাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টের সম্ভাব্য রণাঙ্গন গুলোতে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

নভেম্বর নাগাদ ভারতের তিনটি কোরের অধীনে সাতটি পদাতিক ডিভিশন যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে। কুম্ভী গ্রামের ঘাটি পুনরায় চালু করা হয় এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর ইষ্টার্ন ফ্লীট সক্রিয় করা হয়। যে কোন আক্রমন প্রতিহত করার জন্য তাদের ব্যাপক পরিকল্পনা তখন চূড়ান্ত। আর এ সময়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের অভ্যান্তরে পাকবাহিনীর উপর আক্রমন শুরু করা হয়। ৪/৫ নভেম্বর থেকেই সীমিত এবং স্থানীয় পর্যায়ে হলেও ভারতীয়রা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। অর্থাৎ ৫ নভেম্বর শুরু হয়ে যায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার অঘোষিত যুদ্ধ।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান কয়েকবারই পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের আকাশসীমা লংঘন করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২১ নভেম্বর পশ্চিম বঙ্গের রানাঘাটের নিকটবর্তী ভারতীয় বয়রা গ্রামে হামলা চালায়। ট্যাংক, কামান ও জঙ্গী বিমানের সহযোগিতায় আক্রমন চালিয়ে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করে। বেশী মারা যায় বেসামরিক লোক। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রচন্ড পাল্টা আক্রমনে তারা শুধু পিছনেই হটে আসে না, ১৩টি শেফি ট্যাংক এবং ৩টি স্যাবর জেটকে এই সীমিত যুদ্ধে হারিয়ে ফিরে আসতে হয় নিজ সীমানায়। দুজন পাকিস্তানি পাইলট বন্দী হয় ভারতের হাতে।[৫৩]

এসব উস্কানিতে ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী স্থির ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বৃহৎশক্তি গুলোর মধ্যস্থতায় একটা রাজনৈতিক সমাধান। কিন্তু বৃহৎ শক্তি গুলোর পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা ও নির্লিপ্ততা এবং পাকিস্তানে উস্কানিমূলক বার বার আক্রমনে ভারতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বাড়তে থাকে। ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনী পশ্চিম দিনাজপুরের ভারতীয় শহর বালুর ঘাটের উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় এক বিগ্রেড পাকসেনা হিলিতে ভারতীয় অবস্থানের উপর আক্রমন করে। প্রথম দফায় পাকিস্তানিদের ৮০ জন সৈন্য ও ৪টি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং তাদের আক্রমন প্রতিহত হয়। ২৮ নভেম্বর পুনরায় হামলা চালানো হলে দুপক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এবার ভারতীয়রা প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে বিপুল শক্তিতে। তারা আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভিতরে কয়েক মাইল ঢুকে পড়ে। ভারত সরকার পূর্বেই তার সৈন্যদের সীমান্ত এলাকায় সীমিত আকারে অভিযান চালানোর আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশ ছিল সীমান্তের ওপার থেকে ভারতের নিরাপত্তার হুমকি দেখা দিলে সৈন্যরা তা নির্মূল করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে। ভারত শুধু তার সীমান্ত রক্ষাই নয়, প্রয়োজন দেখা দিলে সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহনের জন্যও প্রস্তুত।[৫৪]

৫৩। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র - দশম খন্ড, পৃ-৩৩।
৫৪। মেজর রফিকুল ইসলাম- লক্ষ প্রানের বিনিময়ে।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তেজনা চরমাকার ধারন করলে ১লা ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন প্রস্তাব দেন যে, ভারত এবং পাকিস্তান দুপক্ষকেই সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। ইয়াহিয়া খান বাহ্যত এ প্রস্তাবে সম্মতি জানান। অপর পক্ষে ভারত এই শর্তে সম্মত হয় যে, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ এবং এদেরকে সরিয়ে নেয়া না হলে এই অঞ্চলে শান্তি আসবে না। ২ ডিসেম্বর পাকিস্তান পুনরায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ঘনবসতিপূর্ন এলাকায় গোলাবর্ষন করে। এদিন নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতাকালে ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষনা করেন-"তথাকথিত বৃহৎ শক্তিবর্গ যেভাবে চাইবে সেভাবে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। ভারতের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে আজ আমাদের কাজ করতে হবে।"

এ অবস্থায় দুপক্ষই সৈন্য সমাবেশ এবং পুর্নবিন্যাস করতে থাকে। তৎসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থার ক্রমাবনতি এবং কোটি কোটি বাঙালীর চরম দুর্দশার প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলোর অবহেলা ও উদাসিনতা এক সংকট জনক অবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে ভারতীয় সেনা বাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টে আক্রমনাত্মক প্রতিরক্ষা এবং পূর্ব ফ্রন্টে ঝটিকা আক্রমন চালিয়ে বাংলাদেশ মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহন করে। ভারতের সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ন ভাবে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত সবমেরিন ৩১১ ফুট দীর্ঘ পি. এন. এস. গাজী এগিয়ে আসে ভারতের নৌ ঘাটি বিশাখাপত্তমের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ "ভীক্রান্তকে" টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেয়া। ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার ভারতীয় সময় বিকেল ৫ টায় ৪৭ মিনিটে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী অতর্কিতে ভারতের সাতটি বিমান ঘাটিতে এক যোগে হামলা চালায়। রাত সাড়ে আটটায় জম্মু এবং কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছাম্ব ও পুঞ্চ সেকটরে ব্যাপক আক্রমন অভিযান শুরু করে।[৫৫]

উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য ভারত সম্পূর্ন প্রস্তুত ছিল। এ দিন ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যবর্তন করে ঐ রাতেই ১২টা ৩০ মিনিটে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষনে দেশ বাসীকে চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরী হওয়ার আহবান জানালেন। ততোক্ষণে জেনারেল অরোরাও আক্রমনের নির্দেশ পেয়ে যান। ভারতীয় নৌ বাহিনী ইতিমধ্যেই সফল অভিযান শুরু করে। বিশাখা পত্তম উপকূলের মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার "আই, এন, এস, রাজপুত" পাকিস্তানি সাবমেরিন গাজীর সন্ধান পেয়ে যায়। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই রাজপুতের ডেপথ চার্জে পাকিস্তানের সাবমেরিন গাজী টুকরো টুকরো হয়ে সাগর গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একই সঙ্গে অন্য দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ইষ্টার্ণ ফ্লীটও দ্রুত লক্ষ্যস্থল অভিমুখ অগ্রসর হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো বিমান ঘাটি ও রাডার কেন্দ্রের উপর উপর্যুপরি আঘাত হেনে চলে। রাত তিনটায় ভারতীয় বিমান ঢাকা এবং কুর্মিটোলা বিমান ঘাটির উপর প্রথম হামলা শুরু করে।

৫৫। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র-১০ম খন্ড পৃ-৩২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩ ডিসেম্বরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের বাহিনী বেলুনিয়া দখল করে ফেনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিত্র বাহিনীর ঝড়ো গতির আক্রমনে ৫ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানের ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট এবং অন্যান্য বাহিনীর সৈন্যরা বেলুনিয়া, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চল থেকে পালিয়ে লাকসামের দিকে চলে যায়। ৬ ডিসেম্বর ফেনী ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পর যৌথ বাহিনীর একটা অংশ চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়, অন্য অংশ নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হয়ে ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী মুক্ত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। ১০ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী একক কমান্ডের অধীনে আসে। ইতিমধ্যে দেশের বেশীর ভাগ অংশ শত্রুমুক্ত হয় এবং মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা রাজধানীর ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৫ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। ঢাকা শহর এবং শহরের আশে পাশে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর ভারতের আর্টিলারি অবিরাম গোলাবর্ষন করে চলে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ইষ্টার্ন কমান্ডের কমান্ড এবং চীফ অব স্টাফ জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পন করতে সম্মত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানে আত্মসমর্পন দলিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে। বাঙালী জাতি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে বিজয়ের গৌরব অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি

<u>মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি</u> (মার্চ - ডিসেম্বর, ১৯৭১) ঃ- "রক্তই যদি কোন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারের মূল্য বলে বিবেচিত হয়, তবে বাংলাদেশ অনেক বেশী দাম দিয়েছে"- বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ লন্ডনের নিউটাইমস্ পত্রিকায় উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়। নয়মাসে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। বাঙালী জাতিকে চিরতরে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখার জন্য পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তি সমূহকে সম্পূর্নভাবে নির্মূল করতে চেয়েছিল। বাঙালীদের সঙ্গে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ একটা দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপরে পুরোপুরি সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে সোচচার হয়ে উঠে।

বস্তুতঃ এদেশের জীবন এবং সহায় সম্পদের উপর দিয়ে কি নিদারুন ধ্বংসলীলা বয়ে গেছে বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির তুলাদন্ডে এর কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে মাত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ রিলিফ সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ সেক্টর ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদঘাটন করেছেন।[1] পরীক্ষা মূলক প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায় বস্তুগত মূলধন ও বিষয় সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ২৭৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পরিনামে আয়ের দিক দিয়ে ক্ষতি দাড়িয়েছে ১২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ২০ বছরে নিয়োজিত মূলধন থেকে ৫% হারে যে আয় হতো তার ভিত্তিতে ক্ষতির এই হিসাব ধরা হয়েছে। এছাড়া কৃষি খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ৩৭৬ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে আমদানী ও বিতরণ ব্যবস্থা ব্যহত হওয়ার দরুন পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা বাণিজ্য খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমান প্রায় একশ কোটি টাকা। আর এসব ক্ষতির হিসাব একত্রিত করলে দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমান প্রায় ছয়শো কোটি টাকা। বলা বাহুল্য এই ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুজনিত ক্ষতি, বেবেসরকারি ঘরবাড়ি ও বিষয় সম্পদের ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও প্রান ভয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পলায়িত মানুষের মানসিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সংযুক্ত করা হয়নি। সব মিলে যে ভয়াল দৃশ্য প্রতিভাত হয়ে উঠে তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

কৃষি ছাড়া বেসরকারি খাতে বস্তুগত মূলধনের দিক দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ৯০৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ৬১০ কোটি টাকা ক্ষতি। এই ক্ষতির সাথে সরকারি খাতে নির্দিষ্ট কালের আয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি সংযুক্ত করলে নির্দিষ্ট সময়ে আয়ের ক্ষেত্রে মোট ক্ষতির পরিমান দাড়ায় ১২১০ কোটি টাকা। বস্তুগত মূলধনের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ১২৪৯ কোটি টাকা। এক নম্বর তালিকায় বস্তুগত মূলধন ও

১। মোঃ জমির ; <u>পুর্নবাসন বাংলাদেশ; প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ</u> (পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২) তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত পৃ-৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর যে শতকরা হার প্রদান করা হয়েছে তাতে সরকারি খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে। নয় মাসের ধ্বংসযজ্ঞে পরিবহন ব্যবস্থা ভীষন ভাবে বিপর্যস্ত হয়। এর পরই উল্লেখ করা যায় বৈদ্যুতিক এবং শিল্প খাতে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়। বেসরকারি খাতে ৯২৯ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সবচাইতে বেশী ক্ষতি হয় ঘরবাড়ীর। এরপর পর্যায় ক্রমিকভাবে কারিগর, ব্যবসায়ী, কৃষি, হাটবাজারের কথা উল্লেখযোগ্য। দুই নম্বর তালিকায় এসব ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১নং তালিকা

বেসরকারি খাতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব (পুর্নগঠন মূল্যের ভিত্তিতে)

১। পরিবহন	৩৮.২
২। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৭.০
৩। শিল্প	৪.২
৪। সমাজ কল্যাণ ও শ্রম	৬.৯
৫। হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট	৩.৩
৬। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	৩.৪
৭। পানি	২.৩
৮। কৃষি	২৬.২
৯। স্বাস্থ্য	২.১
১০। শিক্ষা	৪.৭

২ নং তালিকা

সরকারি খাতঃ দশলক্ষ টাকার হিসাবে

১। পরিবহন	১২২৬.৫৮
২। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২২৬.২৯
৩। শিল্প	১৩৪.৭০
৪। যোগাযোগ	৫০.৮৫
৫। সমাজ কল্যাণ	২২০.৯০
৬। হাউজিং ও সেটেলমেন্ট	১০৭.৬২
৭। জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	১০৮.২৬
৮। পানি	৭২.৬৬
৯। কৃষি	৮৪১.৯০
১০। স্বাস্থ্য	৬৮.৪৩
১১। শিক্ষা	১৪০.০০
	৩২০৮.১৯

বেসরকারি খাতঃ-

১। কৃষি	২৫০.০০
২। গৃহ নির্মান	৮২৫০.০০
৩। হাট বাজার	৩৫.০০
৪। কারিগর ব্যবসায়ী	৭৫০.০০
	৯২৮৫.০০

মোট ১২,৪৯৩.১৯

উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতির যে প্রাথমিক বিবরণ তুলে ধরা হলো তা থেকে যে কোন মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন নয় মাসের ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা অনুমান করা সম্ভব।[২]

২। মোঃ জমির ; পুর্নবাসন ও পুর্নগঠন বাংলাদেশ; তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ-৯৩-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

নয় মাসের যুদ্ধে নোয়াখালী জেলাও কম মূল্য দেয়নি। ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা হারিয়েছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। অনেকে হয়েছে সর্বশান্ত। ঘরবাড়ী, ধন সম্পত্তি ছাড়াও হারিয়েছে পরিবারের সবাইকে। অনেক পরিবার দেশ ত্যাগের পর আর কোন দিন ফিরেনি। নোয়াখালী জেলার প্রায় তিন লক্ষ লোক প্রান ভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। নিজের ধনসম্পত্তি রেখে তারা ভারতের আশ্রয় শিবিরে দীর্ঘ নয়মাস মানবেতর জীবন যাপন করে।

২৩ এপ্রিল পাক হানদারবাহিনী নোয়াখালী জেলা দখল করার পর থেকে ডিসেম্বরে বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত বহু লোককে হত্যা করে। নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের প্রত্যেকটি থানায় হানাদার বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করার পর নিরীহ জনগণকে ধরে এনে রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হতো। নোয়াখালীতে প্রথম হত্যা করা হয় আনসার এ্যাডজুট্যান্ট হাবিব উল্যাহ খানকে।[৩] পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৩ এপ্রিল ফেনীতে হত্যা করে আবদুল কাদের দরবেশকে। এর পর ধারাবাহিক ভাবে চলতেই থাকে হত্যা কান্ড। নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়। তবে ফেনী এলাকায় নিহতের সংখ্যা বেশী। কারণ এখানে বিমান হামলায় অনেক লোক নিহত হয়েছে। আগুনে পুড়ে যায় অনেক ঘরবাড়ী। এ ছাড়া যুদ্ধের তীব্রতাও ছিল ফেনীতেই বেশী। শুধু ফেনী শহরে প্রায় ৬,০০০ লোককে হত্যা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফেনী কলেজের মাঠে একটি গর্তে ২০০ টি কঙ্কাল পাওয়া যায়। ফেনীর কুটির হাটে ১১৩৪ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। এখানে একটি পুলের নীচে বহু নর কঙ্কাল পাওয়া যায়। সুলতান পুরে একটি গর্ত থেকে কয়েক শত নর কঙ্কাল পাওয়া যায়। আনন্দপুরের একটি বধ্যভূমি থেকে কয়েকশত মাথার খুলি ও হাড় পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পরও দীর্ঘ দিন দেওয়ান গঞ্জের ট্রাঙ্ক রোডের পাশে বহু নর কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। শহরের উপকণ্ঠে একটি সরকারি ভবনের বধ্যভুমি থেকে উদ্ধার করা হয় নর কঙ্কাল। ধুমঘাট রেলওয়ে পুলের কাছে বহু লোককে হত্যা করে নদীতে ফেলে রাখা হয়। ধুম এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ ৩০০ লোককে হত্যা করে পাকবাহিনী। মে মাসে ফেনী রেলস্টেশনের পেছনের ডোবায় বহু লোককে হত্যা করা হয়। জোয়ার কাছাড় গ্রামের ৪৯ জন নারী পুরুষকে একইভাবে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ১৯ জনের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেনঃ- মমিনুল হক, তারিকুন নেছা, আমিনুল হক, আবুল খায়ের, হোসনে আরা বেগম, মোহসেন বেগম, হাজেরা খাতুন, সুলতান আহমদ, সুজা মিয়া, মকবুল, অহিদুর রহমান, আবদুল গফুর, ওবায়দুল হক, আমিনুল হক, শামসুল হক, আবদুস সালাম, ইয়াকুব আলী, আবদুল বারিক, জুলেখা খাতুন।[৪] পাকবাহিনী এছাড়াও রাজাকারদের সহযোগিতায় ধর্মপুর, জোয়ার কাছাড়, মঠবাড়িয়া, পদুয়া ও মজলিশপুর গ্রামে ব্যাপক ক্ষতি করে। ছাগল নাইয়ার বল্লবপুর হাইস্কুলের ২৫ টি গর্তে প্রায় ১৫০ জনকে হত্যা করে মাটি চাপা দেয়া হয়।

নোয়াখালীতে পাকবাহিনীর এক একটি ক্যাম্প ছিল যেন বধ্য ভুমি। সেখানে শত শত নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করা হত। ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ মাইজদী কোর্ট স্টেশন এবং ম্যালেরিয়া অফিস ঘেরাও করে প্রায় ১৩০ জন লোককে গ্রেফতার করে চৌমুহনীর টেকনিক্যাল স্কুলের হানাদারদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

৩। সাক্ষাতকার -মনযুর-উল- করিম (তৎকালীন জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী)

৪। আবু মোঃ দেলওয়ার হোসেন- মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, পৃ-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে কাদির হানিফ গ্রামের তাজুল ইসলামসহ সকলকে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করা হয়। একই দিনে ফেনা ঘাটার পশ্চিমে জয় নারায়নপুরের-(১) আবদুল হাই পাটওয়ারী (২) ডাঃ সুলতান আহমদ (৩) আনসার আলী ও (৪) এবাদ উল্যাহ এই চার জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ছাড়াও জগদিশপুর গ্রামের তেলি বাড়ীর দুইজন নিরীহ হিন্দু লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

৬ মে হানাদারবাহিনী চন্দ্রগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুর মিয়া মুন্সী, ছৈয়দ মিয়া ব্যাপারী, মোহাম্মদ উল্লাহসহ মোট ৩৮ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ১৮ মে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার আলাইয়ারপুর ইউনিয়নের মীর পাড়া গ্রামের বিশিষ্ট কৃষক নেতা রুহুল আমিনকে গুলি করে ওয়াপদার খালে ফেলে দেয়। তার নামে চন্দ্রগঞ্জে বাজারের পূর্বদিকে একটি বাজারের নাম আমিন বাজার নাম করণ করা হয়েছে। মে মাসের ২৬ তারিখে পাকবাহিনী নাওতোলা, কাড়ার পাড়, সোনাইমুড়ী ও বাট্টা গ্রাম আক্রমন করে ১২৬ জন নিরীহ লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে ফজল করিম, হাজী দেলু মিয়া, আবদুল হাকিম, আবদুল কাইয়ুম, হরিঠাকুর, আবদুল গফুর, নুরুল ইসলাম, লনি মিয়া, আবদুল মালেক, মরন চন্দ্র, রফিক উল্লাহ, হোসেন আহমদ ও হরি ঠাকুরের স্ত্রী উল্লেখযোগ্য।

১৫ জুন ১৯৭১ পাক হানাদারবাহিনী, রাজাকার, আলবদর, ও স্বাধীনতা বিরোধীদের চক্রান্তে নোয়াখালীর সোনাপুর ও শ্রীপুর গ্রামে হামলা চালিয়ে প্রায় শতাধিক লোককে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে, আবদুল কাদের পিতা মৃত-দুলা মিয়া, আবু তাহের পিতা মৃত-আবদুল কাদের, আক্কাছ মিয়া, খবির চাপরাশি, তাহের আমিন পিতা মৃতঃ খবির চাপরাশি, মোঃ কাইয়ুম পিতা মৃত-নজির কনষ্টেবল, আবদুর রব মাঝি পিতা মৃতঃ আবদুল গফুর, খবির মিয়া, আবুল খায়ের, বাচচু মিয়া পিতা-আবদুর রশিদ, আবদুল কাদির কনষ্টেবল পিতা মৃত-কেরামত আলী অন্যতম। পাকবাহিনী হরিনারায়নপুর পূর্ব বাজার থেকে চিত্ত সাহা, পরিমল সাহা, ও সুলতান মাঝিকে ধরে গলায় রশি লাগিয়ে জীপের পিছনে বেধে পি, টি, আই, পর্যন্ত টেনে আনে। পথে সকলেই মারা যায়। এছাড়া আজিজ উল্লাহ হাওলাদার পিতা মৃত-কেরামত আলী, গ্রাম-সোনাপুর, মুন্সী মিয়া পিতা মৃত-চৌধুরী সওদাগর, গ্রাম-করিমপুরসহ মোট ৬৮ জনকে নোয়াখালী আহমদিয়া হাই স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বের মাঠে হত্যা করা হয়।

১৯ আগষ্ট পাকবাহিনী গোপালপুর বাজার আক্রমন করে ২৪ জন লোককে লাইনে দাঁড় করে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। নিহতরা হলেনঃ-মাহবুবুল হায়দার চৌধুরী (নসু) মিয়া, দীন ইসলাম গ্রাম-তুলাচারা, হাবীশশর উল্যাহ গ্রাম-তুলাচারা, মোঃ ইসমাইল মিয়া গ্রাম-তুলাচারা, আহাম্মদ উল্লাহ গ্রাম- সাহাজাদপুর, মোহাম্মদ উল্লাহ, দুলাল মিয়া, শামছুল হক মাষ্টার, মজিব উল্লাহ, বশির উল্লাহ এদের গ্রাম-সাহাজাদপুর, আবুল কাশেম গ্রাম-মির্জানগর, আবু বকর সিদ্দিক গ্রাম-মির্জানগর, হারিছ মিয়া গ্রাম-দেবকালা, মোঃ ছিদ্দিক উল্লাহ গ্রাম-সিরাজ উদ্দিনপুর, মমিন উল্যাহ, মমতাজ মিয়া, নুর মোহাম্মদ, আবদুল মান্নান- এদের গ্রাম-সিরাজ উদ্দিনপুর, মোবারক উল্লাহ গ্রাম-পানুয়া পাড়া, আবদুর রশিদ গ্রাম-আমিরাবাদ, আবদুস সাত্তার গ্রাম-বারাহী নগর, আবদুল করিম গ্রাম-শ্রীপুর, মোহাম্মদ উল্যাহ দর্জি গ্রাম-চান্দ কাশিমপুর, ডাঃ সুজায়েত উল্লাহ গ্রাম-দশ ঘরিয়া।[৫] উক্ত শহীদদের নামে গোপালপুর বাজার পোষ্ট অফিসের সামনে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মান করা হয়। প্রত্যেক শহীদদের নাম উক্ত স্মৃতিসৌধে খোদাই করা আছে।

৫। স্থানীয় জনতা ক্লাব নির্মিত স্মৃতি সৌধ ফলক।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকহানাদার বাহিনী তাদের সহযোগিরা রামহরি তালুক ঘেরাও করে প্রায় শতাধিক লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে মমিন উল্লাহ পিতা- হাজী ফতে আলী, নুরুদ্দিন পিতা- আমিন মিয়া, শাহাব উদ্দিন পিতা-অজ্ঞাত, আনা মিয়া, সফিক উল্লাহ পিতা- আনার উল্লাহ, হেজু মিয়া পিতা- হারিছ মিয়া, ছেরাজুল হক, পিতা-রাজা মিয়া, জুলফিকার আলী পিতা- এছাক মিয়া, রমজান আলী পিতা- অজ্ঞাত উল্লেখযোগ্য। ১৩ তারিখে দেবীপুর পুলের উপর আলী আহাম্মদ পিতা-নছির মাঝি ও ছাদু মাঝিকে গুলি করে হত্যা করে। ২৭ তারিখে হানাদারবাহিনী মুক্তিযোদ্ধা সবুজ, রবি, গোলাম হায়দার, সফিকুর রহমানকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে মাইজদী হাসপাতালের পূর্ব পাশে এক সঙ্গে গণকবর দেয়। হাসপাতালের পাশে নগেন্দ্র শূর উকিল (রায় বাহাদুর) ও মানিক লাল চৌধুরীসহ ১৩ জনকে একই দিনে হানাদারবাহিনী গুলি করে হত্যা করে এবং গণ কবর দেয়। এছাড়া নোয়াখালী জেলার প্রত্যেকটি থানায় যেমনঃ- বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ ও সুধারাম থানায় যে সমস্ত ক্যাম্প ছিল সেখানে ও তার আশে পাশে বহু নিরীহ লোককে হত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া হয় যাদের খোজ আজও জানা যায়নি।

লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে পাকহানাদার বাহিনীর চাইতে রাজাকার, আলবদর ও এদেশীয় সহযোগীগণ বেশী লোককে নির্যাতন ও হত্যা করে। ব্যক্তিগত শত্রুতা, সম্পত্তি দখল ও টাকা পয়সার জন্য তারা বিভিন্ন এলাকর নিরীহ লোকদের ধরে নিয়ে কাউকে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিত, আবার অনেককে হত্যা করত। বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানা সংলগ্ন মার্চেন্টস্ একাডেমী হাই স্কুল, রায়পুর এল, এম, হাই স্কুল ও রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় রাজাকার ক্যাম্প ছিল। এখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা থাকত না বা থাকলেও দু একজন কমান্ডার হিসাবে থাকত। কারণ নোয়াখালী জেলার পশ্চিমাঞ্চল যুদ্ধের কৌশল গত কারণে কম গুরুত্বপূর্ন ছিল তাদের কাছে। তাই এসব এলাকায় রাজাকারদের আধিপত্য ছিল প্রায় একছেটিয়া। ফলে এখানকার রাজাকাররা বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন ধরে নিয়ে আসত এবং ক্যাম্পে নির্যাতন করত। অনেককে নির্যাতনের পর রাতের বেলায় রায়পুর বাজারের পশ্চিম পাশে ডাকাতিয়া নদীর কাঠের সেতুর উপর নিয়ে গুলি করে নদীতে ফেলে দেয়া হতো। নদীর তীরের অধিবাসীরা নয়মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে বহু লাশ নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখেছে। অনেক লাশ কুকুর ও শিয়াল টেনে উপরে তুলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ডাকাতিয়া নদী থেকে কয়েকশত কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। এল, এম, হাই স্কুলের উত্তর পাশের পুকুর থেকেও অনেক নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও অনেক লোককে হত্যা করে তাদের লাশ আত্মীয় স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এদের মধ্যে মার্চেন্টস্ একাডেমী হাইস্কুল মাঠে প্রাকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হয় হাজী ইমান হক ব্যাপারী পিতা মৃত- আলী আকবর মাঝি, গ্রামা-সোনাপুর, কে। এছাড়া সফর আলী (বৈরাগী বাড়ী) গ্রাম-চরবগা, কালু মিয়া ছৈয়াল গ্রাম- কেরোয়া, নুরুল হক, দেলওয়ার হোসেন (দিলা) সহ অনেককে হত্যা করা হয়। রায়পুরের এদেশীয় সহযোগী কমান্ডার মাওলানা নজরুল ইসলাম পিতা- মাওলানা আমজাদ হোসেন গ্রাম- দেবীপুর (মনু মিয়া পাটওয়ারী বাড়ী) কে মুক্তিবাহিনী বন্দী করলে সে স্বীকার করে যে রায়পুরে রাজাকার বাহিনী মোট ৯৭৫ জনকে হত্যা করছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরে সার্ভে করে ১২৬ জনের তালিকা পাওয়া যায়। বাকীদের হয়ত বাসষ্টেশন অথবা লঞ্চষ্টেশন থেকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করেছে। যাদের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশই ছির রায়পুরের বাহিরের লোক।[৬] পূর্ব শত্রুতার জের ধরে রায়পুর ৪নং সোনাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তহির উদ্দিন চৌধুরীর সহযোগিতায় রাখালিয়া বাজারের পাশে রাজাকাররা প্রকাশ্য দিবালোকে ধান ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে হুরুডিয়া বাড়ীর ১৫/২০ জন কৃষককে হত্যা করে। রামগঞ্জ থানায়ও অনেক লোককে হত্যা করা হয়। রামগঞ্জ এম, ইউ, সরকারি হাই স্কুলে রাজাকার বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। স্কুলের দক্ষিণ পাশের পুকুর থেকে প্রায় শতাধিক নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয় স্বাধীনতার পরে। রামগঞ্জ ও বর্তমান চাটখিল থানায় (পূর্বে রামগঞ্জ থানার অংশ ছিল) প্রচুর লোককে হত্যা করা হয়। জয়পুরা, ফতেহপুর, দশঘরিয়া, পানিওয়ালা, কালীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর লোককে হত্যা করে। লক্ষ্মীপুর সদর থানা এবং রামগতি থানায় ও গণহত্যা চালায় রাজাকাররা। লক্ষ্মীপুরে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ- শশীভূষন পাল, পিতা-রাজমোহন পাল, সেকান্দার মিয়া পিতা-হাজী ইলিয়াছ, মজিব উল্লাহ পিতা- আহমদ উল্যাহ, নুর মিয়া মুন্সী পিতা- মহব্বত আলী, সফিকুল্লাহ মুন্সী পিতা-মৃতঃ ছালামত উল্লাহ, রহমত উল্লাহ পিতা- নুর মিয়া মুন্সী, মুখলেছুর রহমান পিতা-মহব্বত আলী, জাফর আহমদ পিতা-এমরান আলী, আবু তাহের পিতা-ওবাদুল্লাহ, করপুন নেছা স্বামী- আঃ মান্নান, নজির আহমদ পিতা- আঃ হাকিম, শামসুল হক পিতা- সুজা মিয়া, খলিল পিতা- হাবিবুল্লাহ, আবদুর রহমান পাটওয়ারী পিতা- বজলুর রহমান, দালাল বাজারের এক হিন্দু বাড়ীর যাদব চন্দ্র নাথ, রমেশ চন্দ্র নাথ, প্রফুল্ল চন্দ্র নাথ, হারাধন চন্দ্র নাথ, উমেশ চন্দ্র দাস, রাজ বিহারী নাথ এবং মোশাররফ হোসেন ভুইয়া।

গণহত্যার পাশাপাশি নোয়াখালী জেলায় পাক হানাদারবাহিনী বহু হাট বাজার, দোকান পাট ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। ২৩ এপ্রিল নোয়াখালীতে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি সৈন্যরা চৌমুহনী বাজারে ফেনী রোডের পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় শতাধিক দোকানে অগ্নি সংযোগ করে। মূল সড়কের পার্শ্ববর্তী উক্ত দোকান গুলোর মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল বিভিন্ন পন্যের পাইকারী দোকান। তৎকালীন বাজার মূল্যে এই সকল দোকানে ক্ষতির পরিমান আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ১লা মে বগাদিয়ায় কয়েকটি বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। বাড়ী গুলির বেশীর ভাগ ছিল টিনের তৈরী। ঘরে রাখা বিভিন্ন মালামালসহ ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ৬মে চন্দ্রগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর মুক্তিবাহিনী চন্দ্রগঞ্জ বাজারে অগ্নি সংযোগ করে। এখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় এক লক্ষ টাকা। একই সময়ে পাকবাহিনী চন্দ্রগঞ্জ বাজারের পাশের ১৭ টি বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। এই বাড়ী গুলির ক্ষতির পরিমান প্রায় আট লক্ষ টাকা। ১১ মে মীরগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর হাতে বিপর্যস্ত হওয়ার পর পাকবাহিনী পরের দিন এসে ৪টি বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। এই ৪টি বাড়ীর ক্ষতির পরিমান প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ১২ মে মান্দারহাট বাজার জ্বালিয়ে দেয়। এখানে ক্ষতির পরিমান প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। ১৪ মে দোয়াইরা গ্রামে অগ্নি সংযোগ করে পাকবাহিনী। এই গ্রামে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। একই দিনে জয়নারায়নপুর গ্রামে ১৯টি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এই ১৯টি বাড়ীর ক্ষতির পরিমান প্রায় সাত লক্ষ টাকা। ২১ মে আমিন বাজারের পাশে ৩টি বাড়ীতে আগুন দেয় হানাদারবাহিনী। এই তিনটি বাড়ীতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এক লক্ষ আশি হাজার টাকা। ২৬ মে সোনাইমুড়ী ও বাস্তা গ্রামে বহু বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এই দুটি গ্রামে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় পনর লক্ষ টাকা।

৬। সাক্ষাতকার ; মাওলানা ছায়েফুল আলম ইত্তেহাদী ; তৎকালীন সভাপতি রায়পুর থানা আঃ লীগ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ জুন নোয়াখালীর বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা মালেক কমিশনারের বাড়ীসহ মোট ২৩টি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। এই ২৩টি বাড়ীতে ঘর এবং মালামালসহ ক্ষতির পরিমান প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা। গোপালপুর বাজার ও রায়পুর বাজারের হিন্দুদের ৮/৯ টি দোকনে অগ্নি সংযোগ করে। এই দোকান গুলোতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় দশ লক্ষ টাকা। রায়পুর বাজার সংলগ্ন রায় বাহাদুর বাড়ী ও গোপাল বাড়ী সম্পূর্ন জ্বালিয়ে দেয়। এর মধ্যে রায় বাহাদুর (জমিদার) বাড়ীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা এবং গোপাল বাড়ীর ক্ষতি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। তারা লক্ষ্মীপুরের দালাল বাজারের আটটি হিন্দু বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। এই বাড়ী গুলির ক্ষতির পরিমান প্রায় তিন লক্ষ টাকা। রামগঞ্জ বাজার, মীরগঞ্জ বাজার, কাজির দিঘিরপাড় বাজার, ভবানীগঞ্জ, রামগতি, মান্দারী বাজারেও অগ্নি সংযোগ করে। এই বাজার গুলির ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় দশ লক্ষ টাকা। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমান প্রায় এক কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার টাকা। ক্ষয়ক্ষতির এই হিসাব আংশিক।

পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালী জেলায়। সড়ক পথে এবং রেলপথে পাকবাহিনীর চলাচল ও সরবরাহ বন্ধ করার জন্য মুক্তিবাহিনী ছোট বড় অসংখ্য সেতু ধ্বংস করে। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর অদূরে শুভপুর সেতু, ফেনী-লাকসাম রেলওয়ে সড়কের বড়সেতু, পরিকোট সেতু, লক্ষ্মীপুরের বাগবাড়ীর নিকট মাদামের সেতু, মান্দারী বাজার সেতু, চন্দ্রগঞ্জ সেতু, নোয়াখালীর শাহেবজাদা সেতু, রামগঞ্জ জেলা কাউন্সিল সেতু, সম্পূর্নভাবে ধ্বংস করা হয়। লাকসাম- নোয়াখালী সড়কের দৌলতগঞ্জ সেতু, গুমদন্ডী রেললাইন, কালামোড়া সেতুসহ ছোট বড় মিলে চল্লিশের অধিক সেতু ধ্বংস করা হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কম নয়। কারণ হানাদারবাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাকা দালান গুলো তাদের ঘাটি হিসাবে বেছে নিয়েছে। ফলে নোয়াখালীর বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল পাকবাহিনীর ঘাটি। হাইস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোই ছিল বেশীর ভাগ শত্রু ঘাটি। যে কারণে যুদ্ধচলাকালীন আক্রমন- পাল্টা আক্রমনে গোলার আঘাতে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। স্কুলের যাবতীয় আসবাবপত্র, গ্রন্থাগারের বইপত্র, ছাত্রদের খেলার সরঞ্জামাদি ও বিজ্ঞানগারের যন্ত্রপাতিতে অগ্নিসংযোগ করে এবং লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

নোয়াখালীতে অসংখ্য বীর সন্তান সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এই সমস্ত বীর শহীদদের পূনাঙ্গ তালিকা আজো তৈরী করা সম্ভব না হলেও যতটুকু পাওয়া গেছে তা থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

<u>ফেনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা</u> ঃ- মেজর খালেক, মেজর রেজাউর রহমান, মেজর ডাঃ বদিউল আলম, সিপাহী শাহাবুদ্দিন, সিপাহী মোহাম্মদ মোশাররফ, বরকত উল্লাহ, শামসুল হক, আবদুর রশিদ, কবির আহমদ চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, মাষ্টার নুর আহম্মদ, আলী হোসেন, আইয়ুব আলী, মাওলানা সৈয়দ ওয়ায়েজ উদ্দিন, ক্যাপ্টন সালাহ উদ্দিন মমতাজ, আবদুল গফুর, আবুল বাশার, এয়ার আহমদ, গোলাম রহমান, নাছির আহমদ, নুরুল ইসলাম, মাহবুবুল হক (দুলাল), মোশাররফ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, মোঃ শাহাবুদ্দিন।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্মীপুরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাঃ-

নাম	গ্রাম	থানা
শহীদ আবু ছায়েদ	সোনাপুর	লক্ষ্মীপুর
শহীদ আবদুল হালিম (বাসু)	ভাঙ্গা খা	
শহীদ রবীন্দ্র কুমার সাহা	ভবানী গঞ্জ	
শহীদ মাজহারুল মনির (সবুজ)	আলীপুর	
শহীদ মুনছুর আহমদ	ছবিলপুর	
শহীদ চাঁদ মিয়া --	আলীপুর	
শহীদ আলী আজম	নন্দনপুর	
শহীদ নায়েক আবুল হাসেম	সমাসপুর	
শহীদ লোকমান মিয়া	জমিরতলী	
শহীদ মোঃ মোস্তাফা মিয়া	ঐ	
শহীদ জয়নাল আবদিন	চররুহিতা	
শহীদ নুর মোহাম্মদ	বড়ালিয়া	
শহীদ মোহাম্মদ হোসেন	ফতেধর্মপুর	
শহীদ এম,এম, কামাল	পালপাড়া	
শহীদ আবদুল বারিক	নর সিংহপুর	
শহীদ রুহুল আমিন	আটিয়াতলী	
শহীদ জহিরুল ইসলাম	সৈয়দপুর	
শহীদ আবুল খায়ের	বাঞ্ছানগর	
শহীদ আহাম্মদ উল্লাহ	উষিয়াকান্দি	
শহীদ আবদুল হাই	রোকনপুর	
শহীদ সিরাজ উল্লাহ	উষিয়াকান্দি	
শহীদ মমিন উল্লাহ	রোকনপুর	
শহীদ আবদুল মতিন	ভাঙ্গাখা	
শহীদ মোস্তাফিজুর রহমান	তোরাবগঞ্জ	রামগতি
শহীদ আলী আহাম্মদ	ঐ	
শহীদ বেনু মজুমদার	চর জাঙ্গালিয়া	
শহীদ মোঃ আতিক উল্লাহ	কেরোয়া	রায়পুর
শহীদ মোঃ মোস্তফা	উত্তর কেরোয়া	
শহীদ আবদুল্লাহ	কেরোয়া	
শহীদ আবুল খায়ের (বুতা)	চরমোহনা	
শহীদ ইসমাইল মিয়া	উত্তর সাগরদি	
শহীদ সাহাদুল্লাহ মেম্বর	চর পাঙ্গামিয়া	
শহীদ আবুল কালাম	উত্তরসাইচা	
শহীদ নজরুল ইসলাম	মাঝিরগাও	রামগঞ্জ
শহীদ আবদুর রশিদ	কাঞ্চনপুর	

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ- শহীদ সালেহ আহমদ মজুমদার, আবদুর রব বাবু, আবু নাসের, মোঃ ইসমাইল, মোস্তাফা কামাল পাশা, আমান উল্লাহ ফারুক, অহিদুর রহমান অদুদ, অজয় চক্রবর্তী, মোঃ সেলিম, রুহুল আমিন খান, আবুল হাসেম, মোঃ ইসমাইল, গোলাম মোস্তফা, নজির হোসেন, মোঃ সফি, অজি উল্লাহ মিয়া, ও মোঃ মোস্তফা মাষ্টার।

নারী নির্যাতন ঃ- ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষন, গ্রেফতারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে যে বরবরতম অপারেশন শুরু করে তার তান্ডব দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সারা দেশে, এমনকি গ্রাম বাংলার প্রত্যান্ত অঞ্চল পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের যে সব রাজনৈতিক সংগঠন সচেতন ভাবে এ ব্যাপারে পাকিস্তানিদের সহায়তা করে তাঁর মধ্যে জামাতে ইসলাম, ইসলামী ছাত্র সংঘ, মুসলিম লীগ, পি,ডি,পি, প্রভৃতি দল ও তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ এবং শান্তি কমিটি ছিল অন্যতম।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় সহযোগিরা গ্রাম বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবতী মেয়ে ও মহিলাদের নিয়মিত ধরে আনত। যে সকল বাঙালী যুবতী তাদের পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করতো, তৎক্ষনাৎ সেনারা তাদের চুল ধরে টেনে এনে নির্যাতন করত, তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসাররাও মদ খেয়ে হিংস্র জানোয়ারের মতো মেয়েদের ধর্ষন করতো। কাউকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেয়া হয়নি, উপযুপরি ধর্ষন ও অবিরাম অত্যাচারে বহু যুবতী সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পরের দিন এদের লাশ অন্যান্য জীবিত মেয়েদের সামনে ছুরি দিয়ে কেটে কুটিকুটি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দেয়া হয়েছে।[১] সারা দেশেই মুক্তিযুদ্ধের সময় কালীন নয়মাস এই নির্যাতন চলেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর এ সকল অপকর্মকে বৈধতা দেয়ার জন্য এসময় এক শ্রেনীর মৌলভীরা একটি ফতুয়া দেয়। ধর্মযুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের ধনসম্পদ এবং স্ত্রী-সন্তানদের "গনিমতের মাল" হিসাবে ভোগ দখলের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত ছিল। সেটার অপব্যাখ্যা করে এ দেশীয় সহযোগিরা পাকিস্তানিদের ঘৃন্য অপকর্মের সমর্থন করে।

নোয়াখালীতেও অসংখ্য নারী এই ফতুয়ার শিকার হয়ে দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য হারিয়েছে তাদের সর্বোচচ সম্মান। নর পশুর ন্যায় নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেও অনেককে হত্যা করেছে। অনেকে শত নির্যাতনের চিহ্ন বুকে নিয়ে আজও কালের স্বাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। এমনি কয়েকটি ঘটনা ঃ-

(এক) নূর জাহান বেগম (পূর্ব চর চান্দিয়া, সোনাগাজী) জানায় ঃ ২৫ অক্টোবর কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের গ্রামে তল্লাশী চালায়। তারা মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের খুজে বেড়াচিছল। আমি ঘরের চৌকির নীচে পালিয়ে ছিলাম। ঘর খোঁজার পর তারা আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এবং টেনে বের করে। আমার বাবা-মা তাদের পায়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তাদের জোর করে ঘর থেকে বের করে দরজা আটকিয়ে দেয়। আমি তাদের লাথি মেরে ফেলে দেই।

Dhaka University Institutional Repository

পরে আমার উপর নির্মমভাবে পাশবিক নির্যাতন চালায়। এই ভাবে একে একে তিনজন পাকসেনা আমার উপর অত্যাচার চালায়। যে কয়জন রাজাকার অত্যাচারে ওদের সাথে অংশ নেয়, তার মধ্যে একজন ছিল আমার চেনা।[৮]

(দুই) আবদুল মোমেন (প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ বল্লভপুর উচ্চবিদ্যালয়, ছাগল নাইয়া) বলেনঃ ১৮ সেপ্টেম্বর আমি নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে হঠাৎ দেখি পাকিস্তানি সেনা আসছে। আমি আত্মগোপন করি। এ সময় দেখি পাকসেনারা আমাদের গ্রাম থেকে তিন জন যুবতী মেয়েকে বন্দী করে শিবিরের দিকে নিয়ে যাচেছ।

(তিন) আহছান উল্লাহ (গ্রাম-দেনাতপুর, থানা-রায়পুর) বলেনঃ মে মাসের প্রথমে পাকবাহিনী বিনা বাধায় রায়পুর দখল করে বাজারের অনতিদূরে একটি হিন্দু অর্ধিষ্ণু গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও দুজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করে। কয়েক দিন পর আবার রায়পুর থানায় এসে শিবির স্থাপন করে এবং শুরু হয় নারী নির্যাতন ও দৈহিক পীড়ন। পাকবাহিনী স্থানীয় জামাতে ইসলাম ও মুসলিম লীগ সমর্থিত কর্মীদের সহায়তায় আওয়ামী লীগকর্মী ও হিন্দুদের বাড়ী ঘর লুন্ঠন ও অগ্নি সংযোগ করে। রাতের অন্ধকারে বাড়ীতে হানা দিয়ে মা-বোনদের উপর নৃশংস অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে এই এলাকায় অসংখ্য মা-বোনের সতীত্ব নষ্ট হয়। মে মাসের শেষের দিকে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা দেনাতপুর গ্রাম আক্রমন করে। প্রতিটি বাড়ী তল্লাশি করে যুবকদের হত্যা করে এবং মা-বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। আমার বাড়ীতে তল্লাশি করে আমাকে না পেয়ে আমার স্ত্রী আরমার নেছা বেগমের উপর অত্যাচার করে। সে সময় আমার স্ত্রী সাতমাসের গর্ভবতী ছিলেন। তাহাদের অত্যাচারে আমার স্ত্রী আরমার নেছা ঘটনা স্থলেই শাহাদাৎ বরণ করেন। এ ভাবে এলাকায় বহু নারী হানাদারদের অত্যাচারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(চার) হাবিবুর রহমান (গ্রাম-মনিপুর, থানা-পরশুরাম) বলেনঃ জুলাই মাসের ১৫ তারিখে একদল পাকিস্তানি সেনা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মনিপুর গ্রামে আক্রমন চালায়। আক্রমনের শুরুতে মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধের চেষ্টা করে পাল্টা আক্রমন চালায়। কিন্তু পাকবাহিনীর তীব্র আক্রমনে মুক্তিবাহিনী পিছু হটে ভারতের রাজনগর শিবিরে আশ্রয় নেয়। ক্রুদ্ধ পাববাহিনী স্থানীয় বিশিষ্ট আওয়ামী লীগকর্মী আমান উল্লাহর বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে। পাকবাহিনীর ভয়ে গ্রামের পাঁচ জন সুন্দরী রমনী আমার বাস গৃহে আত্মগোপন করে ছিল। পাকবাহিনী তল্লাশি চালিয়ে তাহাদিগকে ধানের গোলার নীচে ও ঘরের কারের (চাঙের) উপর হইতে জোর পূর্বক টেনে বের করে। পাকসৈন্যরা সংখ্যায় ছিল বার জন। তাহারা উক্ত রমনীদের উপর দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা যাবত অতি বর্বরোচিত অত্যাচার চালায়। তাহাদের অত্যাচারে সকলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে পাকবাহিনী পরশুরামে ফিরে আসে। পাকবাহিনী চলে যাওয়ার পর স্থানীয় জনসাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রুশার মাধ্যমে রমনীদের জ্ঞান ফিরাইয়া আনে[৯]।

৭। মোহাম্মদ হাননান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পৃ-৪৪৪।
৮। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র- অষ্টম খন্ড পৃ-৩১২।
৯। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, অষ্টম খন্ড, পৃ-৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মত্যাগ

দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে নোয়াখালী জেলার যে বীর সন্তানদের হারিয়েছে তাদের কয়েকজন ঃ-

১। **বীর শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিনঃ**- মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের অগনিত শহীদদের মধ্য থেকে যে সাত জন শহীদ যোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, মরনোত্তর সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালীর গৌরব শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ১৯৩৪ সনে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাগপাছরা গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আযহার মিয়া ও মাতার নাম মোছাম্মত জুলেখা খাতুন। তিনি ১৯৪৯ সনে সোনাইমুড়ী হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫১ সনে তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে একজন নাবিক হিসাবে যোগদান করেন। দায়িত্ব পালনে তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন। কর্মজীবনে পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজ পি.এন.এস, বাবর, পি.এন.এস. খাইবার ও পি.এন.এস. তুঘরল এ দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। কর্তব্য কর্মে সমানুবর্তিতা, দায়িত্ব বোধের যে রেকর্ড তিনি স্থাপন করেন তাতে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্টেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করার সুযোগ দেন। ১৯৭১ সনের মহান স্বাধীনত যুদ্ধের সময় তিনি চট্টগ্রাম নৌঘাটির অধীনে পি.এন.এস. কুমিল্লা গানবোটে আর, এ-১ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২৫ মার্চের কালো রাতে ঘুমন্ত বাঙালী জাতির উপর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হামলার পর রুহুল আমিন কর্মস্থল ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে ভারত থেকে প্রাপ্ত নৌজাহাজ বি.এন.এস, পলাশ-এ যোগ দেন। এর পর তিনি বি.এন.এস. পদ্মা নৌজাহাজের স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার-এর দায়িত্ব পালন করেন। এ জাহাজেই দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে ১৯৭১ সনের ১০ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর বিমান হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর অসম সাহসিকতা, দক্ষতা ও রণ চাতুর্য সর্বোপরি স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ইতিহাসে বীর শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। নোয়াখালীবাসী তাঁর আত্মত্যাগে গর্বিত।

২। **ক্যাপ্টেন সালাহ উদ্দিন মমতাজ** ঃ- ক্যাপ্টেন সালাহ উদ্দিন মমতাজ ফেনীর ছাড়িপুর গ্রামের অধিবাসী। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন। ময়মনসিংহের কামালপুর সীমান্তে তাঁকে ডেল্টা কোম্পানীর অফিসার নিয়োগ করা হয়। ৩০/৩১ জুলাই তারিখে সম্মুখ যুদ্ধে পাকবাহিনী রনেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মমতাজ পলায়নরত শত্রু সেনাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং শত্রুর মাইন বিস্ফোরণে শহীদ হন। তাঁকে মরনোত্তর মেজর এবং বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **শহীদ রুহুল আমিন বীর উত্তম** ঃ- শহীদ রুহুল আমিন নোয়াখালী জেলার বর্তমান চাটখিল (সাবেক রামগঞ্জ) থানার সিংবাহুড়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। লেখাপড়া শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেডিকেলকোরে যোগদান করেন। ১৯৭১ সনে তিনি সেনাবাহিনীর হাবিলদার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ছুটিতে থাকা কালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজেই যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষন দিতে শুরু করেন এবং শত্রুদের প্রতিরোধ করেন। রামগঞ্জ থানার আঙ্গরা পাড়াতে তাজের বাড়ীতে বিকেল দুটায় শত্রুর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। স্বাধীনতার পর সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করেন।

৪। **জহির রায়হান** ঃ- বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চলচিত্রকার জহির রায়হান বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ফেনীর মজুপুর গ্রামে ১৯৩২ সনের ৫ আগষ্ট এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তিনি ১৯৫০ সনে আমিরাবাদ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৩ সতে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই,এস,সি এবং ১৯৫৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ, পাশ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। তাঁর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের ছবি "স্টপ জেনোসাইড" আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে প্রভূত অবদান রাখে। স্বাধীনতার পর তাঁর অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার কে খুজতে গিয়ে মিরপুরে বিহারীদের গুলিতে তিনি শহীদ হন।

৫। **শহীদুল্লাহ কায়সার** ঃ- শহীদ বুদ্ধিজীবি শহীদুল্লাহ কায়সার ১৯২৬ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী ফেনীর মজুপুর গ্রামে এক সম্ভান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ১৯৪৬ সনে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯৪৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম,এ, পাশ করেন। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন এবং বিভিন্ন নির্যাতন ও কারাবরণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর তাঁকে আলবদর নেতা খালেক মজুমদার তাঁর কায়েতটুলীর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে তাঁর আর কোন খোজ পাওয়া যায়নি।

৬। **সেলিনা পারভীন** ঃ- শহীদ বুদ্ধিজীবি সেলিনা পারভীন ১৯৩১ সনে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার কল্যান নগর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ফেনী শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার পরিবার শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারেননি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে ব্যর্থ হলেও সেনিনা পারভীন স্বশিক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। চাকুরী গ্রহন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের মেট্রন হিসেবে। পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায় "শিলালিপি" নামে অনিয়মিত একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭১ সনের ১৪ ডিসেম্বর রায়ের বাজার বধ্য ভূমিতে আলবদর বাহিনী তাঁকে হত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। <u>সার্জেন্ট জহুরুল হক</u> ঃ- যার আত্মত্যাগের ফলে উনসত্তরের গণ আন্দোলন জঙ্গী রূপ ধারন করে এবং যা শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়. তিনি হচেছন সার্জেন্ট জহুরুল হক। জহুরুল হক ১৯৩৫ সনের ৯ ফেব্রুয়ারী নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানাধীন সোনাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মজিবর হক। তিনি ১৯৫৩ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেই পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে তাঁকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নানা ভাবে নির্যাতন করা হয়। শারীরিক নির্যাতনের প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপ করেননি। কিন্তু মানসিক ভাবে নির্যাতন বিশেষ করে বাঙালী জাতির প্রতি কটাক্ষ তুচছ তাচিছল্য তার মনে ঘৃনার আগুন ছড়িয়ে দেয়। ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় একদিন বাঙালী জাতিকে গালিগালাজ করায় এক পাঞ্জাবী অফিসারের মুখের উপর ভাতের প্লেট ছুড়ে মেরেছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। পাঞ্জাবী অফিসারটি এধরনের ব্যবহারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জহুরুল হকের ঔদ্ধত্যের জবাব দিলেন বুলেটের সাহয্যে। কোন বিচার ছাড়াই তাঁকে হত্যা করা হলো উনসত্তরের ১৫ ফেব্রুয়ারী।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন

যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনঃ- ১৯৭১ ইং সনের নয় মাস ব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। সামাজিক কাঠামো এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অবস্থার মাঝে ১৯৭১ ইং সনের ১৬ ডিসেম্বরে স্বর্নকরোজ্জল দিনে আসে বাংলার মুক্তি, আসে স্বাধীনতা। শুরু হয় জাতির জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম। সে সংগ্রাম বেঁচে থাকার জন্য ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির সংগ্রাম। এই দুরহ সংগ্রামে উত্তরনের অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলা জনজীবনে যে সাধ্যাতীত সমস্যার সৃষ্টি করে সে সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য গোটা বাংলাদেশকে একটি সংঘবদ্ধ ইউনিট হিসাবে সুসমন্বিত করতে হয়।

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশকে যে সব অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় স্বদেশ প্রত্যাগত এক কোটি শরনার্থীর পুনর্বাসন তার মধ্যে অন্যতম। ভারতের শরনার্থী শিবির গুলো থেকে বন্যার উদ্দাম স্রোতের মতো স্বদেশ প্রত্যাগত শরনার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরনের উপযোগী রেশন এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের মধ্যে যারা রুগ্ন এবং চলাফেরায় অক্ষম তাদের জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রুষার এবং শিশুদের জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। দ্রুত গতিতে আমদানীর মাধ্যমে লুণ্ঠিত নিঃশেষিত শস্যভান্ডার পূরণ করতে হয় এবং লোক চলাচল ও মাল পরিবহনের উদ্দেশ্যে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা যথা সম্ভব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মাঠে, ময়দানে এবং কলকারখানায় উৎপাদন যন্ত্রগুলো হানাদার বাহিনী কর্তৃক বিকল করে দেওয়া হয়েছিল, মেরামতের মাধ্যমে সে গুলো সচল করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। উৎপাদনে গতিবেগ সঞ্চারের প্রচেষ্ঠার অঙ্গ হিসাবে আমদানী করা হয় কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ। এছাড়া জন সাধারণের অন্ন, বস্ত্র সমস্যার সমাধান কল্পে বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য ও কাপড়-চোপড় আমদানী করতে হয়। কারণ কোন দ্রব্য সামগ্রীই কম প্রয়োজনীয় বা জরুরী ছিল না।[১]

পুনর্বাসন ঃ- প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ১০৭ কোটি টাকার একটি স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এতে দুই কোটি স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন ও অন্ন সংস্থানের বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিম্নোক্ত লক্ষ্য সমূহ অর্জন করাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

(ক) ভারতের শরনার্থী শিবির থেকে লোকজনের প্রত্যাগমনের পথ সুগম করা।
(খ) গৃহহীন জনসাধারণের অস্থায়ী গৃহসংস্থান।
(গ) শরনার্থী এবং সর্বহারা মানুষদের নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেওয়া।

১। মোঃ জমির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন , বাংলাদেশ, স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭২, পৃ-৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) চাষী, সহায়-সম্বল হারা, কামার, কুমার, তাঁতী, মিস্ত্রি ও কারিগরদের অর্থনৈতিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

(ঙ) অর্থ সংকটের দরুন শিক্ষা ও শিক্ষকতা পুনরারম্ভ করতে অসমর্থ ছাত্র শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সাহায্য দান।

(চ) মহকুমা সদর দপ্তরে এতিম ও অভিভাবকহীনা মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য এতিমখানা ও আশ্রয় শিবির স্থাপন।

(ছ) চলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঢাকায় একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

(জ) শিল্প উৎপাদন সাবেক স্বাভাবিক হারের শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগে উন্নয়ন।

(ঝ) ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় বিদ্যুৎ শক্তির মাসিক কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

(ঞ) পন্য সামগ্রীর স্বাভাবিক চলাচল অক্ষুন্ন রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার।

(ট) খাদ্যোৎপাদন সর্বোচচ পরিমানে নিশ্চিত করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহন এবং

(ঠ) মহামারী রোধ করার জন্য শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১০৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা নিম্নোক্ত হারে[২] বরাদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন ঃ-

১।	সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়	৮৬.০০	কোটি টাকা
	ক) টেষ্ট রিলিফ	২৬.০০	" "
	খ) গৃহ নির্মান	৩০.০০	" "
	গ) অন্যান্য	৩০.০০	" "
২।	পূর্ত পরিকল্পনা	০৮.৩৮	" "
৩।	শিক্ষা (শিক্ষা মন্ত্রনালয় এ টাকা ছাড়াও সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রানালয় থেকে অতিরিক্ত ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা লাভ করে।)	০৩.২১	" "
৪।	স্বাস্থ্য (বাস্তহারা লোকদের চিকিৎসা ব্যয়সহ)	০০.৫৫	" "
৫।	এতিম এবং সর্বহারা মহিলাদের পুনর্বাসন	০০.৫০	" "
৬।	পরিবহন	০৪.৫৭	" "
৭।	শিল্প	০২.২৫	" "
৮।	তার ও ডাক যোগাযোগ	০০.৪৫	" "
৯।	পল্লী এলাকার পানি সরবরাহ	০০.৭০	" "
১০।	সেচ	০০.২০	" "
১১।	বিদ্যুৎ	০০.৫০	" "
		১০৭.৩১	কোটি টাকা

বোধগম্য কারনেই সূচনাতে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সংস্থান এবং খাদ্য সরবরাহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য ব্যবস্থাবলীর পাশাপাশি মূখ্যতঃ যে সব

২। মোঃ জমির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, বাংলাদেশ, স্মারক গ্রন্থ ১৯৭২ পৃ ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মোদ্যোগ গ্রহন করা হয় তন্মধ্যে টেষ্ট রিলিপ পূর্ত কর্মসূচী ও গৃহ নির্মান প্রকল্প অন্যতম। টেষ্ট রিলিপ ও গৃহনির্মান কর্মসূচী গ্রহনের অন্তর্নিহিত প্রয়াস ছিল সমাজের সমস্ত নারী-পুরুষদের স্বস্ব পরিচিত পরিবেশে কর্মসংস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি করা। সাহায্য ও পুনর্বাসন ও অন্যান্য মন্ত্রনালয়ের পূর্ন সহযোগিতায় এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়।[৩]

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় টেষ্ট রিলিফের ১৭ কোটি টাকায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ২৫.৭৫ লক্ষ একর জমি উপকৃত হয়েছে। এছাড়া সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রনালয় ৭১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা-ব্যায়ে গৃহ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা প্রভূত পরিমানে সমাধান করতে সক্ষম হয়।

এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ দেশবাসীর জন্য ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৮৫ মন খাদ্য শস্য ছাড়াও বিপুল পরিমান গুঁড়োদুধ, শিশু খাদ্য, তাঁবু, ত্রিপল ও শাড়ী বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে জাতীয় পুনর্বাসন বোর্ড হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিতা হাজার হাজার মহিলার পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ জন্য চারটি বৃত্তিমূলক ট্রেনিং কেন্দ্র এবং সাতটি সেলাই ও হস্তশিল্প শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের রিলিফ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা সংস্থার ন্যায় স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহকে মাসিক মঞ্জুরী বরাদ্ধ করেন। সহায় সম্বলহারা মহিলা ও শিশুদের পরিচর্যা এবং নিরাপত্তার জন্য মহকুমা পর্যায়ে ৬২ টি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রাথমিকভাবে জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নোয়াখালীতেও পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। নোয়াখালী থেকে প্রায় তিন লক্ষ শরনার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল শরনার্থী নোয়াখালীতে প্রত্যাগমন শুরু করে। বিশেষ করে আগরতলা থেকে ফেনীর বেলুনিয়া বর্ডার দিয়ে এসকল শরনার্থী নোয়াখালীতে প্রবেশ করতে থাকে। এ সকল শরনার্থীদের নিজ গৃহে ফেরার জন্য গন্তব্যস্থলের দূরত্ব অনুযায়ী কিছু নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। শরনার্থীরা যাতে নিজ নিজ গৃহে নিরাপদে পৌছতে পারে তার জন্য কিছু পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে এসকল শরনার্থীদের সাময়িকভাবে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়[৪]।

দ্বিতীয়ত ঃ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে থানাগুলোর অবস্থা ছিল খুবই করুন। স্থানীয় প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় প্রাথমিকভাবে থানা গুলো চালু করা হয়। কারণ এসময় এক শ্রেনীর স্বার্থপর ও সুবিধাভোগী শ্রেনী আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। ফলে আইন শৃংখলা রক্ষা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য প্রথমে থানা গুলোকে পুর্নগঠন করতে হয়।[৫]

৩। পূর্বোক্ত।
৪। সাক্ষাতকার ; নুরুল হক মিয়া।
৫। সাক্ষাতকার ; এ,বি,এম, তালেব আলী, ফেনী।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ নয়মাস যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুসেন্য হাজার হাজার বাড়ী ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আশ্রয়হীন এসকল নিঃস্ব মানুষের পুনর্বাসন খুব জরুরী হয়ে পড়ে। নোয়াখালী জেলায় এসমস্ত আশ্রয়হীন মানুষের জন্য সাময়িকভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিকভাবে যাদের বাড়ীঘর পুড়েছে তাদের তালিকা প্রণয়ন করে প্রত্যেক পরিবার পিছু দুই বান্ডিল ঢেউ টিন রিলিফ হিসাবে বন্টন করা হয়।[৬]

চতুথত ঃ নির্যাতিত মহিলা ও এতীম শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে নির্যাতিত মহিলাদের সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে পুনর্বাসন করা হয়। নোয়াখালীর রক্ষনশীল সমাজ ও পরিবারগুলো মানমর্যাদার কথা চিন্তা করে নির্যাতিত মহিলাদের কোন আশ্রয় কেন্দ্রে না পাঠিয়ে পারিবারিক আন্তরিক পরিবেশে তাদের পুনর্বাসন করে। শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য ফেনীর ছাগলনাইয়া থানায় একটি এতীমখানাও স্থাপন করা হয়।

পঞ্চমত ঃ নোয়াখালী জেলার বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোষর রাজাকার, আলবদরদের অস্থায়ী ক্যাম্প। যুদ্ধকালীন এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।

ষষ্ঠত ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাবারের ব্যবস্থা করেন। গম সিদ্ধ, গুড়ো দুধ, বিস্কুট, ছাতু প্রভৃতি শিশুদের বিনামূলে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সপ্তমত ঃ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত্রুবাহিনীর দ্রুত চলাচল ও সরবরাহ বিঘ্নিত করার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। বিভিন্ন সেতু ও কালবার্ট বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। নোয়াখালী জেলাতে এরকম সেতু ও কালবার্টের সংখ্যা ছিল ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক। শত্রুমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক চলাচল ও পন্য সামগ্রীর সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা হয়।[৭]

এছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, ও অন্যান্য খাতে জরুরী ভিত্তিতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সময়মত সে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত উপকূলীয় নোয়াখালী জেলার চির সংগ্রামী মানুষ ধীরে ধীরে প্রাথমিক বিপর্যয় সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঃ- ১৯৭২ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ সরকার পুনর্বাসন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দেন। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার যেসব প্রকল্প গ্রহন করেন তাতে গ্রামঞ্চলের গৃহ সমস্যার সমাধান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা, এতিম শিশু ও যুদ্ধের ফলে সর্বহারাদের পুনর্বাসনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব

৬। সাক্ষাতকার ; ফজলুল করিম , মুক্তিযোদ্ধা ও অবঃ ইউ,পি, চেয়ারম্যান ১৯৭২ রায়পুর।
৭। সাক্ষাতকার ; কামাল উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র স্টাফ রির্পোটার দৈনিক জনকণ্ঠ।

Dhaka University Institutional Repository

আরোপ করা হয়। পল্লী এলাকার গৃহ- নির্মান প্রচেষ্টার সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের ও চেষ্টা করা হচেছ। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত থানা গুলোসহ গ্রামাঞ্চলে মোট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার গৃহ নির্মানের জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। ১৯৭২-৭৩ সালের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য বরাদ্ধকৃত ৬৬ কোটি[৮] টাকা মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে ব্যয় কর হয় ঃ-

(১)	গৃহ নির্মান	৪৫ কোটি টাকা
(২)	পুনর্বাসন	১০ " "
(৩)	জরুরী রিলিফ-	৮ " "
(৪)	অন্যান্য	৩ " "
		৬৬ কোটি টাকা

পুনর্গঠন কর্মসূচী ঃ- বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতিপূরণ করাই এই কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্য। এই কাঠামোর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক তৎপরতার হার ১৯৬৯-৭০ সালের স্বাভাবিক ক্ষমতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন কালে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি ভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। বিগত মুক্তিসংগ্রাম কালে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবহন, কৃষি, এবং বিদ্যুৎ ও শিল্প ব্যবস্থা যথা শীঘ্র স্বাভাবিক করে তোলার কাজ সামগ্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে পুনর্গঠন কাজের জন্য নিম্নোক্তভাবে অর্থ বরাদ্দ[৯] করা হয়েছেঃ-

	খাত	বাজেট বরাদ্দ (দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)	শতকরা হার
১।	পরিবহন ও যোগাযোগ (ক)	৫১৯.১৮	৪৮.৬৭
	(খ)	৩৮.৮০	৩.৬৪
২।	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৯৪.৯০	৮.৯০
৩।	কৃষি, বন, মৎস, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন	১৪৭.৮০	১৩.৮৬
৪।	শিল্প	৬৫.৭৭	৩.১৭
৫।	শিক্ষা	৫১.০০	৪.৭৮
৬।	গৃহ নির্মান	৪৭.৮০	৪.৪৮
৭।	স্বাস্থ্য	৪০.৩০	৩.৭৮
৮।	সমাজ কল্যান ও শ্রম	৩২.৪০	৩.০০
৯।	পানি	২০.২০	১.৮৯
১০।	জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	৮.৬০	০.৮১
		১,০৬৬.৭৫	

৮। মোঃ জমির, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, পৃ-৯৮।
৯। মোঃ জমির, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, পৃ-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন কালে সর্বাধিক পরিমানে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার উপরোক্ত কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সরকার দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সরকারের গুরুত্বপূর্ন উদ্যেগ গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবহন ঃ- মুক্তি সংগ্রামের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা পঙ্গু এবং বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি প্রায় অচলবস্থার পর্যায়ে পৌছে। এর ফলে খাদ্য শস্য, শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কৃষিজাত দ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের আমদানী ও বিতরণ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। পরিবহন ক্ষেত্রে যে নিদারুন ক্ষয়ক্ষতি হয়, নীচের তালিকা[১০] থেকে তা উপলব্দি করা যাবে ঃ-

		সেক্টর	দশ লক্ষ টাকার হিসাবে
১।	বন্দরঃ	(ক) চট্টগ্রাম	৯০.০৬
		(খ) চালনা	৫৮.৮০
২।	সড়ক ঃ	(ক) সেতু, কালবার্ট	৮০.৩০
		(খ) গ্রামের রাস্তাঘাট	১৮.২৫
		(গ) সড়ক নির্মান সরঞ্জাম	১৭.৭৩
৩।	সড়ক পরিবহন ঃ	(ক) ট্রাক	২২৩.০০
		(খ) বাস	১২৮.০০
		(গ) বি, আর, টি,সি	১০.৮০
		(ঘ) খুচরা যন্ত্রপাতি	০০.১৯
৪।	রেলওয়ে ঃ		৩০৩.০০
৫।	শিপিং কর্পোরেশন		৮০.০৫
৬।	(ক) নৌপরিবহন সংস্থা		২৬.৩৪
	(খ) আভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ		১৩.৯৪
৭।	বাংলাদেশ বিমান		৮৭.১৫
৮।	সিভিল এভিয়েশন		৮৫.৪৪
			মোট=১,২২৬.৫৮

এই পর্যায়ের পুনর্গঠন কাজে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে বন্দরের সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা বিধান, নৌপরিবহন উন্নয়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরনের যথা সাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় বন্দর সমূহে এবং রায়পুরের সাথে ঢাকার সরাসরি নৌ-যোগাযোগের উন্নয়ন ও পন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। রায়পুর বন্দরের সঙ্গে চাঁদপুরের যোগাযোগ এবং বরিশালের সঙ্গে লক্ষীপুরের রহমত খালীর যোগাযোগ পুন স্থাপন করা হয়। এছাড়া নোয়াখালীর সোনাপুর হতে হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি চ্যানেলের পুনর্গঠন করা হয়।[১১]

১০। মোঃ জমির , পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, পৃ-৯৯।

১১। সাক্ষাতকার মমিন উল্লাহ (এডভোকেট)

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক বিমান চলাচলের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। এই অর্থ থেকে ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বন্দরের জন্য, ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা জল পথের জন্য, ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সড়ক ও হাইওয়ের জন্য, ৩০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা রেলওয়ের জন্য এবং ২০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য ব্যয় করা হবে।

এক্ষেত্রে মাত্র এক বছরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৬৩ মাইল মিটার গজ এবং ১৬ মাইল ব্রডগজ রেলপথের মধ্যে ৪৩ মাইল মিটার গজ এবং ১৬ মাইল ব্রডগজ রেলপথ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী-লাকসাম এবং লাকসাম-ফেনী-চট্টগ্রাম রেলপথের প্রায় ২/৩ মাইল রেলপথ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সারদেশে ২৯৫টি রেলওয়ে ব্রীজের মধ্যে ৮২ টি স্থায়ীভাবে ১৯৮ টি অস্থায়ীভাবে পুননির্মান করা হয়েছে। নোয়াখালী জেলাতে ফেনী-লাকসাম রেলওয়ে বড় সেতু পরিকোট ব্রীজ, নোয়াখালী-লাকসাম রেলপথের কালামোড়া সেতু এবং গুমদন্ডী লাইনসহ ৫/৬ টি সেতু ও কালবাট জরুরী ভিত্তিতে পুন নির্মান করে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ পুনস্থাপন করা হয়েছে।[১১] ভারত সরকারের সাহায্য সহায়তায় সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উদ্বোধন ছিল সরকারের একটি বড় সাফল্য।

রেলওয়ে সেতু নির্মানের ন্যায় সড়ক সেতু নির্মানের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষ্য করার মত। ২৭৪ টি বিধ্বস্ত সড়ক সেতুর মধ্যে ৫৫টি স্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছে এবং ৯৬ টি সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এছাড়া সাতটি স্থানে ফেরী সার্ভিস ও ষোলটি স্থানে ডাইভারশন রোড নির্মান করা হয়েছে। নোয়াখালী জেলার ফেনী-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শুভপুর ব্রীজ মেরামত এবং সাহেবজাদা ব্রীজ, চন্দ্রগঞ্জ ব্রীজ, দৌলতগঞ্জ ব্রীজ ও বাগবাড়ী ব্রীজসহ বাকী ব্রীজগুলো সাময়িক ভাবে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়। এছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় অসংখ্য কাঠের সেতু নির্মান করে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়।[১২]

বন্দরে মালপত্র উঠানামানোর ব্যবস্থাও প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে যেখানে মাল হ্যান্ডলিংয়ের পরিমান ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার টন, সেক্ষেত্রে একই বছরের মে মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টনে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী আমলে উপরোক্ত দুটি বন্দরে মালপত্র হ্যান্ডলিংয়ের মাসিক সর্বোচ্ছ পরিমান ছিল প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। বন্দর সমূহকে দ্রুত সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতা অবশ্যই এক্ষেত্রে স্মরনীয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক বন্দর পরিস্কার করার দায়িত্ব গ্রহন করার ফলেই এতোটা তাড়াতাড়ি বন্দর গুলোর অবস্থা এরকম উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।

জলপথের পরিবহন ক্ষেত্রেও একই রকম পুনর্গঠন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌপরিবহনের স্বাভাবিকতা রক্ষার গুরুত্ব বিশদ বিশ্লেষনের অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিসংগ্রাম কালে বাংলাদেশ অভ্যান্তরীন নৌপরিবহন সংস্থা এবং অভ্যান্তরীন নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের যে সব নৌবহর ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা পূরণ করার

১১। সাক্ষাতকার ; মনযুর উল করিম, জেলা প্রশাসক নোয়াখালী।
১২। সাক্ষাতকার ; মনযুর উল করিম, জেলা প্রশাসক নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ জন্য ক্ষতিগ্রস্থ নৌযান সমূহ মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহন ছাড়াও বিদেশ থেকে বার্জ, নৌকা, টাগ প্রভৃতি আমদানির এবং অবতরণ ক্ষেত্রে ও ওয়ার্কশপ তৈরীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ ঃ- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিদারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বহুস্থানে উৎপাদন, বিতরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। উৎপাদনে মোট ক্ষতির পরিমান তিন কোটি টাকার উপর। পক্ষান্তরে বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ১৮ কোটি টাকা। ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা রীতিমত উৎসাহ ব্যাঞ্জক। উক্ত অর্থ বছরে ৬১ টি লাইন মেরামত করা ছাড়াও ২৪ টি লুপ লাইন নির্মান করা হয়েছে এবং ১৬ টি ক্ষতিগ্রস্থ লাইনকে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জ উলন লাইন ৩৩ কে, ভি এর স্থলে ১৩২ কে, ভিতে উন্নীত করা হয়েছে। মেরামতের কাজ কর্ম ছাড়াও ইশ্বরদী উলন ও খিলগাঁও এর সাব-ষ্টেশন সমূহের নির্মান কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন, ভেড়ামারা পাওয়ার ষ্টেশন, রূপগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন, দিনাজপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং মেহেরপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গ্রীড লাইন এবং ডিষ্ট্রিবিউশন লাইনের পুররুদ্ধার কাজের প্রতিও পরিপূর্নভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নোয়াখালী জেলায় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এবং পুনর্বাসন বা পুনরুদ্ধারও হয়নি।

কৃষি ঃ- মোট আভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ যে ক্ষেত্র থেকে আসে সেই কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান। শরনার্থী হিসেবে এক কোটি মানুষের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহন এবং অপর দুই কোটি লোকের প্রান ভয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে ছুটোছুটির অপ্রতিরোধ্য পরিনতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় জীবন প্রবাহের এ ক্ষেত্রেটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে এ খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমান প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৭৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে বস্তুগত যে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমান আনুমানিক ৮৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।[১৪]

		(কোটি টাকার হিসাবে)
ক)	কৃষি (মৎস্য সম্পদ ছাড়া)	= ৭.৫৬
খ)	চা	= ২০.৭৬
গ)	পল্লী উন্নয়ন ও অন্যান্য	= ১.৭৬
ঘ)	খাদ্য	= ৩.৭৩
ঙ)	মৎস্য	= ১২.২৪
চ)	সমবায়	= ৩.৫৮
ছ)	গবাদি পশু	= ১.৭৬
জ)	বি, এ, ডি, সি	= ৪.৫৮
ঝ)	ড্রাফ্ট পাওয়ার	= ২৫.০০
ঞ)	মৎস্য শিল্প সরঞ্জাম	= ৩.৩৩
		মোট = ৮৪.১৯

১৪। মোঃ জমির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, বাংলাদেশ স্মারক গ্রন্থ ১৯৭২ পৃ-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে এ ক্ষেত্রে সরকার কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমান ১৯৭১ সালের মার্চ পূর্ব পর্যায়ে উন্নীত করার এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্য স্থির করেন। এজন্য সম্পূর্ন বৈদেশিক মুদ্রায় বরাদ্ধ করা হয় ৬২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।[৫] নিম্নোক্ত জিনিস সমূহ ক্রয় বাবদ এ অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে ঃ-

নং	দ্রব্য	পরিমান দশ লক্ষ টাকার হিসাব
১।	খুরচা যন্ত্রপাতিসহ পাওয়ার পাম্প ৪০০০	= ৪৬.০০
২।	ওয়ার্কশপ টুলস্ ও সাজসরঞ্জাম	= ৬.৫০
৩।	খুচরা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম	= ২.০০
৪।	বিমান ও বিমান থেকে স্প্রের উপযোগী জিনিসপত্র	= ৫.৬০
৫।	পরিবহন যান	= ২.৮০
		মোট= ৬২.৯০

কীটপতঙ্গ নিরোধক ঔষধপত্র এবং অধিকতর পরিমানে সার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সরকার দেশাভ্যান্তরে ইউরিয়া সার, টি,এস,পি, এবং পটাশ উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছে। কীট নাশক ঔষধ এবং উন্নত মানের বীজ সরবরাহের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিও এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচীর অধীনে সরকার ইরি-২০ জাতীয় ধানের ছয় লক্ষ মন বীজ এবং ইরি-৮ জাতীয় ধানের দুই লক্ষ মন বীজ সরবরাহ করার উদ্দ্যেগ গ্রহন করেছে। রেজিষ্ট্রিকৃত উৎপাদনকারীদের মাধ্যমে এই বীজ সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া শীত কালীন শস্য উৎপাদনের সুবিধার্থে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনা ক্রমে কৃষি মন্ত্রনালয় লো-লিফট্ পাম্প এবং গভীর নলকূপ ব্যবহার উন্নতি বিধানের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এই ব্যাপক পুনর্গঠন কাজের সর্বশেষ ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করতে পারবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

নোয়াখালী জেলাতে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসন হয়েছে, বিশেষ করে রামগতি থানা, হাতিয়া থানা ও নোয়াখালী সদর সুধারাম থানার অধীন চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমান খাস জমি ছিল। এর বেশীর ভাগ জমি ছিল অনাবাদী। এছাড়া স্থানীয় জোতদার ও লাঠিয়াল বাহিনীর দখলে প্রচুর পরিমান খাস জমি ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে মুক্তিযোদ্ধা ও মক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে মাথা পিছু ২ একর জমি বরাদ্ধ দেয়া হয়। এসকল অনাবাদী ও বেদখলী জমিতে আবাদ করে ফসল উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করা এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলোকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে সরকার এ কর্মসূচী গ্রহন করে। এতে করে উপকূলীয় বিশাল চরাঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটতে থাকে এবং সাথে সাথে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার পুনর্বাসিত হয়।

---

১৫ মোঃ জমির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ঃ- আনরডের জরীপ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলায় শিল্প ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ৪০ কোটি ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অর্থাৎ ৫ কোটি ২২ লক্ষ ১৫ হাজার মার্কিন ডলারের সমান। কাঁচামাল, বস্তুগত ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং যন্ত্রপাতি এই ধ্বংসলীলার শিকারে পরিনত হয়। সরকারি খাতের অন্তর্গত পাট শিল্প, শিপইয়ার্ড এবং ডিজেল প্ল্যান্ট প্রভৃতির পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাড়ায়। এছাড়া বেসরকারি খাতের হাজার হাজার কুটির শিল্প বিধ্বস্ত হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতির যোগান দানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে শিল্প উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয় ৫৭৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ্য অর্জনের-জন্য সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করেছেঃ-

ক) ফ্যাক্টরী; গুদাম, মেশিন পত্র প্রভৃতি মেরামতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান।
খ) মূলধন বিনিয়োগে ইকুইটি, সহযোগিতা।
গ) কাঁচামাল ক্রয় এবং কারখানা চালু রাখার ব্যয় সংকুলানের জন্য ওয়াকিং ক্যাপিট্যাল বাবদ স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান।
ঘ) আমদানীকৃত ও স্থানীয় কাঁচামাল নিয়মিত ভাবে সরবরাহ।
ঙ) এছাড়াও সরকার সেকটর ভিত্তিক সংস্থা সমূহকে সে গুলোর অধীনস্থ কলকারখানা ও উৎপাদন যন্ত্রগুলো সক্রিয় করে তোলা ও রাখার জন্য নিম্নোক্ত হারে অর্থ বরাদ্ধ[১৯] করেছেন ঃ-

		(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)
১)	বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	=১৩০.৫০
২)	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	= ৪.১৩
৩)	বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সাহায্য সংস্থা	= ০.০২
৪)	চলচিত্র উন্নয়ন সংস্থা	= ০.০২
৫)	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা	= ১৭.৫০

উপরোক্ত ক্ষেত্র সমূহের পুনর্গঠন কাজ থেকে সুফল লাভ কিছুটা সময় সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। তবে এরই মাঝে এর শুভ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। আশা করা যায় মূলধনের যথাযথ বিনিয়োগ এবং একনিষ্টভাবে কাজ কর্মের ভিতর দিয়ে শীঘ্রই বাংলাদেশ তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে।

পাকিস্তান আমলে এমনিতেই পূর্ব বাংলায় ভারী শিল্প স্থাপিত হয়েছে খুবই কম। তার উপর জেলা পর্যায়ে শিল্প স্থাপন ছিল অকল্পনীয়। তবুও নোয়াখালীতে একটি ভারী শিল্প স্থাপিত হয় চৌমুহনীতে ডেল্টা জুট মিলস্ লিঃ ১৯৬২ সালে। এছাড়া দোস্ত টেক্সটাইল মিলস্ স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার কাজীরবাগ এলাকায়।[২০] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মিলস্ দুটিতে উৎপাদন বন্ধ থাকলে ও তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার মিলস্ দুটিকে জাতীয়করণ করেন। এ সময় মিলের কর্মকর্তা কর্মচারী হিসাবে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে পুনর্বাসিত করা হয়।

---

১৯ মোঃ জামির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, বাংলাদেশ স্মারক গ্রন্থ ১৯৭২ পৃ-১০১।
২০ মোঃ ফখরুল ইসলাম ; বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ঃ- ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ছিল তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মুক্তি সংগ্রামীরা আশ্রয় নিতেন, সেজন্যই এগুলো প্রবল আক্রোশের কবলে পতিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবয়বগত ক্ষতি ছাড়াও লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ধ্বংসলীলার ভিতর দিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ তাদের উপায় উপকরণ সমূহ হারিয়ে ফেলে। এক হিসাবে জানা যায় ১৯৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞে প্রায় ২১ হাজার ৮ শত ৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তন্মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৮০০০, ৩৪৮০ ও ২৯০। এছাড়া ৩০ টি প্রাথমিক শিক্ষা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ও ৩০টি সরকারী অফিস বিনষ্ট হয়। বলাবাহুল্য ফিল্ড অফিসার, সংশ্লিষ্ট স্কুল সমূহের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সূত্র হইতে এই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপিত হয়েছে। এই ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির ব্যাপক প্রচেষ্টা হিসাবে সরকার প্রায় ২৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করেছে। শিক্ষা ডাইরেকটরেট ডিগ্রী পর্যায়ের বিধবস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পর্যন্ত পুনর্গঠন কাজ তদারক করেছে। শিক্ষা ডাইরেকটরেট এ জন্য যে অর্থ ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত পেয়েছেন তার পরিমান হল ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এছাড়া পাকিস্তান আমলে ক্ষতিগ্রস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বই পুস্তক ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় মোটা অংকের অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে। বলা অনাবশ্যক যে, এ বরাদ্ধের ভিতর দিয়েই সরকারি প্রচেষ্টার বিরাম ঘটেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রের উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।[১৪]

নোয়াখালী জেলাতে প্রচুর পরিমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিশেষ করে হাইস্কুল গুলো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কারণ থানা পর্যায়ের বেশীর ভাগ হাইস্কুল ছিল পাকবাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের ক্যাম্প। সমগ্র নোয়াখালীতে প্রায় ২৫ টি হাইস্কুল ১৫ টি মাদ্রাসা, ১টি প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউট, ১টি টেকনিক্যাল হাইস্কুল ও ৪ টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই পুস্তক, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি ভাঙ্গচুর, জ্বালিয়ে দেয়া বা চুরির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সকল ক্ষয়ক্ষতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারিভাবে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই অর্থ টেন্ডারের মাধ্যমে সরকারিভাবে কাজ করিয়ে ব্যয় করা হয়েছে। আসবাব পত্র তৈরী, দেয়াল মেরামত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হলেও উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর লাইব্রেরী পুনর্গঠন ছিল প্রায় অসাধ্য। কারণ লাইব্রেরীতে যে সকল পুরনো বইপত্র, স্মারক গ্রন্থ, গবেষনা পত্র ও দুষ্প্রাপ্য বই ছিল সেগুলোর অনেকাংশই আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ক্ষতি ছিল অপুরণীয়।[১৫]

গৃহ নির্মান ঃ- অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সরকারি ও বেসরকারি আবাস এবং সম্পত্তিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বিল্ডিং ডাইরেকটরেটের বহু বাড়ীঘর বিনষ্ট হয়ে যায়। পুনর্গঠন ব্যায়ের হিসাবে এক্ষেত্রে সরকারি খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দশ কোটি টাকারও

১৪। মোঃ জমির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পৃ-১০২।
১৫। সাক্ষাতকার ; শেখ মোঃ আবদুল হাই।

Dhaka University Institutional Repository

বেশী। তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতেই ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক- যার পরিমান প্রায় ৮২৫ কোটি টাকা। পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের পানি সরবরাহ এবং পয়ঃ প্রাণালী ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

গৃহ সমস্যা সমাধানের সুবিধার্থে এ ক্ষেত্রে পুনর্গঠন কাজকে দশটি সেকটরে বিভক্ত করা হয়েছে। এবং প্রত্যেক সেকটরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। গৃহ নির্মান কাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুতর করার জন্য বরাদ্ধকৃত মোট অর্থ যে দশটি সাবসেকটরের মধ্যে বরাদ্ধ করা হয়েছে তা হলো, বিল্ডিং ডাইরেকটরেট, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ডাইরেকটরেট, পুলিশ ডাইরেকটরেট, পর্যটন সংস্থা এবং বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর সার্ভে বিভাগ।

তবে নোয়াখালী জেলাতে গৃহ নির্মানের ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত পুনর্বাসন হয়নি। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোষররা গ্রামগঞ্জ এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে ছিল। হাট বাজারও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু সরকারি ভাবে এসবের তেমন কিছুই পুনর্বাসন করা হয়নি। শুধুমাত্র মাথাপিছু ২ বান্ডিল করে ঢেউ টিন বরাদ্ধ দেয়া হয়েছিল, যা দিয়ে কোন রকমে মাথা গোজার ঠাই করে নিয়েছিল আশ্রয়হীন পরিবার গুলো। এছাড়া একটি ঘর তৈরী করতে অন্যান্য যে সকল উপকরণ দরকার যেমন- বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতির কিছুই দেয়নি। এছাড়া ঘর তৈরীতে প্রয়োজনীয় নির্মান ব্যায় অনেকের কাছে না থাকায় তারা এসকল ঢেউ টিন খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছে এবং স্ত্রী, সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেছে।

এছাড়াও সরকার মাথাপিছু একখন্ড করে কম্বল দিয়েছে, তাও সঠিক ভাবে বিলি বন্টন হয়নি। টেষ্ট রিলিফ হিসাবে গম দিয়ে ও পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নোয়াখালীর অনেক পরিবারই নিজস্ব প্রচেষ্টা ও আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর সাহায্য সহযোগিতায় পুনর্বাসিত হয়েছে।

সবশেষে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হয়নি। কারণ দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা, শোষন ও শাসনের ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবকাঠামো ছিল খুব দূর্বল ও ভঙ্গুর। তাছাড়া উন্নত দেশগুলো তাৎক্ষনিক ভাবে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত নবজাত শিশু রাষ্ট্রের প্রতি যে ভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা দরকার ছিল তা না করায় আমাদের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলতে থাকে। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সরকার ও জনসাধারণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজকে দ্রুত এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার প্রসংসা করে পুনর্বাসিন ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশন দল তাদের রির্পোটে তা উল্লেখ করেন। "বাংলাদেশ ঃ ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত জরীপ" (তথ্য পত্র নম্বর ১৭, আনরড) রির্পোটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে এই দেশ দূর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়নি। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়নি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সরকারি কর্ম প্রচেষ্টার অপরিহার্য পরিনতি হিসেবে বাংলাদেশ একটি সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।[১০]

১০। মোঃ জমির ; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন। বাংলাদেশ স্মারকগ্রন্থ ১৯৭২, পৃ-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্বসত্বেও স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সদ্যজাত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে এবং বাঙালীকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ ইং সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহন করেন। যুদ্ধ বিধ্বংস্ত একটি স্বাধীন দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রিপোর্টে Review of Planned Development -এ মন্তব্য করা হয়েছে ঃ- "The damage to the economy was so widespread that the first National Govt. of independent Bangladesh had to engage in the massive task of rehabilitation and reconstruction of the economy. However the political imperatives of the liberation war required restructuring of social priorities into a new economic framework to meet the aspiration of the new nation and interfacing with the Reconstruction programme. Accordingly, in a hurry and even with weakness of the data base, a theoretically consistent and technically well drawn-up plan was prepared. The first five Year plan with a programme outlay of taka 4455 crore was launched in July 1973."[২]

২। The second five year plan 1980-85, Ministry of Finance and Planing, 29-v-1983,p-1

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত নোয়াখালীবাসী ভৌগলিক অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশগত কারনে অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পূর্বাপরই তাদের ছিল গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা। ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনসহ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং সামাজিক সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী জাগরনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে নোয়াখালী জেলার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে দেশে বিদেশে। দেশ প্রেম, স্বজাতিবোধ ও আঞ্চলিকতায় অন্যদের চাইতে অনেক এগিয়ে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রগতিশীল চিন্তা ধারার মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্টায় তারা সোচচার, শোষন নিপীড়নেও তারা আদর্শ বিচ্যুত হননি। তাই উত্তর ভারতের রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদের ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করেছে, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনসহ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও নায়কোচিত ভূমিকা রেখেছে। ১৯৪৭ এর পর থেকে নতুন করে যখন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে পরাধীনতার শিকল পরানোর চেষ্টা করে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি, তার বিরুদ্ধেও তেজ দীপ্ত প্রতিবাদ জানাতে পিছপা হয়নি বৃহত্তর নোয়াখালীর অধিবাসী। বায়ান্ন সালে ঢাকার রাজপথে অন্যান্যদের সঙ্গে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আবদুস সালাম প্রমান করেছে জাতির ক্রান্তি কালে নোয়াখালীবাসী জীবন দিতেও কার্পন্য করে না। এর পর চুয়ান্নর নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, বাষট্টি ও চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছিষট্টির ৬ দফা আন্দোলনসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের আত্মহুতির দ্বারা উনসত্তরের গন অভ্যুত্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জনগন। নেতৃত্ব, সংগ্রামে ও নীতিনির্ধারনে সাহসী ভূমিকা পালন করে নোয়াখালীর মোহাম্মদ উল্লাহ, আবদুল মালেক উকিল, খাজা আহমদ, নুরুল হক মিয়া, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, মুনীর চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আসম আবদুর রব, সিরাজুল আলম খান, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, মওদুদ আহমদ, আ.ফ.ম, মাহবুবুল হক সহ অনেক নেতা কর্মী বুদ্ধিজীবি ও সাংস্কৃতি সেবী। তাদের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ১৯৭০ সনে ১২ নভেম্বরের মহাপ্রলয়ের পরও নির্বাচনে স্বাধীকারের পক্ষে রায় দিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মাথা উচু করে দাড়ায়। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যখন ষড়যন্ত্র শুরু হয় তখনো সমস্ত জাতীয় কর্মসূচী পালিত হয় নোয়াখালীতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭ মার্চের ঘোষানার পর শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধের প্রস্তুতি। সে কারনেই ২৬ মার্চের পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমনের পরও প্রায় একমাস বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা শত্রুমুক্ত ছিল। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিরোধ ভেঙ্গে নোয়াখালী জেলা দখল করে নেয়।

প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে যাওয়ার পর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জেলা প্রশাসন ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে পুনরায় শসস্ত্র প্রতিরোধের ও প্রতিশোধের প্রস্তুতি শুরু হয়। সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে একটি নিয়মিত বাহিনী ও স্থানীয় ভাবে প্রশিক্ষন দিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গন করা হয়। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী ভারত থেকে প্রশিক্ষন

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে মুক্তি বাহিনী নোয়াখালীতে আসতে শুরু করে। নোয়াখালীর বিভিন্ন দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র লীগ, ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কর্মীরা ভারতে যান এবং প্রশিক্ষন নিয়ে ফিরে আসেন। আদর্শ গত দ্বন্দ থাকলেও এসময় দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এ সময় নোয়াখালীতে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পি, ডি, পি সহ স্বাধীনতা বিরোধীরা পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতা করে নিরীহ জনগনের উপর অত্যাচার শুরু করে। বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনী অঞ্চলেই পাকবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ হয়। নোয়াখালীর পশ্চিম অঞ্চল বিশেষ করে নোয়াখালী সদর ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে পাক বাহিনীর সহযোগিদের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সনের ৭ ডিসেম্বর নোয়াখালী শত্রুমুক্ত হয় অনেক তাজা প্রান আর সম্মান হানির বিনিময়ে। যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে প্রানহানি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস প্রভৃতির একটা সঠিক বিবরন দেয়া দুরূহ হলেও চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধোত্তর পূর্নবাসন ও পুর্নগঠন কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে। অবকাঠামো বিনির্মানে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও রয়েছে এতে। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় সংঘটিত গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র তুলে ধরে নোয়াখালীসহ সারা বাংলার ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরনীয় করে রাখা জরুরী। এভাবে একদিন মুক্তিযুদ্ধের পূর্নাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সঠিক পূর্নাঙ্গ ইতহাস রচনায় আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানগুলো সাহায্য করবে। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হচেছ। সরকারি বেসরকারি উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হচেছ মুক্তিযুদ্ধ গবেষনা কেন্দ্র ও যাদুঘর। ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগেও সংগৃহিত হচেছ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যাবলী। অনুকূল পরিবেশের কারনে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন এমন অনেকে লিখতে শুরু করেছেন, যা খুবই আশা ব্যাঞ্জক। এসব লেখা একত্রিত করে একদিন সম্পূর্ন ইতিহাস প্রকাশিত হবে।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিও তৎপর। প্রকৃত সত্যকে আড়াল করতে তথ্য প্রমান ধ্বংস করে সমাজে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনো হচেছ। তাদের দূরদর্শি তৎপরতা ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করতে। রাজনৈতিক ভাবে তারা আজ প্রতিষ্ঠিত। প্রশাসন ও তাদের প্রভাব মুক্ত নয়। প্রচার মাধ্যমও শক্তিশালী। তাই সাবধানতা ও দ্রুততার সাথে আমাদের গৌরবময় অধ্যায়ের ইতিহাস পুনর্গঠন করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য যে জাতি সর্বোচচ ত্যাগ স্বীকার করেছে সে জাতি এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতার ইতিহাস ও চেতনা বিস্মৃত হবে- তা মোটেই কাঙ্খিত নয়। সরকারি তত্ত্বাবধানে রচিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র ১৬ খন্ডের বিশাল ইতিহাস একটি অতি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলেও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও বিরোধীতাকারীদের কোন তালিকা নেই। ১৯৭১ এর ঘাতকদের আজও বিচার হয়নি বা সামাজিক ভাবেও তাদের মর্যাদার কোন হানি হয়নি। নেতৃবৃন্দের উদারতা, অমনোযোগিতা ও অসর্তকতার কারনে আজ আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বদলে ১৯৪৭ এর চেতনার কথা শুনতে হচেছ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে বৃহত্তর নোয়াখালীর সচেতন অংশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে বেশ সজাগ। ইতিমধ্যে নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিখতে শুরু করেছেন। বিলম্বে হলেও এ সমস্ত লেখা প্রকাশিত হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপাদানে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ সফরে এসে ভারতের খ্যাতনামা সাহিত্যিক মুলুকরাজ আনন্দ ১৬ জানুয়ারী ১৯৭২ সনে ঢাকার বুদ্ধিজীবিদের একসভায় বলেছিলেন, "আপনারা মসী ছেড়ে অসি ধরেছিলেন, এবার অসি ছেড়ে কলম ধরবেন। আপনাদের লেখায় যেন বাংলাদেশের বিপর্যয়ের ছবি আঁকা থাকে। লেখকরা সমাজের প্রতিনিধি। সমাজের হৃদস্পন্দন যেন আপনাদের লেখায় প্রকাশিত হয়। আপনাদের দেশে যে মর্মঘাতী কাহিনী অভিনীত হয়ে গেছে তা যদি প্রকাশ করতে না পারেন; জানবেন-এই দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই. . . . . এ'ও একটি কবিতা হবে"।[১] তাই ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে দায়িত্ববোধের কথা স্মরন করে আমার এই প্রয়াস। এতে তথ্যের স্বল্পতা আছে। নোয়াখালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ব্যাপক গবেষনালব্দ কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সম্পূর্ন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতকার গ্রহন ও বিক্ষপ্ত তথ্য থেকে ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাসের এ গৌরবময় অধ্যায় তুলে ধরার মানসে নিবেদিত এ অভিসন্দর্ভ।

১। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র- একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়? (ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২)পৃ-১০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৪- যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফা ছিল নিম্নরূপঃ-

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায় করবার স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচচ হারের খাজনা ন্যায় সঙ্গত ভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসা জাতীয় করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫। পূর্ব বঙ্গকে লবন শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ন করিবার জন্যে সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎশিল্পের লবন তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম মন্ত্রী সভার আমলের লবনের কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেনীর গরীব মহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বাসিতর ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দূর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ব বঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায় সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবল মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায় ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিনত করিয়া উচচ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মক ভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচচ বেতন ভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতন ভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি

Dhaka University Institutional Repository

সুসামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশী বেতন গ্রহন করিবেন না।

১৩। দূর্নীতি, স্বজন প্রীতি ও ঘুষ- রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। "জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনেন্স" প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করিয়া বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃতকম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষনাগারে পরিনত করা হইবে।

১৭। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মান করা হইবে এবং তাহাদের পরিবার বর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষনা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষনা করা হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গকে পূর্ন স্বায়ত্ব শাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেডকোর্য়াটার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোর্য়াটার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মানের কারখানা নির্মান করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ন করা হইবে। আনছার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিনত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবেনা। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরনের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ২৪- ১৯৬৯ সনের ৪ জানুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদের ১১ দফা দাবী পেশ করেনঃ-

১(ক) স্বচ্ছল কলেজ গুলোকে প্রাদেশিকীকরনের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে যে সব কলেজ প্রাদেশিকীকরন করা হইয়াছে সে গুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ন ছাত্রদের উচ্চ ক্লাশে ভর্তি নক্ষের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবী মানিতে হইবে। ছাত্রবেতন কমাইতে হইবে। নারী শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করিয়া শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ন বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ন স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করিতে হইবে।

(গ) শাসক গোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল "জাতীয় শিক্ষা কমিশন রির্পোট" ও "হামদুর রহমান কমিশন রির্পোট" বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পালার্মেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত ও ছাত্রলীগ সমর্থিত ছয় দফাকে এই ৩নং দফায় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫। ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎশিল্প জাতীয়করন করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা, ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্ব নিম্ন মূল্য মন প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ ও আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বর্হিভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩ ঃ স্বাধীনতার ইশতেহারঃ-

১। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষনা করা হয়েছে ; ৫৪৫০৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের আবাসিক ভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। (ক) পৃথিবীর বুকে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি পূর্ন বিকাশের ব্যবস্থা (খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক রাজ, শ্রমিক রাজ কায়েম করা (গ) বাক, ব্যক্তি ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম।

২। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহন করা হবেঃ- (ক) প্রতিটি অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন (খ) জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা (গ) মুক্তিবাহিনী গঠন (ঘ) সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার (ঙ) লুঠতরাজ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করন।

৩। স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা হবে ঃ (ক) বর্তমান সরকারকে বিদেশী সরকার গন্য করে এর সকল আইনকে বেআইনী ঘোষনা (খ) অবাঙালী সেনা বাহিনীকে শত্রুসৈন্য হিসাবে গন্য এবং খতম করা (গ) এদের সকল প্রকার খাজনা, ট্যাক্স, দেয়া বন্ধ করা (ঘ) আক্রমনরত শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহন (ঙ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা (চ) স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" ব্যবহৃত হবে। (ছ) পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন ও সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা (জ) পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশী পতাকা ব্যবহার ও (ঝ) স্বাধীনতা সংগ্রামরত বীরদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

৪। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪ঃ- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষন

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্নভাবে আমাকেও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুন ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস -এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুন আর্তনাদ-এ দেশের করুন ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া খান এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টোসাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার আলোচনা করলাম-আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো-সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমবিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বললাম, আপনারা শান্তি পূর্নভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগন সাড়া দিল। আপন ইচছায় জনগন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমার জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচেছ গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যা গুরু-আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল Withdrow করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগনের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারিনা।

আমি প্রধান মন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত জিনিষ গুলি আছে, সে গুলি হরতাল কাল থেকে চলবেনা। রিক্সা, গরুর গাড়ী, রেল-চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্ট দপ্তর ওয়াপদা কোন কিছু চলবেনা। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তা-ঘাট যা যা আছে সব কিছু -আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু আর তোমরা গুলী করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবানা।

Dhaka University Institutional Repository

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে-প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী-অবাঙালী-তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তা হলে টেলিভিশনে যাবে না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে-বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা ॥

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৫ঃ- ১৪ মার্চ ১৯৭১ ইং বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জনতার প্রতি আহ্বান জানান এবং বঙ্গবন্ধু এদিন ৩৫ দফা নির্দেশ নামা জারি করেন। এতে বলা হয় ঃ-

১। সকল সরকারি বিভাগ সমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট, আধা স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা সমূহ পূর্বের মতই বন্ধ থাকবে।

২। বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩। জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগন অফিস না খুলে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ বিভাগ, আনসার বিভাগ ও অনুরূপ কাজ করবে।

৪। বন্দর (আভ্যান্তরীন বন্দর সহ) কর্তৃপক্ষ সৈন্য ও সমরাস্ত্র ব্যাতীত সকল খাদ্যবাহী জাহাজের মাল খালাস ত্বরান্বিত করবেন ও শুল্ক আদায় করবেন।

৫। আমদানি রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাষ্টমস কালেকটরগণ আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইষ্টার্ন মার্চেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের বিশেষ একাউন্টে শুল্ক জমা করবেন। কোন শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬। সৈন্য ও সমরাস্ত্র পরিবহন ব্যতীত অন্যান্য পন্য পরিবহনের জন্য রেল চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

৭। সারা বাংলাদেশে ইপি আর টিসি চালু থাকবে।

৮। আভ্যন্তরীন নদীবন্দর গুলোর কাজ চালু থাকবে।

৯। বাংলাদেশের মধ্যে শুধুমাত্র চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করবে। পোষ্টাল সেভিংস, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী কার্যরত থাকবে।

১০। বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্ত:জেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। সংরক্ষন ও মেরামত বিভাগ কাজ করবে।

১১। বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদ পত্র চালু থাকবে। তবে গণআন্দোলনের সংবাদ প্রচার না করলে কর্মচারীরা সহযোগিতা করবেনা।

১২। সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্লিনিক যথারীতি কাজ করে যাবে।

১৩। বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজ চালু থাকবে।

১৪। গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৫। ব্রিকফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬। খাদ্য শস্যের চলাচল জরুরী ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে।

১৭। বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি সরঞ্জাম ক্রয়, চলাচল, বন্টন অব্যাহত থাকবে।

১৮। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও শহর সংরক্ষন সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ কাজ করে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। বৈদেশিক সাহায্যে তৈরী রাস্তা ও পুল সহ সকল প্রকার সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মান কাজ অব্যাহত থাকবে।

২০। ঘূর্নিদূর্গত এলাকার বাঁধ তৈরী ও উন্নয়ন মূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য পুনর্বাসন ও পুননির্মান কাজ চলবে এবং ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হবে।

২১। ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদুর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

২২। সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন দয়া হবে।

২৩। সামরিক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪। বেতন ও পেনশন প্রদানের জন্য এজি ও ট্রেজারীর সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫। বাংলাদেশের বাহিরে টাকা পাঠানো ব্যতীত ব্যাংকের সকল প্রকার লেনদেন চালু থাকবে।

২৬। স্টেট ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মত চালু থাকবে।

২৭। বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরন ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানী কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮। সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্দ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯। বাংলাদেশে সকল অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০। পৌর সভার ময়লাবাহী ট্রাক রাস্তায় বাতি জালানো সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১। কোন খাজনা, কর, শুল্ক, আদায় করা যাবেনা।

৩২। সকল বীমা কোম্পানী কাজ করবে।

৩৩। সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকান-পাট নিয়তিমভাবে চলবে।

৩৪। সকল বাড়ীর শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে। এবং

৩৫। সংগ্রাম পরিষদ গুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযতভাবে বাস্তাবায়ন করে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬ঃ-মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা

খন্ড নং-১১৫

জিলা ঃ- নোয়াখালী থানা/উপজেলাঃ- সুধারাম/সদর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮২৭৬।	মোঃ আবদুল মালেক	জানা যায়নি
২৮২৭৭।	মোস্তফা কামাল	আহমেদ করিম
২৮২৭৮।	গোলাপ মিয়া	মৌঃ মমতাজ মিয়া
২৮২৭৯।	আবদুল ওদিদ	হারিস মিয়া
২৮২৮০।	আহমেদ উল্লাহ	হাবিব উল্লাহ
২৮২৮১।	মোঃ হোসন আহমেদ	আমিন উল্লাহ
২৮২৮২।	মোশাররফ হোসন	এ,বি, সিদ্দিক
২৮২৮৩।	এ,বি,এম, আবদুল কাইয়ুম	মৃত আলী আহমেদ মিয়া
২৮২৮৪।	বেলায়েত হোসেন	মৌঃ আঃ হালিম
২৮২৮৫।	সৈয়দ আঃ সাত্তার	আবদুল বারিক
২৮২৮৬।	আবুল কাশিম	সুফী আহমেদ
২৮২৮৭।	আবু বকর সিদ্দিক ভুইয়া	কাবিদ ভুইয়া
২৮২৮৮।	মোঃ শাহজাহান	আবদুল গনি
২৮২৮৯।	মোহাম্মদ সাদেক	মোহাম্মদ সিদ্দিক আহমেদ
২৮২৯০।	শ্রী সুখময় মজুমদার	আকলিল চন্দ্র মজুমদার
২৮২৯১।	জলু মিয়া	মৃত বশির উল্লা
২৮২৯২।	তাজ উদ্দিন আহমেদ	মোঃ ইছহাক মিয়া
২৮২৯৩।	মোঃ আবু হানিফ	মোঃ শামসুল হক
২৮২৯৪।	সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	সুলতান আহমেদ
২৮২৯৫।	আবুল কালাম	সৈয়দ আহমেদ
২৮২৯৬।	তাজুল ইসলাম	সুলতান মিয়া
২৮২৯৭।	খুরশিদ আলম	সেকেন্দার মিয়া
২৮২৯৮।	আলী আকবর	মকবুল আহমেদ
২৮২৯৯।	মোঃ মজিবুল হক	তালেব আলী
২৮৩০০।	আবুল হাসমে	মোঃ আবদুল জব্বার
২৮৩০১।	মোঃ ইসমাইল	মোহাম্মদ উল্লাহ
২৮৩০২।	মোজাম্মেল আহমেদ চৌধুরী	মৃত মজিবল আহমেদ চৌধুরী
২৮৩০৩।	মোহাম্মদ হানিফ	মোঃ বদু মিয়া
২৮৩০৪।	এ,কে, আজাদ	আবদুল জাব্বার
২৮৩০৫।	মোঃ আঃ মতিন	কালা মিয়া
২৮৩০৬।	শামসুল হক	মৃত ননা মিয়া
২৮৩০৭।	আমির হোসেন	ফজলের রহমান
২৮৩০৮।	আবুল খায়ের	মৃত হাসমত উল্লাহ
২৮৩০৯।	মোঃ লোকমান হাকিম মিয়া	মোঃ ইউছুপ আলী মিয়া
২৮৩১০।	মোঃ গোলাম কবির	মৌঃ রহমত আলী
২৮৩১১।	মোঃ আবুল কালাম	নুরের রহমান
২৮৩১২।	আবদুর রশিদ	শেখ আফাক আলী সারেং

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৩১৩।	মোঃ সিরাজ মিয়া	মোহাম্মদ চৌধুরী মিয়া
২৮৩১৪।	আবদুল হক	রহমত উল্লাহ
২৮৩১৫।	আবু তাহের	দুদা মিয়া
২৮৩১৬।	মোঃ হানিফ	আলী আজম
২৮৩১৭।	আঃ গফুর	মোহাম্মদ উল্লাহ
২৮৩১৮।	মোঃ ইসমাইল	আবদুল কাদের
২৮৩১৯।	আবু তাহের	আলী আকবর
২৮৩২০।	ছায়েদুল হক	মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া
২৮৩২১।	মোঃ আহসান উল্লাহ	মোঃ আইয়ুব আলী
২৮৩২২।	মোঃ নুরুল হক	মোঃ সিরাজুল হক
২৮৩২৩।	জালাল আহমেদ	মৃত আহম্মদ উল্লাহ
২৮৩২৪।	সুজা মিয়া	হাবিবুল্লাহ মিয়া
২৮৩২৫।	সরাফত আলী	আলী আহমেদ
২৮৩২৬।	মনসুর আহমেদ	মৃত নজির আহমেদ
২৮৩২৭।	আঃ মালেক	মৃত আঃ বারিক
২৮৩২৮।	নুরুজ্জামান	মৃত আরব আলী মিয়া
২৮৩২৯।	নুরুজ্জামান	মোঃ নাজির আহমেদ
২৮৩৩০।	মোঃ রফিক উল্লাহ	মোঃ শামসুল হক
২৮৩৩১।	মোঃ মুকবুল আহমেদ	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৮৩৩২।	আঃ রশিদ	মৃত গনি মিয়া
২৮৩৩৩।	আঃ রশিদ	আবদুস সাত্তার
২৮৩৩৪।	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী	মৌঃ গোলাম মর্তুজা
২৮৩৩৫।	আলী আহমেদ	অলি মিয়া
২৮৩৩৬।	মোঃ আঃ মালেক	মোঃ আতর আলী
২৮৩৩৭।	মোঃ আঃ ওয়াদুদ	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
২৮৩৩৮।	মমিন উল্লা	হাবিব মিয়া
২৮৩৩৯।	মোঃ আবদুল আউয়াল	মোঃ আবদুল মান্নান
২৮৩৪০।	আবদুল গফুর	মফিজুর রহমান
২৮৩৪১।	মোঃ মোস্তফা	আহছান উল্লা
২৮৩৪২।	মোঃ শফি উল্লাহ	সুলতান আহমেদ
২৮৩৪৩।	মোঃ হানিফ	মহব্বত আলী
২৮৩৪৪।	মোঃ রুহুল আমিন	শামসুল হক
২৮৩৪৫।	হারিছ মিয়া	মৃত আলিম উদ্দিন
২৮৩৪৬।	ফিরোজ খান মুন	মৃত মৌঃ মোখলেসুর রহমান
২৮৩৪৭।	দবির আহমেদ	মোঃ সুলতান আহমেদ
২৮৩৪৮।	মিঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ	মৌঃ আজিজুল হক
২৮৩৪৯।	রুহুল আমিন	মৃত মনু মিয়া
২৮৩৫০।	আনু মিয়া	আঃ রহমান
২৮৩৫১।	মোঃ আঃ হাই ভুইয়া	মোঃ রুস্তম ভুইয়া
২৮৩৫২।	আঃ ওয়াহিদ	মোঃ গাফফার সরকার
২৮৩৫৩।	মোঃ আবু জহির	মোঃ ফরিদ উদ্দিন
২৮৩৫৪।	আবুল খায়ের	কালা মিয়া
২৮৩৫৫।	মোঃ সায়েদুল হক	মোঃ আছুক

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৩৫৬।	জিয়াউল হক	আজিজুর রহমান
২৮৩৫৭।	আবুল কাশেম	আলী করিম উদ্দিন
২৮৩৫৮।	আবদুল বারিক	হাসিম উদ্দিন সরকার
২৮৩৫৯।	আজিজুল হক	আলী আজম
২৮৩৬০।	মোঃ আঃ বারী	মৌঃ আইয়ুব আলী
২৮৩৬১।	মোঃ আবুল কালাম	মাহে আলম
২৮৩৬২।	মাহমুদ উল্লাহ হক	নুর মোহাম্মদ
২৮৩৬৩।	আমিন উল্লাহ	আবদুস সামাদ
২৮৩৬৪।	আবুল কালাম	মৃত মুকবুল আহমেদ
২৮৩৬৫।	মুকসুদুর রহমান	হাজী আঃ কাদের
২৮৩৬৬।	মোঃ আবুল কাশেম	মৌঃ দলিলুর রহমান
২৮৩৬৭।	মোঃ দুলাল মিয়া	মোঃ সরফত আলী মাঝি
২৮৩৬৮।	মোঃ আবু সাঈদ	মোঃ মফিজ উদ্দিন ভুইয়া
২৮৩৬৯।	মোঃ মোস্তাফা	তোফায়েল আহমেদ
২৮৩৭০।	আবদুল গোফরান	আঃ সামাদ
২৮৩৭১।	আলম মিয়া	মৃত ফজলুর রহমান
২৮৩৭২।	কালা মিয়া	শমসের আলী
২৮৩৭৩।	মোঃ ওজি উল্লা চৌধুরী	মোঃ আমিন উল্লা
২৮৩৭৪।	হাবিবুর রহমান	নফল আহমেদ
২৮৩৭৫।	নুর আহমেদ	এছাক মিয়া
২৮৩৭৬।	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ জয়নাল আবেদীন
২৮৩৭৭।	মোঃ দুদা মিয়া	মমতাজ সাবেং
২৮৩৭৮।	জয়নাল আবেদীন	মৃত আবদুল মালেক
২৮৩৭৯।	আবু তাহের	আমির হোসেন
২৮৩৮০।	মোঃ ইব্রাহীম	চৌধুরী মিয়া
২৮৩৮১।	মোঃ আবুল মন্নান চৌধুরী	আবুল খায়ের চৌধুরী
২৮৩৮২।	আবদুল মতিন মোল্লা	ছাহাদ আলী মোল্লা
২৮৩৮৩।	জয়নাল আবেদীন	মৃত নজির আহমেদ
২৮৩৮৪।	জয়নাল আবেদীন	আলী আহমেদ
২৮৩৮৫।	মোঃ আঃ রব	মোঃ এমরাত আলী
২৮৩৮৬।	আনফর আলী	আরমত আলী
২৮৩৮৭।	আজিজুল হক	মোকলেসুর রহমান
২৮৩৮৮।	আবদুল মালেক	আঃ খালেক বেপারী
২৮৩৮৯।	আবুল খায়ের	গুনু মিয়া
২৮৩৯০।	আবদুস সাত্তার	মৃত আবদুল বারী
২৮৩৯১।	আবুল কালাম	মোঃ নুরুজ্জামান
২৮৩৯২।	আবদুল হালিম	মৃত আঃ সেলিম
২৮৩৯৩।	আবুল হোসেন গাজী	আমিন উদ্দিন গাজী
২৮৩৯৪।	আবদুল মালেক	মাক্কু মিয়া
২৮৩৯৫।	মোঃ আইয়ুব আলী বাংগালী	মোঃ সোনা মিয়া
২৮৩৯৬।	আবদুল কুদ্দুস	আবদুল লতিফ মিয়া
২৮৩৯৭।	মোঃ শরিফ উল্লা	সিদ্দিক উল্লা
২৮৩৯৮।	আবদুল হক	আলম মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৩৯৯।	মোঃ শাহ্ আলম	চান মিয়া
২৮৪০০।	আবু সাঈদ	সিদ্দিকুর রহমান
২৮৪০১।	আবুল কালাম	মোবারক আলী
২৮৪০২।	আবুল খায়ের	আবদুল গনি
২৮৪০৩।	আবদুল করিম	মোঃ ফজলু মিয়া
২৮৪০৪।	আবদুল খালেক	সোনাবদি মাতবর
২৮৪০৫।	মোঃ আজাহার আহমেদ	আলী আহমেদ
২৮৪০৬।	সিদ্দিক আহমেদ	মফিজ মিয়া
২৮৪০৭।	মোঃ চান মিয়া	মৃত মোঃ ইউনুছ মিয়া
২৮৪০৮।	মোঃ সাফায়েত উল্লাহ	মৃত আহমেদ উল্লাহ মুন্সি
২৮৪০৯।	শাহাদত হোসেন	আলী আহমেদ চৌধুরী
২৮৪১০।	মোঃ নুরুল হক	মোঃ আঃ খালেক
২৮৪১১।	মোঃ রুহুল আমিন	আঃ লতিফ
২৮৪১২।	গেয়াস উদ্দিন	ইনতাজ মিয়া
২৮৪১৩।	আবদুল মালেক	মকবুল আহমেদ
২৮৪১৪।	মোকারম আলী	মৃত নজর আলী

জিলাঃ- নোয়াখালী থানা/উপজিলাঃ-কোম্পানীগঞ্জ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৪১৫।	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত মোঃ আলী আজম
২৮৪১৬।	মোঃ আবদুল মতিন	মোঃ এমদাদ উল্লা
২৮৪১৭।	মোঃ আফজাল হক	মৃত মৌঃ মোখলেছুর রহমান
২৮৪১৮।	মোঃ মোকসুদুর রহমান	মৌঃ আঃ খালেক
২৮৪১৯।	মোঃ শফি উল্লাহ	মোঃ আমিন উল্লা
২৮৪২০।	মোঃ মহিব উল্লা	মৃত মোখলেসুর রহমান
২৮৪২১।	মোঃ নুরুজ্জামান	মোঃ আজাহার আলী
২৮৪২২।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মোঃ আঃ রশিদ
২৮৪২৩।	ছানা উল্লা	মৌঃ মমতাজুল করিম
২৮৪২৪।	মোঃ আজিজুল হক	মৌঃ আঃ ওহাব
২৮৪২৫।	মোঃ মোস্তাফা	শেখ আহমেদ
২৮৪২৬।	অমিও ভুষন দাস	অনুকুল চন্দ্র দাস
২৮৪২৭।	মোঃ আঃ বাসার	মৌঃ ইদ্রিস মিয়া
২৮৪২৮।	মোঃ গোলাম কবির	মৃত এবাদুল হক চৌধুরী
২৮৪২৯।	আবুল বাসার	মোঃ মোখলেসুর রহমান
২৮৪৩০।	মোঃ আবু সায়েদ	মৌঃ ওবায়দুল হক
২৮৪৩১।	আমিনুল হক	আলী আহমেদ
২৮৪৩২।	মোঃ আতিক উল্লা মিয়া	মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া
২৮৪৩৩।	মোঃ আঃ রশিদ	মৌঃ আহম্মদ হোসেন
২৮৪৩৪।	আঃ কুদ্দুস	সুলতান আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৪৩৫।	নুরুল হক	আঃ কাদের
২৮৪৩৬।	আঃ মান্নান	আঃ আলী
২৮৪৩৭।	মোঃ নুর নবী	মৌঃ আঃ সামাদ
২৮৪৩৮।	আবুল কালাম	ছেলামত উল্লা
২৮৪৩৯।	শফি উল্লা	নুরুল ইসলাম মুন্সি
২৮৪৪০।	আঃ রউফ	হাজী জয়নাল আবেদীন
২৮৪৪১।	মোঃ শফি উল্লা	মৃত মোবারক আলী মুন্সি
২৮৪৪২।	আবদুল রব	নুরুজ্জামান মিয়া
২৮৪৪৩।	মোঃ হারেছ আহমেদ	হাজী মোঃ সোনা মিয়া
২৮৪৪৪।	আঃ রব	আঃ খালেক
২৮৪৪৫।	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মোঃ মকবুল আহমেদ
২৮৪৪৬।	মোঃ আহসান উল্লা	মৌঃ মোজাফফর মিয়া
২৮৪৪৭।	আবুল কাশেম ভুইয়া	মোঃ মোবারক আলী
২৮৪৪৮।	মোঃ হালিম	হালিম মোঃ মহর আলী মিয়া
২৮৪৪৯।	মোঃ হাশেম	নাজির আহমেদ
২৮৪৫০।	আঃ খালেক	সালামত উল্লা
২৮৪৫১।	আবদুল কুদ্দুস	সুলতান আহমেদ
২৮৪৫২।	সিরাজুল হক	মৃত মোঃ ইব্রাহীম খলিল
২৮৪৫৩।	আঃ খালেক	আবদুর রহমান

জিলাঃ- নোয়াখালী থান/উপজেলাঃ- হাতিয়া

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৪৫৪।	মোঃ আঃ হক	মৌঃ জবিউল হক
২৮৪৫৫।	মোঃ আঃ ওহাব	মোঃ আঃ বারী
২৮৪৫৬।	অরুন চন্দ্র দাস	রমনী মোহন দাস
২৮৪৫৭।	মোঃ নইম উদ্দিন	মৌঃ শাহ আলম
২৮৪৫৮।	নিতাই লাল রায়	ডাঃ জগবন্ধু রায়
২৮৪৫৯।	আঃ সহিদ	নাজির আহমেদ
২৮৪৬০।	জয়নাল আবেদীন	বাদশা মিয়া
২৮৪৬১।	আবদুল মোতালেব	মৃত মাহমুদুর রহমান
২৮৪৬২।	সিরাজ উল্লা	আঃ মালেক
২৮৪৬৩।	তসিল আহমেদ	হাজী আলী আহমেদ
২৮৪৬৪।	মোঃ অলি উল্লা	মোঃ জাবিয়ল হোসেন
২৮৪৬৫।	জাহাংগীর হোসেন	মজিবুর রহমান
২৮৪৬৬।	আনছার উল্লা	আঃ লতিফ
২৮৪৬৭।	আঃ মোতালেব	মৃত রেজা উল হক
২৮৪৬৮।	মোঃ আজহারুল ইসলাম	মৃত মোঃ এমামুল হোসেন
২৮৪৬৯।	মোঃ ইয়াছিন ভুইয়া	মোঃ সেকেন্দার আলী ভুইয়া
২৮৪৭০।	আঃ হক	বাসা মিয়া
২৮৪৭১।	আঃ ছাত্তার	মোকলেসুর রহমান ভুইয়া
২৮৪৭২।	মাহাফুজুর রহমান	মফিজুর রহমান
২৮৪৭৩।	সানোয়ার উল্লা	আঃ লতিফ
২৮৪৭৪।	মোঃ নুরুল আমিন	মৃত মৌঃ ওসমান গনি

Dhaka University Institutional Repository

জেলাঃ- নোয়াখালী থানা/উপজেলাঃ-চাটখিল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৪৭৫।	জহিরুল ইসলাম ভুইয়া	আলী আজম ভুইয়া

খন্ড নং- ১১৬

জিলা ঃ নোয়াখালী থানা/উপজেলাঃ সেনবাগ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৪৭৬।	মোঃ আবদুল হক	মোঃ নাদু মিঞা
২৮৪৭৭।	মোঃ আক্তারুজ্জামান ভূঞা	মোঃ বদিউজ্জামান ভূঞা
২৮৪৭৮।	মোঃ আহসান উল্লাহ	মোঃ আমিনুল হক
২৮৪৭৯।	নুর মোহাম্মদ	মৌঃ আঃ জব্বার
২৮৪৮০।	মোঃ আলী আরশাদ	আলী আহমেদ
২৮৪৮১।	আবদুর রহিম	নাজিম উদ্দিন
২৮৪৮২।	আবুল কালাম	আঃ করিম
২৮৪৮৩।	আবদুল আওয়াল	আঃ খালেক
২৮৪৮৪।	আবদুল করিম	আঃ মজিদ সারেং
২৮৪৮৫।	মোঃ আলী হায়দার	মোঃ আঃ বারিক
২৮৪৮৬।	মোঃ আঃ মজিদ	মোঃ আঃ কাদির
২৮৪৮৭।	মোঃ আঃ রহিম	মোঃ আঃ আজিজ পন্ডিত
২৮৪৮৮।	মোঃ নুরুল ইসলাম	বদিউর রহমান
২৮৪৮৯।	মোঃ আঃ রব	সারু মিয়া
২৮৪৯০।	মোঃ রুহুল আমিন	মোঃ নাদেরুজ্জামান মিয়া
২৮৪৯১।	মানিক লাল দাস	নরেন্দ্র কুমার দাস
২৮৪৯২।	আঃ রব	আঃ হালিম
২৮৪৯৩।	মোঃ মাহবুবু উল্লাহ	মোঃ ইছাহাক
২৮৪৯৪।	মোঃ নুরুল হক	মোঃ শামছুল হক
২৮৪৯৫।	মোঃ আবু সুফিয়ান	মোঃ আঃ বারী
২৮৪৯৬।	কাজী মোঃ জয়নুল আবদীন	মোঃ হারিছ
২৮৪৯৭।	মোঃ নুর নবী	মৃত মোঃ রহিম বক্স
২৮৪৯৮।	মোঃ আবু তাহের মির্জা	মৌঃ আবদুল্লাহ মিয়া
২৮৪৯৯।	মুকসুদুর রহমান	হাজী খলিলুর রহমান
২৮৫০০।	আঃ হক	কলিম মিয়াজী
২৮৫০১।	এনামুল হক	এ কে এম ডাঃ লিয়াকত উল্লাহ
২৮৫০২।	মোঃ আবু তাহের	মোঃ আরিফুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৫০৩।	মোঃ আবুল খায়ের	দলিলুর রহমান
২৮৫০৪।	আবুল কালাম আজাদ	মকবুল আহাম্মেদ
২৮৫০৫।	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ আতু মিয়া
২৮৫০৬।	আবুল কাশেম	আহম্মেদ উল্লাহ
২৮৫০৭।	মোঃ সালেহ উদ্দিন	মৃত আবদুল সামাদ
২৮৫০৮।	মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী	মোঃ মফিজুর রহমান চৌধুরী
২৮৫০৯।	শেখ আহমেদ	মৃত শেখ মোমতাজ
২৮৫১০।	মো ছিদ্দিকুল্লাহ	আরশাদ উল্লাহ
২৮৫১১।	আঃ রাজ্জাক	আহম্মেদ উল্লাহ
২৮৫১২।	মোঃ ওসমান গনি	মোহাম্মদ উল্লাহ
২৮৫১৩।	কে বি এম আমানুল হক মিয়া	মৃত হাজী আঃ মজিদ মিয়া
২৮৫১৪।	মোঃ গোলাম মাওলা	মোঃ জুলফিকার
২৮৫১৫।	মুজিব উল্লাহ	আলী আহম্মেদ
২৮৫১৬।	মোঃ এ বি ছিদ্দিক	মোঃ মোকলেছুর রহমান
২৮৫১৭।	এ কে এম হাসমত উল্লাহ চৌধুরী	রহিম বক্স
২৮৫১৮।	মোঃ আবদুল হালিম	মোঃ নুরুল হক ভুঞা
২৮৫১৯।	মোঃ আবুল খায়ের	মোঃ হাবিবুর রহমান
২৮৫২০।	মোঃ আঃ কাদের	মোঃ আঃ করিম
২৮৫২১।	মোঃ আঃ কাইয়ুম	নাদেরুজ্জামান
২৮৫২২।	মোহাম্মদ উল্লাহ	মোঃ ইদ্রিস
২৮৫২৩।	মোঃ মনজুর মোর্শেদ আলম	মোঃ মীর মোশারফ হোসেন
২৮৫২৪।	মোঃ আবুল কালাম	জালাল আহমেদ
২৮৫২৫।	মোঃ আঃ বারী	মোঃ আরশাদ ভুইয়া
২৮৫২৬।	মোঃ আঃ বারী	মোঃ বুলু ভুঞা
২৮৫২৭।	জয়নাল আবেদীন	মুগজল মিয়া
২৮৫২৮।	মোঃ আঃ আওয়াল ভুঞা	মৃত মোঃ ইউসুফ ভুঞা
২৮৫২৯।	মোঃ আবুল হোসেন	মুন্সী কালা মিয়া
২৮৫৩০।	মোঃ আবুল হোসেন	করিম বক্স ভুইয়া
২৮৫৩১।	মোঃ আঃ হালিম	মোঃ আঃ বারিক
২৮৫৩২।	আবুল হোসেন	আবদুর রাজ্জাক
২৮৫৩৩।	আবু তাহের	বাসু মিয়া
২৮৫৩৪।	মাহমুদুল হক ভুঞা	হাসমত উল্লাহ
২৮৫৩৫।	মোঃ হালিম চৌধুরী	আঃ খালেক
২৮৫৩৬।	আবুল হোসেন	ইউনুছ মিয়া
২৮৫৩৭।	আলতাফ হোসেন	আলী আহম্মদ
২৮৫৩৮।	আঃ হক	সেরু মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৫৩৯।	আবুল কাশেম	মৃত মোঃ মুজাফফর আলী
২৮৫৪০।	শফি উল্লা	আলী আজম
২৮৫৪১।	মোঃ শাহ্ জালাল	মোঃ ধনু মিয়া
২৮৫৪২।	শফি উল্লাহ্	আহম্মদ উল্লাহ্
২৮৫৪৩।	মোঃ রুহুল আমিন	চান মিয়া চৌধুরী
২৮৫৪৪।	গোলাম রহমান	মৃত মোঃ রজব আলী মিয়া
২৮৫৪৫।	মোঃ আঃ সামাদ	মৌঃ আলী আহম্মেদ
২৮৫৪৬।	মোঃ আঃ রব ভুইয়া	মোঃ ফজলুর রহমান ভুইয়া
২৮৫৪৭।	মোঃ লোকমান	ওমর আলী
২৮৫৪৮।	আজিজ আহমেদ	ফয়েজ আহম্মদ
২৮৫৪৯।	মোঃ আঃ গফুর	মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
২৮৫৫০।	মোঃ আঃ জব্বার	মোঃ আলী আহম্মদ
২৮৫৫১।	মোঃ আবু সুফিয়ান	আঃ বারী
২৮৫৫২।	জালাল আহম্মদ	মোঃ ইউনুছ
২৮৫৫৩।	ছাইদুর রহমান	মৃত মোঃ সিরাজ উদ্দিন
২৮৫৫৪।	আঃ লতিপ	মৃত আরব আলী
২৮৫৫৫।	জয়নাল আবদীন	নাদু মিয়া
২৮৫৫৬।	জয়নাল আবদীন	আঃ লতিফ
২৮৫৫৭।	জাকির হোসেন	মোঃ ইব্রাহিম
২৮৫৫৮।	আবদুল জব্বার	মুকু মিঞা
২৮৫৫৯।	মোঃ গোলাম মোস্তফা	আবদুর রশিদ
২৮৫৬০।	আঃ মালেক	মৃত মন্টু মিঞা
২৮৫৬১।	আবদুস সাত্তার	মৃত বজলার রহমান
২৮৫৬২।	আবুল কাশেম	ফজলুর রহমান
২৮৫৬৩।	আবুল খায়ের	আবদুল সামাদ
২৮৫৬৪।	আবুল কালাম	আবদুল গফুর
২৮৫৬৫।	আকরামুল হক	মাষ্টার মোঃ লুৎফুল হক
২৮৫৬৬।	আবুল কাসেম	সিরাজ উল্লা
২৮৫৬৭।	আফজালুর রহমান	ফজলুর রহমান
২৮৫৬৮।	আবুল বাসার	আবদুল হক
২৮৫৬৯।	মোঃ আবদুস সালাম	সুলতান আহমেদ
২৮৫৭০।	আবুল বাসার খান	জালাল উদ্দিন আহমেদ খান
২৮৫৭১।	মোকাররম	আবদুল কাইয়ুম
২৮৫৭২।	আবদুস সামাদ	তিতা মিয়া
২৮৫৭৩।	আবু বকর সিদ্দিক	আলী আহমেদ
২৮৫৭৪।	আবদুল মালেক	ছাবেদ মিঞা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৫৭৫।	আবদুল খালেক	আরশাদ আলী
২৮৫৭৬।	মোঃ আবদুস সাত্তার	সিরাজুল হক
২৮৫৭৭।	আবদুল সালাম	ছাদু মিঞা
২৮৫৭৮।	আবদুল গফুর	আবদুল কাদের
২৮৫৭৯।	আবদুল মতিন	মুন্সি
২৮৫৮০।	আবদুল মতিন	ফাজিল মিঞা
২৮৫৮১।	মোঃ আবুল কাসেম	মোঃ আলম মিঞা
২৮৫৮২।	আবুল খায়ের	ছাদু মিয়া
২৮৫৮৩।	আবুল বাসার	আবদুল গফুর
২৮৫৮৪।	মোঃ আবু তাহের	আবু বক্কার সিদ্দিক
২৮৫৮৫।	আবদুল খালেক	মৃত নানু মিঞা
২৮৫৮৬।	আবদুল আজিজ	মৃত আলী মিঞা
২৮৫৮৭।	আবদুল মালেক	আলী আহমেদ
২৮৫৮৮।	মোঃ আবুল বাসার	আবু মিঞা
২৮৫৮৯।	আবদুল মোতালিব	আনসার বক্স
২৮৫৯০।	আক্তারুজ্জামান	আঃ রশিদ
২৮৫৯১।	মোঃ ইউছুফ	মৌঃ জুলফিকার হোসেন
২৮৫৯২।	আবদুর রব	মোঃ ইব্রাহিম
২৮৫৯৩।	আবদুর রহিম	আঃ মজিদ সেরাং
২৮৫৯৪।	আবদুল রাজ্জাক	মৃত ইদ্রিস মিঞা
২৮৫৯৫।	মোঃ আবু জাহের	মৃত আরফান আলী
২৮৫৯৬।	মোঃ আলী আরশাদ	আলী আহমেদ
২৮৫৯৭।	আনসার আলী	সৈয়দ আলী
২৮৫৯৮।	আবুল হোসেন	আলতাফ মিঞা
২৮৫৯৯।	মোঃ আঃ হক	মেহের বক্স
২৮৬০০।	আবদুর রউফ	মোঃ ইব্রাহিম
২৮৬০১।	সৈয়দ চান মিঞা	মৃত হাসান আলী
২৮৬০২।	আবুল কালাম	আফজাল মিয়া
২৮৬০৩।	আলী হায়দার	মৃত আনু মিঞা
২৮৬০৪।	আবদুল হালিম	সোনা মিঞা
২৮৬০৫।	শাহ আলম	আবদুল আউয়াল
২৮৬০৬।	মোঃ আবু জাফর মিঞা	আফাজ উদ্দিন
২৮৬০৭।	আবদুল জলিল	ক্বারী সিরাজুল হক
২৮৬০৮।	বাণাকাত উল্লা তালুকদার	আশরাফ আলী তালুকদার
২৮৬০৯।	আবুল কাশেম	বাবু মিঞা
২৮৬১০।	আমিরুল ইসলাম	আবদুল বারী

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৬১১।	সাইদুল হক	রুকু মিঞা চৌধুরী
২৮৬১২।	আলী আকবর	মুন্সী আলী আহমেদ
২৮৬১৩।	মোঃ সিরাজুল হক	মতিউর রহমান
২৮৬১৪।	আবদুল মতিন	আবদুল জব্বার
২৮৬১৫।	আবদুল মোন্নাফ	মহরম আলী
২৮৬১৬।	আঃ মতিন	আঃ গফুর
২৮৬১৭।	আবদুর রব	সালামত উল্লা
২৮৬১৮।	আঃ রশিদ	আবদুল আজিজ
২৮৬১৯।	আবদুল গোফরান	নাদু মিঞা
২৮৬২০।	মোঃ আলী আজম	মোঃ আশরাফ আলী
২৮৬২১।	আবু বক্কর সিদ্দিক	মৃত চান্দ মিঞা
২৮৬২২।	মোঃ হাবিব উল্লাহ	মোঃ বজলুর রহমান
২৮৬২৩।	আবুল হাসেম	মমতাজ মিঞা
২৮৬২৪।	আবুল হোসেন	আবদুল গোফরান
২৮৬২৫।	আবুল হোসেন বুনিয়া	বজলুর রহমান বুনিয়া
২৮৬২৬।	মোঃ আবদুল সাত্তার	মোঃ আঃ সোবহান
২৮৬২৭।	আবুল হোসেন	মৃত বাদশা মিঞা
২৮৬২৮।	আবদুল মান্নান	মৃত আবু বকর সিদ্দিক
২৮৬২৯।	আবদুল মোতালেব	মৃত কালু মিঞা ভুইয়া
২৮৬৩০।	মোঃ আবুল খায়ের	মোঃ সলেমান
২৮৬৩১।	আবুল কাসেম	আবদুল কাদির
২৮৬৩২।	আবুল হাসেম	আলী আকবর
২৮৬৩৩।	আবুল হোসেন	আঃ রশিদ
২৮৬৩৪।	আবদুর রহমান	সিরাজুল হক
২৮৬৩৫।	আবুল কালাম আজাদ	আবদুল হাই
২৮৬৩৬।	আবুল কালাম	ইদ্রিস মিয়া
২৮৬৩৭।	আঃ ওহাব	শরীয়ত উল্লাহ
২৮৬৩৮।	করিম উল্লাহ	অজি উল্লাহ
২৮৬৩৯।	মোঃ আঃ মতিন	মোঃ আরব আলী
২৮৬৪০।	লিয়াকত উল্লাহ	মৃত আহম্মদ আলী
২৮৬৪১।	আবদুল মান্নান	মৃত শামসুর আলী
২৮৬৪২।	আবুল কালাম	মৃত মুসলিম মিঞা
২৮৬৪৩।	আবদুল কাদির	মৃত নানু মিঞা
২৮৬৪৪।	মোঃ আঃ বারী	মোঃ আঃ হাকিম
২৮৬৪৫।	মোঃ আঃ মান্নান	মাধু মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৬৪৬।	আবদুল খালেক	মমতাজ উদ্দিন
২৮৬৪৭।	জয়নাল আহমেদ	ফজল মিঞা
২৮৬৪৮।	আবুল কাসেম	বুলু মিঞা
২৮৬৪৯।	আবুল কালাম	ওসমান গনি
২৮৬৫০।	আবদুর রাজ্জাক	আলী আজম
২৮৬৫১।	আবদুল আওয়াল	মৃত আহমেদ উল্লাহ
২৮৬৫২।	মোঃ আবু তাহের	মৃত বেলায়েত হোসেন
২৮৬৫৩।	আবদুল মন্নান	নুরুল হক
২৮৬৫৪।	আবুল হোসেন	আলী আকবর
২৮৬৫৫।	আবদুস সালাম	আরশাদ মিঞা
২৮৬৫৬।	আবদুস সাত্তার	মৃত মোঃ ইসহাক
২৮৬৫৭।	আবু সুফিয়ান	মমিনুল হক
২৮৬৫৮।	আবদুল গোফরান	আবদুর রহমান
২৮৬৫৯।	মকবুল হোসেন	সেকান্দার খাঁ
২৮৬৬০।	মোঃ আঃ মতিন	মোঃ আঃ মজিদ
২৮৬৬১।	আবদুল গনি	মৃত আঃ মজিদ
২৮৬৬২।	আমিরুল ইসলাম	আবদুল হক
২৮৬৬৩।	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ আলী আকবর
২৮৬৬৪।	মোঃ হাবিব উল্লা	মোঃ মমতাজ উদ্দিন
২৮৬৬৫।	মোঃ লোকমান	মোঃ মান্দে মিঞা
২৮৬৬৬।	সিরাজুল ইসলাম	মোঃ বাদশা মিঞা
২৮৬৬৭।	মোঃ তরিক উল্লা	মৃত আকু আলী মিঞা
২৮৬৬৮।	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত বাদশা মিঞা
২৮৬৬৯।	আবদুল ছোবহান	আলী আকবর
২৮৬৭০।	মোঃ আঃ খালেক	মৃত মুন্সী করিম উদ্দিন
২৮৬৭১।	আবদুর রাজ্জাক	আবদুল খালেক
২৮৬৭২।	আবদুস সাত্তার	সদরু মিঞা

খন্ড নং-১১৭

জিলা ঃ নোয়াখালী

থানা/উপজিলা ঃ বেগমগঞ্জ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৬৭৩।	মোঃ লোকমান হোসেন	মোঃ ইদ্রিস আলী
২৮৬৭৪।	দীল মোহাম্মদ	শফি উল্লাহ
২৮৬৭৫।	মোঃ ফখরুল ইসলাম	আলী আহমেদ
২৮৬৭৬।	মোঃ রুহুল আমিন	দুলা মিয়া পাটোয়ারী

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৬৭৭।	রহমত উল্লাহ	আজিজ উল্লাহ
২৮৬৭৮।	মোঃ কবির আহমেদ	মৌঃ আঃ করিম
২৮৬৭৯।	গোলাম মোস্তফা	মোঃ নুরুল হক
২৮৬৮০।	মোঃ লিয়াকত আলী	মোঃ ফয়েজ
২৮৬৮১।	শ্রী রমেশ চন্দ্র ভৌমিক	শ্রী মদন মোহন ভৌমিক
২৮৬৮২।	আঃ মান্নান	ইছাহাক মিয়া
২৮৬৮৩।	শফিক উল্লাহ	মৃত ইরছ আলী বেপারী
২৮৬৮৪।	মোহাম্মদ হানিফ	মৃত সোনা মিয়া
২৮৬৮৫।	মোঃ নুরুল আলম	মোঃ আঃ মান্নান
২৮৬৮৬।	মোঃ আঃ মালেক	মোঃ ছিদ্দিক উল্লাহ
২৮৬৮৭।	শাহ আলম	বজল হক
২৮৬৮৮।	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত মোঃ সুরুজ মিয়া
২৮৬৮৯।	আবুল কালাম	মোঃ আঃ খালেক
২৮৬৯০।	মোঃ আঃ করিম	মৃত মোখলেছার রহমান
২৮৬৯১।	মোঃ কমরুল আহসান	মোঃ আঃ মতিন
২৮৬৯২।	আঃ ছাত্তার চৌধুরী	মোঃ আঃ বারী
২৮৬৯৩।	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মোঃ সরাফত উল্লাহ
২৮৬৯৪।	মোঃ হানিফ	মোঃ আলী আহমেদ
২৮৬৯৫।	নুরুল আমিন	রুহুল আমিন
২৮৬৯৬।	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোহাম্মদ হোসেন
২৮৬৯৭।	আলী আহমেদ	সিরাজুল হক
২৮৬৯৮।	মোঃ আঃ রহীম	মোঃ ইয়াকুব আলী
২৮৬৯৯।	মোঃ মোস্তাফা	মোঃ আঃ আজিজ
২৮৭০০।	মোঃ ইব্রাহিম	নাজির আহমেদ
২৮৭০১।	মোঃ এম, হোসেন	মুন্সী আঃ রাজ্জাক
২৮৭০২।	আবদুল সামাদ	মোঃ ইছাহাক
২৮৭০৩।	মুস্তাফিজুর রহমান	আজিজুর রহমান
২৮৭০৪।	মোঃ মজিবুল হক	মোঃ মুনসুর আলী
২৮৭০৫।	মোঃ শাহা আলম	মোঃ সালাম উল্লাহ
২৮৭০৬।	মোঃ আবু তাহের	মৃত ওমের আলী
২৮৭০৭।	মোঃ ইব্রাহিম	বদু মিয়া
২৮৭০৮।	শামছুদ্দীন আহমেদ	মোঃ শফি উল্লাহ
২৮৭০৯।	মোবারক আলী	মৃত নওয়াব আলী
২৮৭১০।	নুর মোহাম্মদ	ইয়াকুব আলী
২৮৭১১।	আবুল খায়ের ভুঞা	মৃত সালামত উল্লাহ ভুঞা
২৮৭১২।	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ ইদ্রিস মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৭১৩।	মোঃ ওয়ালি উল্লাহ্	মোঃ আহসান উল্লাহ্
২৮৭১৪।	শাহব উদ্দিন	মোঃ আজিজ উল্লাহ্
২৮৭১৫।	মোঃ জামাল উদ্দিন	মোঃ ফয়জুর রহমান
২৮৭১৬।	মোঃ নুর নবী	মোঃ হোসেন মাষ্টার
২৮৭১৭।	মোঃ শাহাজাহান	মৃত আশারদুল্লাহ্ সারেং
২৮৭১৮।	প্রদীপ চন্দ্র কুরী	রশরাজ কুরি
২৮৭১৯।	এ, হামিদ	রুস্তম আলী
২৮৭২০।	মহিউদ্দিন	সৈয়দ আহমেদ
২৮৭২১।	মজিবুল হক	মোঃ সায়েদ উল্লাহ্
২৮৭২২।	আঃ আওয়াল	ইছহাক মিয়া
২৮৭২৩।	এ,কে,এম, শাহাজাহান	এ,কে,এম, আলী করিম
২৮৭২৪।	মোঃ সাইদুর রহমান	মোঃ বদিউজ্জামান
২৮৭২৫।	মোঃ-ইসমাইল	মোঃ আলী আহমেদ
২৮৭২৬।	মোহাম্মদ আলী ভুঞা	আফাক ভুঞা
২৮৭২৭।	মোহাম্মদ উল্লাহ্	আঃ কাদির
২৮৭২৮।	মনির আহমেদ	মোহাম্মদ উল্লাহ্
২৮৭২৯।	মোঃ ওয়াজি উল্লাহ্	নুরুল্লাহ্ মিয়া
২৮৭৩০।	রুহুল আমিন	ফজলুর রহমান
২৮৭৩১।	দ্বীন মোহাম্মদ	মৃত বদু মিয়া
২৮৭৩২।	মোঃ ইসমাইল	মৃত মোঃ ওয়ালিউল্লাহ্
২৮৭৩৩।	ওবায়দুল হক	আঃ রাজ্জাক
২৮৭৩৪।	মোঃ ইব্রাহিম মিয়া	মৌঃ বশীর উদ্দিন আহমেদ
২৮৭৩৫।	মোঃ ওয়ালি উল্লাহ্	মোঃ বশীর উল্লাহ্
২৮৭৩৬।	মোঃ অজি উল্লাহ্	মোঃ মাজু মিয়া
২৮৭৩৭।	মোঃ জামাল উদ্দিন	মোঃ আজিজ উল্লাহ্
২৮৭৩৮।	মোঃ শামছুল হক	মৃত আঃ রহমান
২৮৭৩৯।	অজিত রঞ্জন বড়ুয়া	চন্দ্র মোহন বড়ুয়া
২৮৭৪০।	লুৎফর রহমান	ফজলুর রহমান
২৮৭৪১।	আবদুল মান্নান	মোঃ আঃ হাকিম
২৮৭৪২।	মোঃ গোলাম হায়দর	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৮৭৪৩।	আবু সুফিয়ান	বদিউজ্জামান
২৮৭৪৪।	মোহাম্মদ ছিদ্দিক	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৮৭৪৫।	মোহাম্মদ আবদুল মতিন	এয়াকুব আলী
২৮৭৪৬।	মোঃ সিরাজুল হক চৌধুরী	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৮৭৪৭।	মোঃ আঃ খালেক	মোঃ নওয়াব আলী
২৮৭৪৮।	মোঃ মনজিল মোর্শেদ	মোঃ রাজা মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৭৪৯।	মোঃ শাহাজাহান	মোঃ হারিজ মিয়া
২৮৭৫০।	আঃ ছোবহান	আলী আরশেদ
২৮৭৫১।	মোঃ আঃ আলী	আঃ গফুর
২৮৭৫২।	আবুল হোসেন	আঃ আজিজ
২৮৭৫৩।	মোঃ আঃ সায়েম	মোঃ সেরু মিয়া
২৮৭৫৪।	মোঃ আঃ হাদী	হাজী মোঃ আবুল হোসেন
২৮৭৫৫।	মনির আহমেদ	মোঃ সায়দুল হক
২৮৭৫৬।	সালে আহমেদ	মোঃ আঃ রব
২৮৭৫৭।	মনতাজ উদ্দিন	সায়েদ আলী
২৮৭৫৮।	মোহাম্মদ মোস্তফা	মৃত আঃ হাকিম
২৮৭৫৯।	আবদুল মালেক	নুরুল হক
২৮৭৬০।	আবুল খায়ের	নোয়াব আলী
২৮৭৬১।	আবুল কাশেম	মৃত আঃ ছোবহান
২৮৭৬২।	মোঃ মোস্তফা	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
২৮৭৬৩।	মোঃ হোসেন আলী	হাসমত উল্লাহ্
২৮৭৬৪।	মোঃ বেলায়েত হোসেন	হাজী আজিজ উল্লাহ্ পাটোয়ারী
২৮৭৬৫।	মোঃ শাহা আলম	মোঃ আরিফ মিয়া
২৮৭৬৬।	আবুল হাশেম	মোঃ আরিফ মিয়া
২৮৭৬৭।	অজি উল্লাহ্	ফজলু মিয়া
২৮৭৬৮।	আঃ আউয়াল	আবিদ দফাদার
২৮৭৬৯।	করিমুল হক	আজিজুল হক
২৮৭৭০।	মোঃ রফিক উল্লাহ্	মোঃ আমিন উল্লাহ্ মিয়া
২৮৭৭১।	মোঃ ইছহাক মিয়া	আঃ মজিদ
২৮৭৭২।	সৈয়দ ইলিয়াশ	সৈয়দ গোলাম রহমান
২৮৭৭৩।	মফিজ উল্লাহ্	মকবুল আহম্মদ
২৮৭৭৪।	আবুল খায়ের	মমতাজ মিয়া
২৮৭৭৫।	টি,এম,আঃ আজিজ	মোহাম্মদ আলী
২৮৭৭৬।	মোঃ জহিরুল ইসলাম	আরবের রহমান
২৮৭৭৭।	মোঃ এস,এম, নুর হোসেন	মুন্সি এস, এম, শুদ মিয়া সারন
২৮৭৭৮।	নুর নবী	সোনা মিয়া বেপারী
২৮৭৭৯।	নুর মোহাম্মদ	মোঃ আঃ ছোবহান
২৮৭৮০।	মোঃ আঃ রহমান	মৌলভী হাজিল মিয়া
২৮৭৮১।	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত সুলতান আহমেদ
২৮৭৮২।	তাজুল ইসলাম	দুলা মিয়া
২৮৭৮৩।	মোঃ নুরুল হুদা	মোঃ আলী মিয়া
২৮৭৮৪।	মোঃ ওয়ালী উল্লাহ্	মৃত মৌঃ মনজুর আলী পন্ডিত

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৭৮৫।	আঃ মান্নান	মৌঃ ইউনুস মিয়া
২৮৭৮৬।	আঃ গফুর	আফাজ উদ্দিন
২৮৭৮৭।	আবদুর রহমান	হাবিব উল্লা মিয়া
২৮৭৮৮।	বদিউল আলম	মোঃ নুর মিয়া
২৮৭৮৯।	আঃ ছোবহান	আলী আসাদ
২৮৭৯০।	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ আলী আকবর
২৮৭৯১।	লিয়াকত হোসেন	মুন্সি সৈয়দ আলী
২৮৭৯২।	শেক আহমেদ	মনতাজ মিয়া
২৮৭৯৩।	গোলাম মোস্তফা	মোহাম্মদ উল্লাহ
২৮৭৯৪।	মোঃ আবু জাহের	মোঃ দাইয়ান মিয়া
২৮৭৯৫।	আবুল কাশেম	মোজাহারুল ইসলাম
২৮৭৯৬।	মোঃ জহিরুল হক	মৃত হাজী মমতাজুল হক
২৮৭৯৭।	আঃ লতিফ	আলী আক্কাস
২৮৭৯৮।	আঃ লতিফ	কেরামত আলী
২৮৭৯৯।	মোঃ জয়নাল আবেদীন	আলী আহমেদ
২৮৮০০।	জহির আহমেদ	আককাস মিয়া
২৮৮০১।	আবদুল মান্নান	মৃত কালা মিয়া
২৮৮০২।	মোঃ আবুছায়েদ ভুইয়া	মোঃ ফরিদ আঃ ভুইয়া
২৮৮০৩।	আঃ মান্নান	মৃত ইছাক মিয়া
২৮৮০৪।	আঃ মান্নান	মৃত আজাহার আলী
২৮৮০৫।	আঃ মালেক	আঃ রাজ্জাক
২৮৮০৬।	আবুল কালাম	মোবারক আলী
২৮৮০৭।	সিরজুল ইসলাম	আঃ আজিজ
২৮৮০৮।	মোঃ মীর আবুল কাশেম	মৃত মোঃ মীর আঃ হক
২৮৮০৯।	আঃ মান্নান	মৃত বদিউল আলম
২৮৮১০।	মোঃ শাহাজান	মোঃ মুজাফফর হোসেন
২৮৮১১।	আঃ গোফরান	ফজলুর রহমান
২৮৮১২।	মোঃ গোলাম কবির	মৃত মোঃ আঃ হাকিম
২৮৮১৩।	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ নুরুজ্জান
২৮৮১৪।	আঃ হক	দাদু মিয়া
২৮৮১৫।	জয়নাল আবেদীন	ইছাহাক মিয়া
২৮৮১৬।	মোঃ ইউসুপ সিদ্দিক	আনোয়ার উল্লাহ
২৮৮১৭।	জালাল আহমেদ	নাজির আহমেদ
২৮৮১৮।	আবু জাহের	সিকান্দার মিয়া
২৮৮১৯।	মোঃ শহীদ উল্লাহ	মোঃ ইব্রাহীম

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৮২০।	আমীর হোসেন চৌধুরী	আহমেদ উল্লাহ
২৮৮২১।	আবুল হাসিম	মৃত মফজেল মিয়া
২৮৮২২।	মোঃ লুৎফর রহমান	মৃত মোঃ বক্তিয়ার রহমান
২৮৮২৩।	আঃ মতিন	আঃ করিম
২৮৮২৪।	আমির হোসেন	মৃত দনা মিয়া
২৮৮২৫।	আবুল বাসার	চেরাগ আলী
২৮৮২৬।	আবুল কাশেম	আশ্রাব আলী
২৮৮২৭।	শাহ্ আলম	আঃ হালিম
২৮৮২৮।	মোঃ আবু সাঈদ	চৌধুরী মিয়া
২৮৮২৯।	শামসুল হক	হাবিব উল্লাহ্
২৮৮৩০।	মোঃ ছলিম	মধু মিয়া
২৮৮৩১।	আবদুর রশিদ	সিরাজুল হক
২৮৮৩২।	আবু তাহের পাটোয়ারী	মৌঃ মোহর উল্লাহ্ পাটোয়ারী
২৮৮৩৩।	আবদুস ছোবহান	সুরুজ মিয়া
২৮৮৩৪।	আবুল কালাম	মোঃ সেকান্দার মিয়া
২৮৮৩৫।	মোঃ ইলিয়াশ	মোঃ ইসরাফিল
২৮৮৩৬।	মোঃ আবুল কালাম	মৃত ফজলুর রহমান
২৮৮৩৭।	আবুল বাশার	সুলতান মিয়া
২৮৮৩৮।	আবুল কালাম আজাদ	সেকান্দার মিয়া
২৮৮৩৯।	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	ফজুলুর রহমান
২৮৮৪০।	আঃ মান্নান	আমছল আলী
২৮৮৪১।	মোঃ আমির হোসেন	মোঃ সায়দুল হক
২৮৮৪২।	আবুল হাশেম	এনগুল মিয়া
২৮৮৪৩।	নাজির আহমেদ	মোঃ অলী উল্লাহ্
২৮৮৪৪।	মোঃ আঃ মালেক	ছিদ্দিক উল্লাহ্
২৮৮৪৫।	আঃ মতিন	মৃত জনা মিয়া
২৮৮৪৬।	মোহাম্মদ আলী	আমান উল্লাহ্
২৮৮৪৭।	আবাদ উল্লাহ্	মোহাম্মদ উল্লাহ্
২৮৮৪৮।	আঃ রব	মোঃ ইউনুছ মিয়া
২৮৮৪৯।	এম,এ, মালেক	মৃত মোঃ কালা মিয়া
২৮৮৫০।	মোঃ সোলাইমান মিয়া	মৃত রওশন আলী মোল্লা
২৮৮৫১।	মোঃ ইউসুফ	মৃত আঃ হাকিম
২৮৮৫২।	আঃ হাশেম	আঃ হাকিম
২৮৮৫৩।	আঃ রব	সেরু মিয়া
২৮৮৫৪।	সফি উল্লাহ্	মুন্সি কেরামত আলী
২৮৮৫৫।	মোঃ রফিক উল্লাহ্	মোঃ রায়হান আলী বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৮৫৬।	রফিক উল্লাহ	মজিবুল হক
২৮৮৫৭।	আহসান উল্লাহ	মৃত গোলাম নবী
২৮৮৫৮।	আঃ রব	আলী আক্কাস
২৮৮৫৯।	আঃ রউফ --	নুরুজ্জামান মিয়া
২৮৮৬০।	মোঃ শফি উল্লাহ পাটোয়ারী	মৃত আঃ জব্বার পাটোয়ারী
২৮৮৬১।	মোঃ আবুল হাশেম চৌধুরী	মোঃ মুসলিম মিয়া চৌধুরী
২৮৮৬২।	ছিদ্দিক উল্লাহ	মকরম আলী
২৮৮৬৩।	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া
২৮৮৬৪।	মোঃ আবু তাহের	শরিয়ত উল্লাহ
২৮৮৬৫।	আঃ রশিদ	মোখলেছ আহমেদ
২৮৮৬৬।	মোঃ আইয়ুব উল্লাহ	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৮৮৬৭।	মোঃ শামসুল ইসলাম	মোঃ মজিব উল্লাহ
২৮৮৬৮।	মোহাম্মদ হোসেন	মফিজ উল্লাহ
২৮৮৬৯।	আমির হোসেন	আঃ রশিদ
২৮৮৭০।	আঃ হাশেম	মৃত আরবান আলী
২৮৮৭১।	মোঃ আমির হোসেন	খলিল মিয়া
২৮৮৭২।	মোহাম্মদ হানিফ	মৃত আবেদ মিয়া
২৮৮৭৩।	আবুল কালাম	আমির উল্লাহ
২৮৮৭৪।	আলী হোসেন	আঃ হাকিম
২৮৮৭৫।	শামসুল হক	মৃত ছালামত উল্লাহ
২৮৮৭৬।	মোহাম্মদ হানিফ	আলী আকবর
২৮৮৭৭।	আবুল হাশেম	আবদুল জলিল
২৮৮৭৮।	সালেহ আহমেদ মিয়া	আবুল হাশেম মিয়া
২৮৮৭৯।	আমির হোসেন	আঃ হাকিম
২৮৮৮০।	মোঃ আঃ মান্নান	মৌঃ নাদু মিয়া
২৮৮৮১।	আঃ মান্নান	মৌঃ মফিজ উল্লাহ
২৮৮৮২।	আঃ মান্নান	মোঃ রেনু মিয়া
২৮৮৮৩।	আফজালুর রহমান	মৌঃ মোঃ সাবিদ আলী
২৮৮৮৪।	মোঃ আঃ খালেক	মোঃ ফরিদ মিয়া
২৮৮৮৫।	আবুল কালাম	হাসান আলী
২৮৮৮৬।	মোঃ ওয়াজ উল্লাহ	মৃত নুর আলী মোহরী
২৮৮৮৭।	মোঃ আঃ লতিফ	মৌঃ মোঃ সুলাইমান
২৮৮৮৮।	ফজলুল হক	আতাহার আলী চৌধুরী
২৮৮৮৯।	আবদুস ছোবহান	আব্দুল মজিদ
২৮৮৯০।	আবুল হাশেম	রাশাদ মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৮৯১।	আবুল খায়ের	দায়া মিয়া
২৮৮৯২।	মোহাম্মদ বিদু মিল্যা	দীন মোহাম্মদ খন্দকার
২৮৮৯৩।	আঃ রব	আঃ আজিজ
২৮৮৯৪।	আঃ কাইয়ুম	মোঃ আঃ রহমান
২৮৮৯৫।	ওয়াজি উল্লাহ	বজলুল রহমান
২৮৮৯৬।	আলী করিম	আঃ রহমান
২৮৮৯৭।	আঃ গফুর	মৃত সিরাজুল হক
২৮৮৯৮।	মোঃ আক্কাছ মিয়া	মোঃ আছলাম মিয়া
২৮৮৯৯।	মোঃ আঃ কাদের	মোঃ আঃ আজিজ
২৮৯০০।	মোঃ শামসুল হক	মৃত দায়া মিয়া
২৮৯০১।	আবুল কাশেম	রোস্তম মিয়া
২৮৯০২।	আবুল কালাম	আলী হোসেন
২৮৯০৩।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মোঃ সুলতান
২৮৯০৪।	মোঃ ইসমাইল হোসেন	গোলাম রহমান পাটোয়ারী
২৮৯০৫।	মোঃ আঃ রউফ	মোঃ নোয়াব আলী
২৮৯০৬।	আঃ মান্নান	নুর মিয়া
২৮৯০৭।	আবুল কালাম	মুত আফজল মিয়া
২৮৯০৮।	নুরুল হক চৌধুরী	হাজী হাছান আলী ভুইয়া
২৮৯০৯।	নুরুল হক	হাজী নকু মিয়া
২৮৯১০।	নুর সোলতান	মৃত আছাহাদ মিয়া পাটোয়ারী
২৮৯১১।	এ,টি,এম, আবুল হোসেন	মৌঃ আমিন উল্লাহ মিয়া
২৮৯১২।	আঃ বারিক	চৌধুরী মিয়া
২৮৯১৩।	রুস্তম আলী	হাজী আফজল মিয়া
২৮৯১৪।	নাদিরুজ্জামান	আবজাল মিয়া
২৮৯১৫।	মোঃ হারুন উর রশিদ	মোঃ কালা মিয়া
২৮৯১৬।	মোহাম্মদ উল্লাহ	মৃত ফরিদ মিয়া
২৮৯১৭।	মোঃ আবু তাহের ভুইয়া	মৃত মৌঃ এমদাদ উল্লাহ ভুইয়া
২৮৯১৮।	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ সেরু মিয়া
২৮৯১৯।	মোহাম্মদ নুর নবী	মৌঃ আতার উল্লাহ
২৮৯২০।	আঃ রহিম	মৃত আব্দুস ছোবহান
২৮৯২১।	নুর নবী	মৃত রুস্তম আলী
২৮৯২২।	মোঃ ইউসুফ মিয়া	মৃত মৌঃ আলাছ মিয়া
২৮৯২৩।	মোমেন উল্লাহ	মৌঃ তরিক উল্লাহ
২৮৯২৪।	আঃ মজিদ	কোরবান আলী
২৮৯২৫।	মোঃ ইউসুফ মিয়া	মোঃ আব্বাস খান
২৮৯২৬।	মোঃ ইব্রাহীম	মোঃ আইয়ুব আলী

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৯২৭।	হারাধন রায়	যোগেন্দ্র কুমার রায়
২৮৯২৮।	মোঃ সিরাজ উল্লাহ	মোঃ চাঁন মিয়া
২৮৯২৯।	শাহাব উদ্দিন	আমিন উল্লাহ
২৮৯৩০।	আঃ ছাত্তার	সুরুজ মিয়া
২৮৯৩১।	আবদুর রব	মুনু মিয়া
২৮৯৩২।	আবদুর রব	মুজাফর আলী
২৮৯৩৩।	আবদুর রাজ্জাক	মোহাম্মদ উল্লাহ
২৮৯৩৪।	গোলাম মাওলা	মোঃ নুর মিয়া
২৮৯৩৫।	মীর হোসেন	আবদুস সোবহান

খন্ড নং-১১৮

জিলা ঃ- লক্ষীপুর (নোয়াখালী) থানা/উপজিলাঃ- লক্ষ্মীপুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৯৩৬।	মোঃ মনির হোসেন	ডাঃ মোজাম্মেল হক
২৮৯৩৭।	মোঃ নুরুন নবী	মোঃ আনিসুর রহমান
২৮৯৩৮।	মোঃ আবুল হাশেম	মোঃ আবদুল্লাহ মিয়া
২৮৯৩৯।	মোঃ আবদুস ছাত্তার	মৌ নুর মোহাম্মদ
২৮৯৪০।	মোঃ আবুল কালাম	মৃত মোঃ সায়েদ উল্লাহ
২৮৯৪১।	এ,কে,এম শাহজাহান	মোঃ ফরিদ আহমেদ
২৮৯৪২।	মোঃ মোশাররফ হোসেন	মোঃ আবদুল জব্বার
২৮৯৪৩।	মোঃ আবু সায়েদ	মোঃ আবদুল বারী
২৮৯৪৪।	মোঃ শফিক উল্লাহ	মোঃ শামসুল হক পাটোয়ারী
২৮৯৪৫।	মোঃ শফিক উল্লাহ	মোঃ বাদশা মিয়া
২৮৯৪৬।	মোঃ মফিজ উল্লাহ	মোঃ শামসুল হক
২৮৯৪৭।	আবুল কালাম	ফজলুর রহমান
২৮৯৪৮।	মোঃ হাবিব উল্লাহ	মৃত সায়েদুল হক
২৮৯৪৯।	মোঃ শাহ আলম	নুর মোহাম্মদ
২৮৯৫০।	মোঃ শামসুল হুদা	আজিজ উল্লাহ পাটোয়ারী
২৮৯৫১।	মোঃ নুর নবী	মোঃ আবিদ উল্লাহ
২৮৯৫২।	মোঃ আবুল খায়ের	মোঃ সালামত উল্লাহ বেপারী
২৮৯৫৩।	মোঃ নুর মোহাম্মদ	মোঃ সেকেন্দার মিয়া
২৮৯৫৪।	আবদুর রউফ	শাহাদত উল্লাহ
২৮৯৫৫।	শামসুদ্দিন	আবদুল হাকিম
২৮৯৫৬।	শেখ মুহিউদ্দিন	নজিবুল হক বায়েন
২৮৯৫৭।	মোঃ শাহ আলম	মোঃ মফিজ উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৯৫৮।	মোঃ আলী আহমেদ	মৌঃ হাবিব উল্লাহ
২৮৯৫৯।	মোঃ লুৎফর রহমান	মোঃ নাজির মিয়া
২৮৯৬০।	মোঃ আবদুস সাত্তার	মৌঃ আঃ মান্নান
২৮৯৬১।	হোসেন আহমেদ	আঃ ছাত্তার ভুইয়া
২৮৯৬২।	আবদুল খালেক	মুনসুর আলী
২৮৯৬৩।	মোঃ রহমত উল্লাহ	মৃত হাবিব উল্লাহ
২৮৯৬৪।	মোঃ হাসানুল হায়দার	মৌঃ মোজাফফর আহমেদ মিয়া
২৮৯৬৫।	মজিবুল হক	আজিদ উল্লাহ
২৮৯৬৬।	মফিজ উল্লাহ পাটোয়ারী	শামসুল হক পাটোয়ারী
২৮৯৬৭।	মোহাম্মদ মোস্তফা	আহম্মদ উল্লাহ
২৮৯৬৮।	মোঃ আঃ আহাদ	আবদুল কুদ্দুস
২৮৯৬৯।	আবদুল মতিন	মমতাজুর রহমান মিয়া
২৮৯৭০।	মোঃ তোফায়েল আহমেদ খান	মোঃ বশির উল্লা খান
২৮৯৭১।	মোঃ কুদ্দুস মিয়া	মোঃ আঃ মন্নান
২৮৯৭২।	এস,ও,এম; কলিম উল্লাহ	দায়েম মিয়া
২৮৯৭৩।	আবু তাহের	আবদুল মজিদ
২৮৯৭৪।	নবী উল্লাহ	আবেদ মিয়া
২৮৯৭৫।	মোঃ নুরুল্লা মিয়া	মোঃ হাসমত উল্লাহ
২৮৯৭৬।	নুর মোহাম্মদ	মৃত মনু মিয়া
২৮৯৭৭।	মোঃ আবুল হোসেন	মৌঃ জয়নুল আবেদীন
২৮৯৭৮।	আনসার উদ্দিন আহমেদ	মোঃ আজিজ উল্লাহ
২৮৯৭৯।	মোঃ জয়নাল আবেদীন	ওবায়দুল্লাহ
২৮৯৮০।	গাজী আবু তাহের	মৌঃ আলী উল্লাহ
২৮৯৮১।	মোঃ শহিদ উল্লাহ	মুন্সি আফাজ উদ্দিন
২৮৯৮২।	আমানত উল্লা মিয়া	এছাহাক মিয়া
২৮৯৮৩।	আবদুল আউয়াল	মৃত আবদুল হাসেম
২৮৯৮৪।	আমানত উল্লাহ	আনোয়ারুল হক
২৮৯৮৫।	ছাইদুল হক	আঃ গফুর মিয়া
২৮৯৮৬।	আবু জাফর	মৃত মৌঃ মকবুল আহমেদ
২৮৯৮৭।	হাফিজ উল্লাহ	মৃত হাবিব উল্লাহ খান
২৮৯৮৮।	তোফাজ্জেল হোসেন	নুরুজ্জামান মাতুব্বর
২৮৯৮৯।	আবুল খায়ের মিঞা	হাফেজ ফয়েজ বক্স
২৮৯৯০।	আলী হোসেন	মৃত আঃ মোনাফ
২৮৯৯১।	আনসার উদ্দিন আহমেদ	আজিজ উল্লাহ
২৮৯৯২।	আনোয়ার	রেনু মিয়া
২৮৯৯৩।	আবদুর রহমান	মৌঃ হাফিজ উল্লা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৮৯৯৪।	মোঃ আবুল খায়ের	মোঃ ফরিদ মিয়া
২৮৯৯৫।	মোঃ নুরুল আমিন	সৈয়দ আহমেদ
২৮৯৯৬।	আমির হোসেন	আহম্মদ হোসেন
২৮৯৯৭।	আলী আহাম্মদ	মৃত মৌঃ মোঃ নিয়াজ আলী
২৮৯৯৮।	কাজী আহসান উল্লাহ	মৃত কাজী আমিন উল্লাহ
২৮৯৯৯।	আবু সায়েদ	ছাফায়েত উল্লাহ
২৯০০০।	শাহেদ আলম	লকিত উল্লাহ
২৯০০১।	আঃ মতিন	মোঃ নুরুল হক মিয়া
২৯০০২।	মোঃ মোজাম্মেল হক মিয়া	হাজী আমিন উল্লা পাটোয়ারী
২৯০০৩।	শামসুদ্দিন আহমেদ	হাজী কবির উদ্দিন
২৯০০৪।	এ, জেড, শাহজাহান	মোঃ কালা মিয়া বেপারী
২৯০০৫।	এ, কে, এম, বশির উল্লা	মোঃ ফরিদ মিয়া
২৯০০৬।	মোঃ আকরাম	ইউনুস মিয়া
২৯০০৭।	মোঃ ইব্রাহীম	মোঃ শামসুল হক
২৯০০৮।	নুর নবী	সাঈদ হক
২৯০০৯।	বদিউর রহমান	শেখ তরীক আলী
২৯০১০।	মোঃ আবুল কালাম	মৌঃ আঃ সালাম
২৯০১১।	আঃ মমিন	মোঃ নুরুল হক মিয়া
২৯০১২।	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মৌঃ হাবিবুল্লাহ
২৯০১৩।	নুরুল হক	জাবেদ উল্লাহ ভুইয়া
২৯০১৪।	মোঃ আবুল কাশেম	মৌঃ আবিদ উল্লাহ
২৯০১৫।	ছায়াফ উল্লাহ	মৃত আজিজ উল্লাহ মুন্সী
২৯০১৬।	শাহ আলম	মৃত আঃ হামিদ
২৯০১৭।	মাহবুব উল্লাহ ভুইয়া	মৃত মোঃ ওয়ালি উল্লাহ ভুইয়া
২৯০১৮।	রফিক উল্লাহ	মৃত ইনচ মিয়া
২৯০১৯।	আবদুর রোপ	চকু মিয়া
২৯০২০।	মোঃ আছাফুদ্দিন আহমেদ	মোঃ মুজিবুল্লাহ

জিলাঃ লক্ষীপুর (নোয়াখালী) থানা/উপজেলাঃ- রায়পুর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯০২১।	মোঃ তোফায়েল আহমেদ	মোঃ হাবিবুল্লাহ
২৯০২২।	মোহাম্মদ হোসেন	মোঃ মিনাত উল্লাহ
২৯০২৩।	মোঃ সেকান্দর আলী	মোঃ সমত উল্লা
২৯০২৪।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	হাফিজ আবদল সোবহান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯০২৫।	মোঃ সিরাজ মিয়া	নুরুল হক
২৯০২৬।	নিজাম উদ্দিন ভুইয়া	তাহের উদ্দিন ভুইয়া
২৯০২৭।	আজিত উল্লা	মোনতাজ উদ্দিন
২৯০২৮।	আয়াত উল্লা	কালা মিয়া
২৯০২৯।	নাজির আহমেদ	আহম্মদ উল্লা
২৯০৩০।	মোঃ শফিক উল্লা	মোঃ এমদাদ উল্লা
২৯০৩১।	মোঃ মহসিন	মোঃ সায়েদুল হক মিয়া
২৯০৩২।	মোঃ মজিবর রহমান	মোঃ আনোয়ারুল হক
২৯০৩৩।	মোঃ মফিজ উল্লাহ	কালা মিয়া
২৯০৩৪।	আবদুল মতিন	আহম্মদ উল্লা ভুইয়া
২৯০৩৫।	মোঃ সেকেন্দার আলী	মোঃ মুজিবুল হক বেপারী
২৯০৩৬।	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	মোঃ সামসুল হক
২৯০৩৭।	আলী আকতার	লুৎফর রহমান পাটোয়ারী
২৯০৩৮।	মোঃ তছলিম উদ্দিন	মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী
২৯০৩৯।	আনোয়ার হোসেন	নুরুল ইসলাম
২৯০৪০।	মোঃ সৈয়দ আহমেদ	মোঃ কেরামত আলী
২৯০৪১।	মোঃ আবুল হোসেন	আহমেদ আলী খান
২৯০৪২।	মোঃ আবদুল মান্নান	মোঃ সামসুল হক
২৯০৪৩।	মোঃ রফিক উল্লা	মোঃ আশরাব আলী
২৯০৪৪।	মোঃ রহুল আমিন	ছাদেক আলী বেপারী
২৯০৪৫।	আবদুল হাকিম	মৃত আঃ মোতালেব হাওলাদার
২৯০৪৬।	শাহজাহান মিঞা	মোঃ দুদু মিয়া
২৯০৪৭।	মোঃ হানিফ	ফাজিল হক
২৯০৪৮।	আঃ মজিদ	আঃ লতিফ
২৯০৪৯।	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মোঃ ওয়াছেল
২৯০৫০।	মোঃ আঃ মতিন	মোঃ হেদায়েত উল্লা
২৯০৫১।	মোঃ আবদুল মান্নান	মোঃ নুর আহমেদ
২৯০৫২।	মোঃ আছান হাবিব	মোঃ বাদশা মিয়া
২৯০৫৩।	শাহ জালাল পাঠান	ডাঃ জবেদ উল্লা পাঠান
২৯০৫৪।	মোঃ চন্নু মিয়া	অজি উল্লা মিয়া
২৯০৫৫।	মোহাম্মদ চৌধুরী	আরমান আলী
২৯০৫৬।	মোঃ মহসিন	মোঃ অজি উল্লা
২৯০৫৭।	ফজল আহমেদ	জবেদ উল্লা ছুফানী
২৯০৫৮।	মোঃ আলী হায়দার	আবদুল মজিদ
২৯০৫৯।	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	রশিদ সরকার
২৯০৬০।	মোঃ তোহা মিয়া	মাওলানা হাজী হাফেজ আবদুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯০৬১।	নুরুজ্জামান	মোঃ ইয়নুছ বেপারী
২৯০৬২।	শ্রী কানাই লাল মজুমদার	শ্রী শশধর মজুমদার
২৯০৬৩।	আবুল কালাম	মৃত বশির উল্লা পাটোয়ারী
২৯০৬৪।	আঃ জলিল মিয়া	আঃ সোবহান ক্বারী
২৯০৬৫।	মোঃ আবু জাফার	মোঃ নুর বক্স বেপারী
২৯০৬৬।	মোঃ শামসুল আলম	সুলতান আহমেদ মাষ্টার
২৯০৬৭।	মোঃ আলী আকবর	আশ্বদ আলী খলিফা
২৯০৬৮।	মমতাজ উদ্দিন	মোঃ হেদায়েত উল্লা মুন্সী
২৯০৬৯।	আহছান উল্লা	মৃত আঃ ছাত্তার
২৯০৭০।	মোঃ আমিন	সুলতান আলী মুন্সী
২৯০৭১।	আঃ হালিম	আঃ রশিদ পাটোয়ারী
২৯০৭২।	আঃ খালেক	নুর মোহাম্মদ
২৯০৭৩।	শফি উল্লা মোল্লা	সাহাদ উল্লা মোল্লা
২৯০৭৪।	মোঃ সেকেন্দার আলী	মোঃ ইব্রাহীম
২৯০৭৫।	মোঃ আমির হোসেন	মোঃ আজিজ মিয়া
২৯০৭৬।	মোঃ আহসান উল্লা	মোহাম্মদ মিয়া হাওলাদার
২৯০৭৭।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ রহিম আলী মোল্লা
২৯০৭৮।	মোঃ আঃ মান্নান	হাজী মোঃ আঃ আজিজ
২৯০৭৯।	মোঃ ছানা উল্লা	হাফেজ ইসমাইল ভুইয়া
২৯০৮০।	মোঃ সৈয়দ আহমেদ	মোঃ শামসুল হক
২৯০৮১।	মোঃ আয়াত উল্লা	মোঃ শাহাদ উল্লাহ
২৯০৮২।	আমির হোসাইন	ফজলুর রহমান
২৯০৮৩।	এ,কে,এম, আঃ মতিন	আনোয়ার উল্লা পাটোয়ারী
২৯০৮৪।	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	কাজী ছানা উল্লাহ
২৯০৮৫।	ফয়েজ উদ্দিন	ইমদাদ উল্লাহ ভুইয়া
২৯০৮৬।	মোঃ লনী মিয়া দেওয়ান	বশির উদ্দিন দেওয়ান
২৯০৮৭।	সৈয়দ আহমেদ	খায়েদুল হক

জিলাঃ- লক্ষীপুর (নোয়াখালী) থানা/উপজেলাঃ- রামগতি

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯০৮৮।	অহিদুল হক	মৃত মুন্সি মুনসুর আহমেদ
২৯০৮৯।	মোঃ আবু শহীদ	মৃত তাজুল আহমেদ
২৯০৯০।	আবদুল মতিন	মোঃ ইছাক

Dhaka University Institutional Repository

জিলাঃ- লক্ষীপুর (নোয়াখালী) থানা/ উপজেলাঃ- রামগঞ্জ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯০৯১।	আবুল হাশেম	আঃ গফুর
২৯০৯২।	মোঃ আশ্‌রাফ আলী	মৃত ফজলুল হক
২৯০৯৩।	আবুল কালাম	চান্দ মিয়া
২৯০৯৪।	আবুল হোসেন	সেকেন্দার ভুঞা
২৯০৯৫।	আনোয়ার উল্লাহ	কালা মিয়া
২৯০৯৬।	মোঃ আঃ রশিদ	মোঃ রুস্তম আলী
২৯০৯৭।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	জামাল মিয়া পাটোয়ারী
২৯০৯৮।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৯০৯৯।	মোঃ আনোয়ার উল্লাহ	লাল মিয়া
২৯১০০।	মোঃ ফারুক আহম্মদ	শামছুল হক
২৯১০১।	আবদুল ওদুদ	মীর আবুল হোসেন
২৯১০২।	তাজুল ইসলাম	মোহাম্মদ উল্লা মুন্সী
২৯১০৩।	মোঃ মফিজ উল্লা	মোঃ আঃ রশিদ সুকানী
২৯১০৪।	মোঃ এনায়েত উল্লা	মোঃ আঃ রশিদ
২৯১০৫।	মোঃ মিজানুর রহমান	ফজলুর রহমান
২৯১০৬।	মোঃ নুরুল হুদা	মোঃ কালা মিয়া পাটোয়ারী
২৯১০৭।	আবু সাইদ	মৃত সিরাজুল হক পাটোয়ারী
২৯১০৮।	আঃ ওয়াদুদ পাটোয়ারী	মনসুর আহাম্মদ পাটোয়ারী
২৯১০৯।	আবু তাহের	ওলিউল্লা পাটোয়ারী
২৯১১০।	মোঃ আবু তাহের	মৌঃ আবদুল কাদের
২৯১১১।	মোঃ নূর হোসেন	মোঃ মকবুল আহম্মদ
২৯১১২।	মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী	মোঃ শামছুল ইসলাম পাটোয়ারী
২৯১১৩।	আঃ কালাম আজাদ	মোসলেম ভুঞা
২৯১১৪।	মোঃ নাজির আহম্মদ	মোঃ মকবুল আহাম্মদ
২৯১১৫।	নন্দ নিমাই কুমার রায়	প্রানেশ্বর কুমার রায়
২৯১১৬।	মোঃ ছামছুল হক	মোঃ আঃ কাদের পাটোয়ারী
২৯১১৭।	মহিন উদ্দিন	মুসলিম মিয়া
২৯১১৮।	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ মোবারক উল্লা
২৯১১৯।	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ জালাল আহম্মদ মল্লিক
২৯১২০।	এম,এ, তাহের	আঃ জামিদ
২৯১২১।	মোঃ সেকেন্দার মিয়া	মোঃ সৈয়দ বেপারী
২৯১২২।	হোসেন আহম্মদ	মৌঃ জিতু মিয়া পাটোয়ারী
২৯১২৩।	মোঃ সৈয়দ উল্লা	মোঃ আঃ গনি
২৯১২৪।	মোঃ হান্নানুল ইসলাম	মৃত আমিন উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯১২৫।	আরুন-অর রশিদ	ফয়েজ বক্স
২৯১২৬।	মোঃ হারু-অর রশিদ	মোঃ আবু তাহের
২৯১২৭।	আলমগীর হোসেন	মৌঃ বাকু মিয়া
২৯১২৮।	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	মোঃ আছাদ উল্লা ভুঞা
২৯১২৯।	মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার	মোঃ নুরুল আহমেদ
২৯১৩০।	নাসির উদ্দিন	মোঃ মাজাহারুল হক
২৯১৩১।	মোঃ নুর শফি	মোঃ মফিজ উল্লা
২৯১৩২।	হরলাল দেবনাথ	কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ
২৯১৩৩।	মোঃ জামাল	মোঃ রমজান আলী
২৯১৩৪।	মোঃ সেকেন্দার ভুঞা	মোঃ আঃ গফুর ভুঞা
২৯১৩৫।	মোঃ আঃ কালাম আজাদ	মোঃ হোসেন
২৯১৩৬।	আঃ খায়ের	সৈয়দ আহম্মদ বেপারী
২৯১৩৭।	মোঃ এনায়েত হোসেন	মোঃ জামাল উদ্দিন
২৯১৩৮।	মোঃ লোকমান	মোঃ মুসা মিয়া
২৯১৩৯।	মোঃ হোসেন পাটোয়ারী	মোঃ খলিলুর রহমান
২৯১৪০।	মোঃ শফিক	আলী আকবর
২৯১৪১।	মোঃ শাহজাহান	সেকেন্দার মাষ্টার
২৯১৪২।	মোঃ আলী আকবর	মৌঃ সোনা মিঞা
২৯১৪৩।	মোঃ তাজুল ইসলাম	মোঃ নুরুল ইসলাম
২৯১৪৪।	বরকত উল্লা	মোঃ মাজহারুল হান্নান
২৯১৪৫।	আবুল বাসার	ফজলুল হক
২৯১৪৬।	আঃ কাশেম ভুঞা	মোঃ শামছুল হক ভুঞা
২৯১৪৭।	মোতাহার হোসেন	এমদাদ উল্লা
২৯১৪৮।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	জয়নাল আবেদীন
২৯১৪৯।	এম,এ, হান্নান ভুঞা	সামছুল হক ভুঞা
২৯১৫০।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোঃ মফিজ উল্লা
২৯১৫১।	মোঃ বজলুর রহমান	ইদ্রিস মিয়া
২৯১৫২।	আঃ মন্নাফ	মৃত আঃ হাকিম
২৯১৫৩।	আহাম্মদ উল্লা	নুর মিয়া
২৯১৫৪।	নরেশ কুমার চন্দ্র	নাখুতু কুমার চন্দ্র
২৯১৫৫।	মোঃ আমিন উল্লা	মোঃ হাবিব উল্লা
২৯১৫৬।	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত মৌঃ বাসু উল্লা
২৯১৫৭।	মোঃ আনোয়ারুল হক	মোঃ রাজা মিয়া
২৯১৫৮।	নজরুল হক চৌধুরী	মজিবুর হক চৌধুরী
২৯১৫৯।	এম,এ, ছাত্তার	মৃত আঃ জব্বার
২৯১৬০।	মোঃ ইব্রাহিম পাটোয়ারী	আঃ জব্বার পাটোয়ারী

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯১৬১।	মোঃ ইকবাল আজাদ	মোঃ আসলাম ভুঞা
২৯১৬২।	মোঃ মজিবুল হক	মোঃ কেরামত আলী
২৯১৬৩।	মোঃ মুসলিম উদ্দিন	আসলাম মিঞা মন্ডল
২৯১৬৪।	সহিদউল্লা	মৃত কালা মিয়া
২৯১৬৫।	মোজাহারুল ইসলাম	মোঃ আঃ গনি মোল্লা
২৯১৬৬।	মোঃ ইউছুব আলী	মোঃ ইউনুস মিয়া
২৯১৬৭।	আবু তাহের	মৃত মোঃ ওবাদ উল্লা
২৯১৬৮।	দুদু মিয়া	মনির উদ্দিন মিয়া
২৯১৬৯।	মোঃ তবারক উল্লা	কলিম উদ্দিন
২৯১৭০।	মোঃ নুরুল হুদা	মুন্সী আবদুল লতিফ
২৯১৭১।	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৌঃ ফজলুল হক
২৯১৭২।	মোঃ নুরুল আমিন	ডাঃ মফিজ উদ্দিন
২৯১৭৩।	নুর-মোহাম্মদ ভুঞা	মৃত মোঃ ইউনুছ আলী ভুঞা
২৯১৭৪।	এ,বি,এম, হারিছ আহমেদ	মোঃ আঃ জব্বার
২৯১৭৫।	আঃ হাশেম	সোনা মিয়া শেখ
২৯১৭৬।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	এম,এ, হান্নান
২৯১৭৭।	মোঃ আবদুর রাজ্জাক ভুঞা	মৃত মৌঃ ছবেদ উল্লা ভুঞা
২৯১৭৮।	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	ওলি উল্লাহ
২৯১৭৯।	মোঃ জামাল	মোঃ আঃ হাসিম
২৯১৮০।	এম,এ, কাশেম	মৌঃ খলিলুর রহমান
২৯১৮১।	জয়নাল আবেদীন	সৈয়দ আলী
২৯১৮২।	মোঃ মোখলেছুর রহমান পাটোয়ারী	মোঃ মুসলিম পাটোয়ারী
২৯১৮৩।	সিরাজুল ইসলাম	নাদেরুজ্জামান
২৯১৮৪।	মোঃ ইউছুফ	মোঃ রফিক উল্লা
২৯১৮৫।	মোঃ ছামছুল আলম	গোলাম রহমান
২৯১৮৬।	এস,কে চান্দ	এন,কে চান্দ
২৯১৮৭।	মাসুম মোঃ মহসিন চৌধুরী	মোঃ আঃ ওহাব
২৯১৮৮।	মোঃ সোবাহান	নুর মোহাম্মদ
২৯১৮৯।	আবুল কাশেম	ইদ্রিস মোল্লা
২৯১৯০।	আঃ মালেক	সোনা মিয়া মোল্লা
২৯১৯১।	আঃ কাশেম	আবেদ আলী
২৯১৯২।	মোঃ আবুল বাসার	আঃ গনি শেখ
২৯১৯৩।	মোঃ আঃ কাশেম	নুরু মিয়া
২৯১৯৪।	আঃ আজিজ	মোহাম্মদ হোসেন
২৯১৯৫।	আবুল কাশেম	মৃত মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৯১৯৬।	আবুল কালাম	সায়েদুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯১৯৭।	আবুল কাশেম	জয়নাল আবেদীন
২৯১৯৮।	আবুল কাশেম	সোনা মিয়া
২৯১৯৯।	আবু তাহের	মৌঃ জয়নাল আবেদীন
২৯২০০।	নুরুল ইসলাম	মৃত আঃ মজিদ পাটোয়ারী
২৯২০১।	খোরশেদ আলম	সিদ্দিক ভুঞা
২৯২০২।	মহরম আলী	আঃ রহমান
২৯২০৩।	মোঃ আবদুল হোসেন	আঃ সোবাহান
২৯২০৪।	আঃ জলিল	হাফেজ রুস্তম আলী
২৯২০৫।	মোঃ ইউনুস ভুঞা	হাজী কালা মিয়া ভুঞা
২৯২০৬।	এম,এ, গোফরান	মৌঃ সায়েদুর রহমান
২৯২০৭।	আঃ রহিম	আতর আলী
২৯২০৮।	মোঃ খলিল	মোঃ এয়াকুব আলী শেখ
২৯২০৯।	আবদুর রশিদ	কালা মিয়া ব্যাপারী
২৯২১০।	রুহুল আমিন মোল্লা	লুৎফর রহমান মোল্লা
২৯২১২।	মোঃ আবদুল মালেক	মৃত মোঃ আতর মিয়া
২৯২১৩।	গোলাম রহমান	আছাদ উল্লা
২৯২১৪।	শফিকুর রহমান	হাবিবুল্লা
২৯২১৫।	আবু জাফর	মৃত মোঃ হোসেন
২৯২১৬।	মোঃ আবুল কাশেম	আমির হোসেন
২৯২১৭।	আবুল কাশেম	মৃত জহরাজ মিয়া
২৯২১৮।	আঃ রহিম	মৃত আঃ গনি পন্ডিত
২৯২১৯।	আঃ কাশেম	মৃত জালাল আহম্মদ মুন্সী
২৯২২০।	মোঃ আলী আকবর খান পাঠান	কুব্বত খান পাঠান
২৯২২১।	সামছুল হুদা ভুঞা	বসরত উল্লা ভুঞা
২৯২২২।	মোঃ এ, আউয়াল	মোঃ হোসেন পাটোয়ারী
২৯২২৩।	সিরাজ মিয়া	মৃত আনু মিয়া
২৯২২৪।	আবুল কাশেম	তরিখ মিয়া
২৯২২৫।	আঃ হামিদ	আকবর মোল্লা
২৯২২৬।	শেখ মোঃ গোফরান	শেখ আহাম্মদ হোসেন
২৯২২৭।	মোঃ শহিদ উল্লা	মোঃ জিগির মিয়া
২৯২২৮।	আঃ মাকিম	মোসলেম মিয়া ব্যাপারী
২৯২২৯।	আঃ হাকিম	আহম্মদ সওদাগর
২৯২৩০।	সফি উল্লা	আনোয়ার আলী
২৯২৩১।	মোঃ সফি উল্লা	বধু মিয়া
২৯২৩২।	আমির হোসেন ভুঞা	আমিন উদ্দিন ভুঞা
২৯২৩৩।	সুলতান আহম্মদ	আঃ আজিজ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯২৩৪।	মোঃ সহিদ উল্লা পাটোয়ারী	মোঃ করিম বক্স পাটোয়ারী
২৯২৩৫।	এ,কে,এম,আঃ মতিন	আনোয়ার উল্লা পাটোয়ারী
২৯২৩৬।	মোঃ সোনা মিয়া	মৃত আব্দুর রহমান শেখ
২৯২৩৭।	সাইদুল হুক	মৃত এলাহী বক্স
২৯২৩৮।	মোসাররফ হোসেন	আঃ জলিল পাটোয়ারী
২৯২৩৯।	নুর মোহাম্মদ পাটোয়ারী	আঃ ছালাম পাটোয়ারী
২৯২৪০।	মোঃ আঃ মালেক	মোঃ আঃ গনি
২৯২৪১।	আবদুল হাই	দুলা মিয়া ব্যাপারী
২৯২৪২।	মোঃ আঃ খালেক দেওয়ান	মৌঃ আঃ মান্নান দেওয়ান
২৯২৪৩।	আঃ হোসেন	তোরা মিয়া
২৯২৪৪।	আঃ বারী	বাদশা মিয়া পাটোয়ারী
২৯২৪৫।	আঃ খালেক	কালা মিয়া
২৯২৪৬।	সাইদুর রহমান	বদু মিয়া মুন্সী
২৯২৪৭।	আঃ রব	মৃত খলিলুর রহমান
২৯২৪৮।	মোঃ আঃ হাসেম	মোঃ কালা মিয়া পাটোয়ারী
২৯২৪৯।	মোঃ আনোয়ারুল আলম	নুর মোহাম্মদ
২৯২৫০।	মোঃ আনোয়ার উল্লা	মোঃ আকতারুজ্জামান
২৯২৫১।	মোঃ আবদুল্লা	মৌঃ হাসমোত উল্লা
২৯২৫২।	শরিফ উল্লা	সরাফত আলী
২৯২৫৩।	আবদুল রব	অলি উল্লা খলিফা
২৯২৫৪।	মোঃ সুলেমান মোল্লা	মোঃ আতিকুল্লা
২৯২৫৫।	মোঃ আঃ কাশেম	মৌঃ ওলি উল্লা
২৯২৫৬।	মোঃ আঃ কুদ্দুস	মোঃ জয়নাল আবেদীন
২৯২৫৭।	সিরাজুল ইসলাম	জয়নাল আবেদীন
২৯২৫৮।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মোঃ ইদ্রিস মিয়া
২৯২৫৯।	রফিক উল্লা	মৃত আমিন উদ্দিন
২৯২৬০।	মোঃ আবদুস সবুর ভুঞা	মোঃ আবদুল খালেক ভুঞা
২৯২৬১।	আবুল হাসেম	আবদুল আজিজ
২৯২৬২।	মোঃ ফজল করিম	মোঃ আমিন উল্লাহ
২৯২৬৩।	আবদুস ছাত্তার	মৃত হাজী কালা মিয়া
২৯২৬৪।	মোঃ এ মান্নান সেখ	মোঃ এ, কাদের সেখ
২৯২৬৫।	ছিদ্দিকুর রহমান	ফজলুর রহমান
২৯২৬৬।	আমির হোসেন	মৃত হুলেমান পাটোয়ারী
২৯২৬৭।	মোঃ রফিক উল্লা	মোঃ রহমত উল্লা
২৯২৬৮।	রুহুল আমিন	মোঃ রফিকুল ইসলাম
২৯২৬৯।	মোঃ সহিদ উল্লা	আবজল ভুইয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯২৭০।	আবুল হোসেন	আবদুল আজিজ
২৯২৭১।	মোঃ শহিদুল্লা	মোঃ লুৎফর রহমান
২৯২৭২।	আলি আজম	আবদুল সামাদ
২৯২৭৩।	আবুল কাশেম	মৃত ইউনুছ মুন্সী শেখ
২৯২৭৪।	মোঃ শরিয়ত উল্লা	মোঃ সায়েদ ভুঞা
২৯২৭৫।	আবুল কাসেম	মকবুল আহমেদ

খন্ড নং-১২০

জিলাঃ- ফেণী

থানা/উপজেলাঃফেণী সদর

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯২৭৬।	আঃ হাই	আঃ হামিদ
২৯২৭৭।	আঃ হাই	দলিলার রহমান
২৯২৭৮।	নিজাম উদ্দিন	মৃত আহসান উল্লাহ
২৯২৭৯।	মোঃ আমিন উদ্দিন	মোঃ রহিম উদ্দিন
২৯২৮০।	মোঃ আলা উদ্দিন	পায়নী মিয়া
২৯২৮১।	মোঃ রুহুল আমিন	মৌঃ মমতাজুল হক
২৯২৮২।	এম,কে,এম, আকরামুল হক চৌধুরী	দলিলুর রহমান চৌধুরী
২৯২৮৩।	মোঃ ইয়াকুব আলী	মাষ্টার লুৎফর হক
২৯২৮৪।	মোঃ আঃ রহমান	বজলার রহমান
২৯২৮৫।	মান্নান	আঃ ছোবহান
২৯২৮৬।	নুর ইসলাম খন্দকার	মৃত মোখলেছুর রহমান কন্দকার
২৯২৮৭।	মোঃ মকবুল আহমেদ	করম বক্স
২৯২৮৮।	আঃ রউফ	মমতাজ মিয়া
২৯২৮৯।	মোজাম্মেল হোসেন	ডাঃ দেলোয়ার হোসেন
২৯২৯০।	আবুল হোসেন	মৃত মোঃ ইউনুস মিয়া
২৯২৯১।	মোঃ বেলায়েত হোসেন	মোঃ আলী আজম
২৯২৯২।	আঃ লতিফ	মোখলেছুর রহমান
২৯২৯৩।	মোঃ খায়েজ আহম্মদ	মোঃ আহম্মদ
২৯২৯৪।	রুহুল আমিন	গোলাম আলী
২৯২৯৫।	আবুল খায়ের	আঃ খালেক
২৯২৯৬।	আমিনুল হক	আঃ গফুর
২৯২৯৭।	আঃ রউফ	আঃ মালেক
২৯২৯৮।	যদু গোপাল ভৌমিক	জশিদা কুমার ভৌমিক
২৯২৯৯।	মোঃ আলা উদ্দিন	সুলতান আহম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৩০০।	মনির আহম্মদ	ওয়ালী আহাম্মদ
২৯৩০১।	মৌঃ শাহ আলম	ঈমান আলী মাষ্টার
২৯৩০২।	আলা উদ্দিন আহম্মদ ভুঞা	মৃত মৌঃ জালাল উদ্দিন
২৯৩০৩।	রহিম উল্লাহ	মোঃ মুসলিম
২৯৩০৪।	মোঃ নুর ইসলাম	রহিম উল্লাহ
২৯৩০৫।	আবুল কাশেম	তফজ্জাল হোসেন
২৯৩০৬।	আঃ রশিদ	আঃ মজিদ
২৯৩০৭।	রুহুল আমিন	আঃ হাকিম
২৯৩০৮।	মোস্তফা কামাল	সিরাজুল ইসলাম
২৯৩০৯।	রুহুল আমিন	আঃ রশীদ
২৯৩১০।	মোঃ মোস্তফা কামাল	মবজেল হক
২৯৩১১।	মোঃ নুরুল হুদা	মোঃ সেকান্দার মিয়া
২৯৩১২।	হোসেন আহম্মদ	আঃ ছোবহান
২৯৩১৩।	হাবিবুর রহমান	মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
২৯৩১৪।	মনসুর আহম্মদ	মকবুল আহম্মদ
২৯৩১৫।	এ,কে,এম, মমিনুল হক	মাষ্টার শামছুল হক
২৯৩১৬।	আবু তাহের	চান মিয়া
২৯৩১৭।	আবু জাহের	আঃ ওয়াহিদ
২৯৩১৮।	আবু আহম্মদ	সৈয়দ আহম্মদ মীর
২৯৩১৯।	আবুল কাশেম	আবদুল হাশেম
২৯৩২০।	মোঃ শামছুল হক	মোঃ ওয়ালি উল্লাহ
২৯৩২১।	মোঃ ইলিয়াছ	আবুল হোসেন
২৯৩২২।	শাহ আলম	শামছুল হক
২৯৩২৩।	মোঃ মোস্তফা	মোঃ নুরুল হক
২৯৩২৪।	মরন চন্দ্র দাস	শরৎ চন্দ্র দাস
২৯৩২৫।	আবুল কাশেম	হাবিব উল্লাহ
২৯৩২৬।	তাহের আহম্মদ	আলী আহম্মদ
২৯৩২৭।	আবু তাহের	আঃ গফুর
২৯৩২৮।	আবুল কাশেম	জয়নাল হক
২৯৩২৯।	মোঃ মাহাবুল আলম	মোঃ হুকুম আলী
২৯৩৩০।	মজিবুল হক	আঃ লতিফ
২৯৩৩১।	আবুল কাশেম	জয়নাল হক
২৯৩৩২।	নাছির উদ্দিন আহম্মদ	শফি আহ
২৯৩৩৩।	সৈয়দ আহম্মদ	মোঃ হাশেম
২৯৩৩৪।	হানজু মিয়া	মৃত মকবুল আহম্মেদ
২৯৩৩৫।	গোলাম ছোবহান	আঃ গোফরান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৩৩৬।	সৈয়দ আজহারুল হক	সৈয়দ শাখাওয়াৎ আলী
২৯৩৩৭।	রফিক আহম্মদ	মৌঃ বজলুর রহমান
২৯৩৩৮।	রফিকুল হক	মোহাম্মদ আলী
২৯৩৩৯।	সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	রহিম উল্লাহ
২৯৩৪০।	মোঃ রবিউল হক খন্দকার	মোঃ চান মিয়া খন্দাকার
২৯৩৪১।	জালাল আহম্মদ	টুকা মিয়া
২৯৩৪২।	মোঃ আঃ কাদের	মৃত এম,এন, হক
২৯৩৪৩।	সিরাজুল হক	আঃ ছাত্তার
২৯৩৪৪।	হুমায়ুন কবির	মৃত মফজল হক
২৯৩৪৫।	মোহাম্মদ ইলিয়াছ	বজলুর রহমান
২৯৩৪৬।	তাজুল ইসলাম	সুলতান আহম্মদ
২৯৩৪৭।	কামাল উদ্দিন	আঃ হালিম
২৯৩৪৮।	আঃ খালেক	আহম্মদ
২৯৩৪৯।	আঃ করিম	আলী আজম
২৯৩৫০।	মোঃ মাহবুবুল হক	মোঃ লোকমান
২৯৩৫১।	মোঃ ওহিদুর রহমান	জাকির আহম্মদ
২৯৩৫২।	মোঃ আবুল হোসেন চৌধুরী	মোঃ আঃ জলিল চৌধুরী
২৯৩৫৩।	মোঃ ইব্রাহিম	মোঃ আঃ গনি
২৯৩৫৪।	আঃ রউফ ভুইয়া	আঃ ছালাম ভুইয়া
২৯৩৫৫।	আঃ রউফ	সিরাজুল হক
২৯৩৫৬।	জয়নাল আবেদীন	মফিজুল ইসলাম
২৯৩৫৭।	সিয়াস উদ্দিন আহম্মদ	জালাল আহম্মদ
২৯৩৫৮।	কালাম উদ্দিন	সৈয়দ আহম্মদ
২৯৩৫৯।	মোঃ জাফর আহম্মদ	মোঃ ইব্রাহিম
২৯৩৬০।	আবু আহমেদ	মৃত মোঃ নুরুল হক
২৯৩৬১।	মোঃ ইলিয়াছ মজুমদার	বাদশা মিয়া মজুমদার
২৯৩৬২।	আনামুল হক	সায়দুর রহমান
২৯৩৬৩।	নাছির আহম্মদ	আঃ গফুর
২৯৩৬৪।	মোঃ আঃ হক	মৌঃ মমতাজ উদ্দিন
২৯৩৬৫।	মফিজ উদ্দিন	মোশাক আলী
২৯৩৬৬।	নুরুল হুদা	আঃ আওয়াল
২৯৩৬৭।	মোঃ ওমর ফারুক	ছিদ্দিক আহম্মদ
২৯৩৬৮।	ওবায়দুল হক	সিরাজুল হক
২৯৩৬৯।	অহিদের রহমান	আশ্রাফ আলী ভুইয়া
২৯৩৭০।	ফজলুল করিম	আঃ সোমেদ
২৯৩৭১।	ফজলুল করিম	শফিকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৩৭২।	সহিদ সালেহ আহম্মদ	হাজী সৈয়দ আহম্মদ
২৯৩৭৩।	ফরিদুর রহমান	নাছির আহম্মদ
২৯৩৭৪।	ফজলুল হক	সিরাজুল হক
২৯৩৭৫।	মোঃ আছান উল্লাহ	মোঃ নুরুল আমিন
২৯৩৭৬।	হাবিবুল্লাহ	নুর মিয়া
২৯৩৭৭।	শামছুল হক	জালাল আহম্মদ
২৯৩৭৮।	নুরুল ইসলাম	আঃ জাব্বার
২৯৩৭৯।	তাহের আহম্মদ	আঃ বারী
২৯৩৮০।	মোঃ নুরুল ইসলাম ভুইয়া	ছিদ্দিক আহম্মদ
২৯৩৮১।	জাকির হোসেন	আহম্মদ উল্লা
২৯৩৮২।	ওয়াজি উল্লাহ	ইন্ত মিয়া
২৯৩৮৩।	দেলোয়ার হোসেন	আঃ মান্নান
২৯৩৮৪।	মফিজুর রহমান	আঃ মান্নান
২৯৩৮৫।	নুর মোহাম্মদ	সোনা মিয়া
২৯৩৮৬।	আমির হোসেন	সিরাজুল হক সারেং
২৯৩৮৭।	আঃ হাই ভুঞা	আঃ রশিদ ভুইয়া
২৯৩৮৮।	আবুল কাশেম	ইয়াকুব আলী
২৯৩৮৯।	মোঃ রুহুল আমিন	মন্সী করম
২৯৩৯০।	আনামুল হক	মৃত নাজির আহম্মদ
২৯৩৯১।	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত ডাঃ ওয়াহিদুন্নবী
২৯৩৯২।	মোঃ আঃ হাই	মোঃ গনী আহমেদ
২৯৩৯৩।	আবদুল হাই	মুন্দা মিয়া
২৯৩৯৪।	আবদুল হালিম	নছর আহম্মদ
২৯৩৯৫।	মোঃ হানিফ	মৃত সুলতান আহম্মদ
২৯৩৯৬।	এ,টি,এম, সিয়াস উদ্দিন	মৃত মৌঃ মুখলেছুর রহমান
২৯৩৯৭।	মোহাম্মদ ইলিয়াস	আঃ রউফ
২৯৩৯৮।	আবুল হোসেন	আছমত আলী
২৯৩৯৯।	মোঃ আঃ হাই	মৃত মোঃ হাফিজ উল্লাহ মিয়া
২৯৪০০।	করিমুল হক	ছিদ্দিক আহম্মদ
২৯৪০১।	আঃ করিম	আঃ রশিদ
২৯৪০২।	আঃ মান্নান	আঃ কাদের
২৯৪০৩।	আঃ ছোবহান মিয়া	মৃত আরব আলী মিয়া
২৯৪০৪।	মোঃ ইউছুফ	আঃ খালেক
২৯৪০৫।	মোঃ আঃ রহিম	মৌঃ মকবুল আহম্মদ
২৯৪০৬।	মীর আঃ খালেক	মীর মৌঃ আহাম্মদ আলী
২৯৪০৭।	আমান উল্লাহ চৌধুরী	মৃত আহম্মদ উল্লাহ চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৪০৮।	আহসান উল্লাহ	চান্দু মিয়া
২৯৪০৯।	আলী আহম্মদ	দলিলের রহমান
২৯৪১০।	ইয়াছিন ভুইয়া	সলেমান ভুইয়া
২৯৪১১।	আঃ রাজ্জাক	শামছুল হক
২৯৪১২।	মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ	মৃত মোঃ আঃ রশিদ
২৯৪১৩।	এম, রফিকুল হক	সেকান্দার মিয়া
২৯৪১৪।	রুহুল আমিন	শফিকুর রহমান
২৯৪১৫।	মোহাম্মদ ইলিয়াস	আঃ গফুর
২৯৪১৬।	মোহাম্মদ ইদ্রিস	নুরুল ইসলাম
২৯৪১৭।	নুরুল আমিন	মৃত সালামত উল্লাহ
২৯৪১৮।	জামাল উদ্দিন ভুইয়া	আঃ বারেক ভুইয়া
২৯৪১৯।	জয়নাল আবদীন	আহসান উল্লাহ
২৯৪২০।	মোহাম্মদ গোফরান	মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ
২৯৪২১।	জালাল আহম্মদ	মৃত বাদশা মিয়া
২৯৪২২।	তোফায়েল আহম্মদ	মৃত মোঃ আমিন আহম্মদ
২৯৪২৩।	আঃ মালেক	মমতাজ মিয়া
২৯৪২৪।	সের মোঃ গোলাম কাদির	নুর মোহাম্মদ
২৯৪২৫।	মোঃ গোলাম রহমান	মৃত মোঃ মজিবুল হক
২৯৪২৬।	আবুল খায়ের	আঃ ছাত্তার'
২৯৪২৭।	নুরুল ইসলাম	আলী আহম্মদ
২৯৪২৮।	আবু বকর ছিদ্দিক	সুলতান আহম্মদ
২৯৪২৯।	মোঃ ইদ্রিস	মোঃ ইছাহাক
২৯৪৩০।	জয়নাল আবেদীন	মীর ভুইয়া
২৯৪৩১।	মোঃ দাউদ হোসেন	আঃ গাফফার
২৯৪৩২।	মোঃ কবির আহম্মদ	মোঃ আলী আহম্মদ
২৯৪৩৩।	মোহাম্মদ কামাল পাশা	আমিন আহম্মদ
২৯৪৩৪।	আবদুল হাই	ছেরাজুল হক
২৯৪৩৫।	মোঃ আঃ গফুর	মোঃ আঃ রশিদ
২৯৪৩৬।	কবির আহম্মদ	সুলতান আহম্মদ
২৯৪৩৭।	খাজ আহম্মদ	আঃ কাইয়ুম
২৯৪৩৮।	কাজী ইয়ার আহম্মদ	মৃত কাজী জাকির আহম্মদ
২৯৪৩৯।	কবির আহম্মদ	আঃ রশিদ
২৯৪৪০।	আবুল খায়ের	সিরাজুল হক সাওদাগর
২৯৪৪১।	খলিলুর রহমান	মৃত মোহম্মদ মিয়া
২৯৪৪২।	জয়নাল আবদীন	বুলু মিয়া
২৯৪৪৩।	দেলোয়ার হোসেন	দলিলুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৪৪৪।	মোহাম্মদ দুলাল	মোঃ নাজির আহম্মদ
২৯৪৪৫।	দেলোয়ার হোসেন	মৃত মান্দী মিয়া
২৯৪৪৬।	জয়নাল আবদীন চৌধুরী	মৃত আঃ আজিজ চৌধুরী
২৯৪৪৭।	আঃ হান্নান	মোঃ ইসহাক
২৯৪৪৮।	কামাল উদ্দিন	মৃত মোঃ হালিম উল্লাহ
২৯৪৪৯।	তাজুল ইসলাম	মৃত বদরুজ্জামান
২৯৪৫০।	খলিলুর রহমান.	মৃত আঃ মালেক
২৯৪৫১।	ফজলুল করিম	বশীর আহম্মদ
২৯৪৫২।	কবির আহম্মদ	আবদুল ছমেদ
২৯৪৫৩।	দীল মোহাম্মদ	মোঃ সৈয়দ আহম্মদ
২৯৪৫৪।	মোঃ ইলিয়াছ	জালাল আহম্মদ
২৯৪৫৫।	ইয়ার আহম্মদ	সুলতান আহম্মদ
২৯৪৫৬।	আবুল খায়ের	মোহাম্মদ মিয়া
২৯৪৫৭।	মোঃ শাহাজাহান	আঃ ছাত্তার
২৯৪৫৮।	মোহাম্মদ মোস্তফা	মোঃ আঃ গফুর
২৯৪৫৯।	সৈয়দ এহসান উল্লাহ	সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন
২৯৪৬০।	কবির আহম্মদ	আঃ ওহাব
২৯৪৬১।	জাকির হোসেন	শেখ আহম্মদ
২৯৪৬২।	মোহাম্মদ হারুন	আলহাজ্ব আঃ ওয়াদুদ ভুঞা
২৯৪৬৩।	মোঃ শফিকুর রহমান	এ,কে,এম, নুরুল আলম
২৯৪৬৪।	আঃ শুকুর	আঃ মালেক
২৯৪৬৫।	এ,টি,এম, আবুল হোসেন	মোঃ আবুল খায়ের
২৯৪৬৬।	সুলতান আহম্মদ	জমির উদ্দিন
২৯৪৬৭।	রফিক আহম্মদ	আলী আহম্মদ
২৯৪৬৮।	মোহাম্মদ ইউছুফ	মতিয়ার রহমান
২৯৪৬৯।	আঃ ওহাব	আবুল খায়ের
২৯৪৭০।	আবুল কালাম মীর	তাজুল ইসলাম মীর
২৯৪৭১।	মোহাম্মদ শাহজাহান	আবদুল হক
২৯৪৭২।	ইয়ার আহম্মদ	ফজল করিম
২৯৪৭৩।	আলী হোসেন	আঃ জব্বার সওদাগর
২৯৪৭৪।	এস,এম,আঃ হালিম	আঃ রাজ্জাক
২৯৪৭৫।	আঃ হালিম ভুঞা	আঃ হামিদ ভুঞা
২৯৪৭৬।	মোঃ ছাদেক	মৌঃ আছমত আলী
২৯৪৭৭।	আঃ রাজ্জাক	মোঃ আনোয়ার উদ্দিন আহমেদ
২৯৪৭৮।	ইকরামুল হক	আনিসুর হক চৌধুরী
২৯৪৭৯।	শাহ আলম মজুমদার	গোলাম রব্বানী মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৪৮০।	কবির আহম্মদ	নুর আহম্মদ
২৯৪৮১।	মোঃ আবুল কাশেম	সোনা মিয়া
২৯৪৮২।	রুহুল আমিন	চৌধুরী মিয়া
২৯৪৮৩।	খেরশেদ আলম	মোহাম্মদ মিয়া
২৯৪৮৪।	আশরাফ উদ্দিন লস্কর	হাজী কবির আহম্মদ
২৯৪৮৫।	তোফায়েল আহম্মদ	মুরশীদ আলী রহমান
২৯৪৮৬।	মোহাম্মদ মোস্তফা	মোঃ ইছাহাক
২৯৪৮৭।	মোকসেদ আহম্মদ	মৃত আবুল হাশেম
২৯৪৮৮।	মোহাম্মদ মোস্তফা	নজির আহম্মদ
২৯৪৮৯।	আবুল হোসেন	আঃ আজিজ
২৯৪৯০।	আরিফুল হক	মুন্সী এয়ার রহমান
২৯৪৯১।	মোঃ আমিন	জালাল আহম্মদ
২৯৪৯২।	জয়নাল আবদীন	আঃ মালেক
২৯৪৯৩।	আঃ রব	মৃত মুকলেছুর রহমান
২৯৪৯৪।	মোঃ রেজাউল হক	মৃত মোঃ আঃ হক
২৯৪৯৫।	গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী	ইজ্জত উল্লা চৌধুরী
২৯৪৯৬।	আবদুল হালিম	আমিন আহম্মদ
২৯৪৯৭।	আবদুর রউফ	নুর মোহাম্মদ ভুঞা
২৯৪৯৮।	আবদুল কুদ্দুছ	মফিজ আহম্মদ
২৯৪৯৯।	কাজী আবুল কাশেম	কাজী আরফান উল্লাহ
২৯৫০০।	এ,কে,এম, ইসলাম	এ,কে,এম, নুরুল আলম
২৯৫০১।	আঃ খালেক	ফজলার রহমান
২৯৫০২।	আবুল কাশেম	হাফিজুর রহমান
২৯৫০৩।	আবুল খায়ের	সুলতান মাঝি
২৯৫০৪।	আঃ রাজ্জাক	মৃত আলতাফ আলী
২৯৫০৫।	আবদুল হক	আলী আহম্মদ
২৯৫০৬।	আমির হোসেন	মৃত সিরু মিয়া
২৯৫০৭।	আবুল কাশেম	নবী উল্লাহ
২৯৫০৮।	সুবাশ চন্দ্র সাহা	বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার সাহা
২৯৫০৯।	সিরাজ মিয়া	মৃত এলাহী বক্স চৌধুরী
২৯৫১০।	আঃ সাত্তার	ইয়াকুব আলী
২৯৫১১।	সিরাজুল ইসলাম	আনিসুল হক চৌধুরী
২৯৫১২।	আঃ সামাদ	মৃত ইউসুফ আলী সর্দার
২৯৫১৩।	মোঃ আবুল হোসেন চৌধুরী	মোঃ আবুল হাশেম চৌধুরী
২৯৫১৪।	আবুল হাশেম	বদির রহমান
২৯৫১৫।	মোঃ আঃ হাই	মৃত হাজী আঃ রহমান ভুঞা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৫১৬।	আঃ মজিদ	আবদুল রশিদ
২৯৫১৭।	মুলকুতের রহমান	মৃত আঃ কাদের
২৯৫১৮।	আঃ মান্নান	মৃত আঃ জব্বার
২৯৫১৯।	বদিউজ্জামান	মৃত ফকীর আহম্মদ
২৯৫২০।	ফয়েজ আহম্মদ	মৃত আঃ হাকিম
২৯৫২১।	আবদুল কুদ্দুস	মুলকুতার রহমান
২৯৫২২।	জয়নাল আবেদীন	জালাল আহম্মদ
২৯৫২৩।	আবুল কাশেম	আফজালুর রহমান
২৯৫২৪।	আবদুর রউফ	মোঃ ইছাহাক
২৯৫২৫।	এ,কে,এম, সৈয়দ আহম্মদ	মৌঃ মোঃ দানা মিয়া
২৯৫২৬।	কামাল উদ্দিন	হাজী আঃ হক
২৯৫২৭।	হাবিব উল্লাহ ভুঞা	মৃত আনোয়ার আহম্মদ ভুঞা
২৯৫২৮।	মোঃ কামাল উদ্দিন	আলী আহম্মদ
২৯৫২৯।	এ,এস,এম,আঃ মান্নান	মৃত মোহাম্মদ মিয়া
২৯৫৩০।	মজিবুল হক	মৃত আলতাফ আলী মিয়া
২৯৫৩১।	আবু বকর সিদ্দিক	মৃত আলী আজম
২৯৫৩২।	কবির আহম্মদ	নাজির আহম্মদ মুন্সী
২৯৫৩৩।	বজলুর রহমান	হাজী ইসমাইল ফকির
২৯৫৩৪।	বুলু মিয়া	মৃত বসু মিয়া
২৯৫৩৫।	শামছুল হক ভুইয়া	মোঃ বদু মিয়া
২৯৫৩৬।	সুলতান আহম্মদ	মোঃ ইনতু মিয়া
২৯৫৩৭।	আবু তাহির	সালেহ আহম্মদ
২৯৫৩৮।	জালাল আহম্মদ পাটোয়ারী	সুলতান আহম্মদ হাবিলদার
২৯৫৩৯।	জাফর আহম্মদ মিয়া	মোঃ আঃ হাই মিয়া
২৯৫৪০।	মোঃ শরিয়ৎ উল্লাহ	মৃত মনতাজ মিয়া
২৯৫৪১।	শামছুল হক	মৃত আঃ আজিজ ভেন্ডার
২৯৫৪২।	মোঃ ইউনুছ মিয়া	আঃ মজিদ
২৯৫৪৩।	মোঃ শাহজাহান	মৃত দলিলুর রহমান
২৯৫৪৪।	এ,বি,এম, ছিদ্দিক	আঃ জব্বার সওদাগর
২৯৫৪৫।	মোঃ সালেহ আহম্মদ	মোঃ আঃ হক
২৯৫৪৬।	শফি উল্লাহ	গনি মিয়া
২৯৫৪৭।	মোঃ সিরাজুল হক	রজব আলী
২৯৫৪৮।	আঃ মালেক	আঃ কাদের
২৯৫৪৯।	মোঃ আরাবর রহমান ভুঞা	মৌঃ আঃ করিম ভুঞা
২৯৫৫০।	মোঃ রুহুল আমিন	সুলতান আহম্মদ
২৯৫৫১।	আবু সৈয়দ শফিকুল হক (বুলবুল)	নুরুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৫৫২।	নুরুল ইসলাম	মৃত মৌঃ আলী আজম
২৯৫৫৩।	এম,এ,মোশাররফ হোসেন চৌঃ	মোঃ ওয়াজেদ উল্লাহ
২৯৫৫৪।	তাহের আহম্মদ	মোহাম্মদ হোসেন
২৯৫৫৫।	মফিজুল হক	আঃ হাকিম
২৯৫৫৬।	মোহাম্মদ শফি উল্লাহ	মুন্সী নাদরের জামান
২৯৫৫৭।	শাহজাহান	সিরাজুল হক
২৯৫৫৮।	হোসেন আহম্মদ	মোঃ ইলিয়াস মাঝি
২৯৫৫৯।	মীর জালাল আহম্মদ	মীর কলিম উদ্দিন
২৯৫৬০।	জহুরুল আসলাম ভুঞা	নুর আহম্মদ ভুঞা
২৯৫৬১।	আলী নেওয়াজ	ফেলু মিয়া

খন্ড নং-১২১

জিলাঃ- ফেণী (নোয়াখালী) থান/উপজেলাঃ- ছাগলনাইয়া

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৫৬২।	মোঃ নুরুল আমিন	মোঃ গনি আহম্মদ
২৯৫৬৩।	মোঃ আবুল কাসেম	আমজাদ আলী
২৯৫৬৪।	আহসান উল্লাহ	মোহাম্মদ ইছহাক
২৯৫৬৫।	মোঃ আজিজুল হক	মৌঃ নাজির আহমেদ
২৯৫৬৬।	আবুল কাসেম ভুইয়া	মোঃ আঃ করিম উল্লা ভুইয়া
২৯৫৬৭।	মোজাম্মেল হক	আমির হোসেন
২৯৫৬৮।	রহিম ইল্লা খন্দকার	হাবিব উল্লাহ খন্দকার
২৯৫৬৯।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	ওয়াজী উল্লাহ
২৯৫৭০।	মোঃ আবদুল রউফ	আবদুল মালেক
২৯৫৭১।	মোঃ ইউসুফ	নুরুল হক
২৯৫৭২।	আবদুল লতিফ	সুজা মিয়া
২৯৫৭৩।	আবু বকর সিদ্দিক	আবদুল বারিক
২৯৫৭৪।	রাখাল চন্দ	হরি মোহন
২৯৫৭৫।	আনোয়ার হোসেন	আনসার আলী
২৯৫৭৬।	মোঃ ইউসুফ খোন্দকার	মৌঃ ওবায়দুল হক খোন্দকার
২৯৫৭৭।	আবু তাহের	হাজী আব্দুল বারী
২৯৫৭৮।	আনোয়ার উল্লাহ	মাওলা বক্স
২৯৫৭৯।	মোঃ মোস্তফা	ফজলুর রহমান
২৯৫৮০।	আবদুল হালিম	উজির আলী
২৯৫৮১।	আবুল হাসিম	মোঃ করিম উল্লাহ
২৯৫৮২।	আবু আহমেদ মজুমদার	মৃত আঃ আজিজ মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৫৮৩।	আমিনুল হক	মৌঃ রাজা মিয়া
২৯৫৮৪।	আমিনুল হক	তাজুল ইসলাম
২৯৫৮৫।	মোঃ নুরুল আমিন	আমির হোসেন
২৯৫৮৬।	মনিরুজ্জামান চৌধুরী	ফজলুর রহমান চৌধুরী
২৯৫৮৭।	মোঃ রুস্তম আলী	মোঃ ফয়জুল রহমান
২৯৫৮৮।	আবু আহমেদ	সুজা মিঞা
২৯৫৮৯।	মোঃ ইদ্রিস	নাজির আহমেদ
২৯৫৯০।	আমান উল্লা ভুঞা	আলহাজ্ব পচা মিয়া ভুঞা
২৯৫৯১।	আবুল কালাম আজাদ মজুমদার	আবুল বাসার মজুমদার
২৯৫৯২।	হাবিব উল্লা	মৃত মোহাম্মদ মিয়া
২৯৫৯৩।	আবুল খায়ের	বতু মিঞা
২৯৫৯৪।	মীর কাসেম	মৃত ওবায়দুল হক
২৯৫৯৫।	নুর নবী	মৃত জালাল উদ্দিন আহমেদ
২৯৫৯৬।	মোঃ রুহুল আমিন	আবুল খায়ের
২৯৫৯৭।	জালাল আহমেদ	মুসলিম মিঞা ভুঞা
২৯৫৯৮।	আবদুল মন্নান	মোহাম্মদ মিঞা
২৯৫৯৯।	নুরুল হক	আবদুল জব্বার
২৯৬০০।	এনামুল হক	মৌঃ মকবুল আহমেদ
২৯৬০১।	তোফায়েল আহমেদ	মৌঃ মকবুল আহমেদ
২৯৬০২।	মোঃ আলা উদ্দিন মজুমদার	মোঃ নাজির আহমেদ মজুমদার
২৯৬০৩।	মোঃ ইলিয়াস	শামসুল হক
২৯৬০৪।	এ,কে,এম,এস,আলম	শরিয়ত উল্লাহ
২৯৬০৫।	মোঃ আবু আহমেদ	মৌঃ ছমির উদ্দিন ভুঞা
২৯৬০৬।	আবুল খসর	সিদ্দিক আহমেদ
২৯৬০৭।	আবু বকর	সেকান্দার মিয়া
২৯৬০৮।	আবু তাহের	মৃত শেখ আহমেদ
২৯৬০৯।	আলী আশরাফ	নাজির আহমেদ
২৯৬১০।	মোঃ আমিনুল হক	হাজী আলী আহমেদ সারেং
২৯৬১১।	আলী আহসান	মৌঃ মোঃ ইদ্রিস
২৯৬১২।	মীর হোসেন	নুর আহমেদ
২৯৬১৩।	আবু তাহের	আহসান উল্লাহ
২৯৬১৪।	ওবায়দুল হক	শামছুল হক
২৯৬১৫।	মোঃ আবু তাহের	মীর মুলকেতর রহমান
২৯৬১৬।	মাহবুবুল হক	আমিনুল হক
২৯৬১৭।	আঃ হাদী	শাফাৎ উল্লাহ
২৯৬১৮।	এস আজিম	মীর হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৬১৯।	মোঃ আতিকুর রহমান	মোঃ শফিকুর রহমান
২৯৬২০।	আঃ আহাদ	হাজী বদিউজ্জামান
২৯৬২১।	এ কে এম শামছুদ্দিন	জুলফিকার আহাম্মদ
২৯৬২২।	আঃ রহিম	মমতাজ উদ্দিন
২৯৬২৩।	মোঃ আলী হোসেন	দলিলুর রহমান
২৯৬২৪।	মোফাজ্জল হোসেন	লাল মিঞা
২৯৬২৫।	মোঃ আবু ইউসুফ	আবদুল লতিফ
২৯৬২৬।	মোঃ মজিবুল হক	মোঃ শামছুল হক
২৯৬২৭।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মোঃ খলিলুর রহমান
২৯৬২৮।	মোহাম্মদ হোসেন	মৃত অলি আহমেদ
২৯৬২৯।	মোঃ মোস্তফা	শফি উল্লাহ
২৯৬৩০।	মাহবুব আলম	মোঃ ইব্রাহিম
২৯৬৩১।	আবু তাহের	সালে আহমেদ
২৯৬৩২।	আবুল কালাম	জান মোহাম্মদ মজুমদার
২৯৬৩৩।	এ কে এম আবুল হোসেন চৌধুরী	মৃত আঃ সাত্তার চৌধুরী
২৯৬৩৪।	বাবুল চৌধুরী	কানু মিঞা চৌধুরী
২৯৬৩৫।	মোঃ সাইফ উদ্দিন	মৃত মৌঃ গোলবুর রহমান
২৯৬৩৬।	মোঃ শাহজাহান	মোঃ আমির হোসেন
২৯৬৩৭।	মোঃ রহিম উদ্দিন	শফিকুর রহমান
২৯৬৩৮।	রফিক উদ্দিন	আমান উল্লা ভূঞা
২৯৬৩৯।	মোঃ সেলিম উল্লাহ	মোঃ আবিদ উল্লাহ
২৯৬৪০।	মোঃ শামছুদ্দিন	মোঃ জহিরুল হক
২৯৬৪১।	সিরাজ উদ্দিন মোল্লা	শামছুল হুদা
২৯৬৪২।	মোঃ রুহুল আমিন	মোঃ আবদুল আজিজ
২৯৬৪৩।	আবুল খায়ের	আফাউদ্দিন
২৯৬৪৪।	আবুল কালাম আজাদ	জনাব করিম উল্লাহ
২৯৬৪৫।	মোঃ করিম উল্লাহ	জান মোহাম্মদ
২৯৬৪৬।	মোঃ আবুল কাশেম	মৌঃ আঃ আজিজ
২৯৬৪৭।	মোহাম্মদ আবুল কাশেম	মৃত মুন্সী ফজলুর রহমান
২৯৬৪৮।	রবিউল হোসেন	মোহাম্মদ মিঞা
২৯৬৪৯।	মোঃ শাহাব উদ্দিন	মোঃ নুর ইসলাম
২৯৬৫০।	মোঃ কামাল উদ্দিন	মোঃ জয়নাল আবেদীন
২৯৬৫১।	কামাল উদ্দিন	নুর আহমেদ
২৯৬৫২।	শাহাদত হোসেন	সুলতান আহমেদ
২৯৬৫৩।	শহিদুল্লাহ	কাজ আহমেদ ভূইয়া
২৯৬৫৪।	আরশাদ উল্লাহ	শফিকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৬৫৫।	মিজানুর রহমান মজুমদার	বদিউর রহমান মজুমদার
২৯৬৫৬।	মোঃ নুরুল আলম	মোঃ বেলায়েত হোসেন
২৯৬৫৭।	নুর নবী	নুরুল হক
২৯৬৫৮।	ওয়ালী আহমেদ	বাদশা মিয়া
২৯৬৫৯।	কামাল উদ্দিন	মৃত সুলতান আহমেদ
২৯৬৬০।	মোঃ শাহ আলম	মোঃ ইদ্রিস মাষ্টার
২৯৬৬১।	আমিনুল হক	সুলতান আহমেদ
২৯৬৬২।	সিদ্দিক আহমেদ	আহমেদ আলী
২৯৬৬৩।	আবদুল হক	মিঃ সুলতান আহমেদ
২৯৬৬৪।	মোঃ আজিজ উল্লাহ ভুঞা	মকবুল আহমেদ ভুঞা
২৯৬৬৫।	মোঃ আলাউদ্দিন	দেলোয়ার হোসেন
২৯৬৬৬।	জয়নাল আবেদীন	চান মিঞা
২৯৬৬৭।	রুহুল আমিন	মগবুল আহমেদ
২৯৬৬৮।	আবুল কাশেম	শেখ আহমেদ
২৯৬৬৯।	বসির আহমেদ	জালাল আহমেদ
২৯৬৭০।	কামাল উদ্দিন	খায়েজ আহমেদ
২৯৬৭১।	শেখ কেফায়েত উল্লাহ	মৌঃ রহিম উল্লা
২৯৬৭২।	জেবল হোসেন	নানা মিঞা
২৯৬৭৩।	শেখ জয়নাল আবেদীন	শেখ সায়েদ আহমেদ
২৯৬৭৪।	রুহুল আমিন	আঃ সাত্তার মজুমদার
২৯৬৭৫।	মোহাম্মদ ইদ্রিস	মৌঃ শফিউল্লাহ
২৯৬৭৬।	আবদুল করিম	মোঃ মমতাজ মিঞা
২৯৬৭৭।	মোঃ এনামুল হক	আবদুল গফুর
২৯৬৭৮।	শেখ আহমেদ	মৃত মোঃ মোহসীন আলী
২৯৬৭৯।	রফিকুল ইসলাম	ডঃ সিরাজুল হক
২৯৬৮০।	মোঃ আঃ হাই	মৌঃ জিন্নাত আলী
২৯৬৮১।	সালে আহমেদ	আবুল বসর
২৯৬৮২।	আবুল হাশেম	আলী আহমেদ
২৯৬৮৩।	আবুল কাশেম	নুর আহমেদ
২৯৬৮৪।	মফিজুর রহমান	আঃ খালেক
২৯৬৮৫।	ওবায়দুল হক	শামছুল হক
২৯৬৮৬।	মোঃ আমির হোসেন ভুঞা	আহমেদ উল্লাহ
২৯৬৮৭।	জামাল উদ্দিন চৌধুরী	ফরিদুল হক চৌধুরী
২৯৬৮৮।	মোঃ আইকুব ভুঞা	মোঃ ইসমাইল ভুঞা
২৯৬৮৯।	সৈয়দ আবুল বসর	সৈয়দ সুজা উদ্দিন
২৯৬৯০।	আঃ সালাম মজুমদান	টুকু মিঞা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৬৯১।	আবু তাহের	আমির হোসেন
২৯৬৯২।	আবুল বাসার	মৃত ওয়াহিদুর রহমান
২৯৬৯৩।	মোহাম্মদ আলী	আবদুস সামাদ
২৯৬৯৪।	বদু মিঞা	মনু মিঞা
২৯৬৯৫।	মোঃ হারুন	মৃত আঃ মালেক
২৯৬৯৬।	তাজুর ইসলাম চৌধুরী	মৌঃ শফিকুর রহমান চৌধুরী
২৯৬৯৭।	শামছুল হক	ইমান আলী
২৯৬৯৮।	সুলতান আহমেদ খোন্দকার	শামসুল হক খোন্দকার
২৯৬৯৯।	মোঃ বেলায়েত হোসেন	এম এম গোলাম হোসেন
২৯৭০০।	জাকির হোসেন	ওয়াহিদুর রহমান
২৯৭০১।	বিশ্বেশ্বর মজুমদার	হরদে কুমার মজুমদার
২৯৭০২।	বদিউল আলম	আঃ হক
২৯৭০৩।	নুর ইসলাম	আহদের রহমান
২৯৭০৪।	আঃ হাই	মোঃ ইছাহাক
২৯৭০৫।	মোঃ মুসলিম উদ্দিন	মুন্সী দলিলুর রহমান
২৯৭০৬।	ওয়াজিউল্লাহ	মৃত হাজী রিয়াজউদ্দিন খোন্দকার
২৯৭০৭।	মোহাম্মদ আলী	মৃত হোসেন উজ্জামান
২৯৭০৮।	ওয়াহিদুর রহমান	হাজী ফালু মিঞা
২৯৭০৯।	সালে আহমেদ চৌধুরী	মৃত এইচ এম সুলতান আহমেদ চৌ
২৯৭১০।	মকসুদ আহমেদ	হোসেন আহমেদ
২৯৭১১।	আমির হোসেন	জয়নাল আবেদীন
২৯৭১২।	শেখ আহমেদ	মধু মিঞা
২৯৭১৩।	আলাউদ্দিন মজুমদার	শেখ আহমেদ মজুমদার
২৯৭১৪।	সিরাজুল হক	মজিব উল্লা ভুঞা
২৯৭১৫।	আবুল বাসার ভুঞা	নুর আহমেদ ভুঞা
২৯৭১৬।	মোঃ আবদুল মজিদ	ছায়েদুর রহমান সওদাগর
২৯৭১৭।	মোঃ রুহুল আমিন চৌধুরী	দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী
২৯৭১৮।	আবদুর রউফ	শেখ আহমেদ
২৯৭১৯।	মোঃ আহসান উল্লাহ	সুলতান আহমেদ
২৯৭২০।	মোঃ আবুল বাসার	জালাল আহমেদ
২৯৭২১।	মোঃ আবুল হাশেম ভুঞা	মৃত আঃ আজিজ ভুঞা
২৯৭২২।	আঃ হক	মতি মিঞা
২৯৭২৩।	মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	মৃত গনি আহমেদ চৌধুরী
২৯৭২৪।	আঃ সালাম মজুমদার	মৌঃ আঃ মান্নান মজুমদার
২৯৭২৫।	আবু বকর সিদ্দিক	নাজির আহমেদ
২৯৭২৬।	আবু তাহের ভুঞা	হাজী আমান উল্লাহ ভুঞা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৭২৭।	কবির আহমেদ	মৃত শফি উল্লাহ
২৯৭২৮।	আজিজুল হক	অমিদুর রহমান চৌধুরী
২৯৭২৯।	আবদুল করিম	হাবিব উল্লাহ
২৯৭৩০।	আবুল কাসেম ভুঞা	বতু মিঞা ভুঞা
২৯৭৩১।	আবুল কাসেম	মৃত আঃ খালেক
২৯৭৩২।	আবুল কাসেম	মৃত আঃ গনি
২৯৭৩৩।	আবুল কাসেম	মৃত শহিদুল হক
২৯৭৩৪।	আবদুল খালেক	মুসা মিঞা
২৯৭৩৫।	মোঃ আবদুল হাই	মোঃ আঃ রশিদ
২৯৭৩৬।	সৈয়দ মোঃ মহিউদ্দিন	সৈয়দ আঃ জলিল
২৯৭৩৭।	হাফিজ আহমেদ	বতু মিয়া
২৯৭৩৮।	আমিনুল হক	মৃত মনোহর আলী
২৯৭৩৯।	আমান উল্লা	ওয়াহিদুর রহমান
২৯৭৪০।	রুহুল আমিন	মৃত মুন্সী সোলেমান
২৯৭৪১।	আঃ কাদের	আকু মিঞা
২৯৭৪২।	এরশাদ উল্লাহ	শামছুল হক মজুমদার
২৯৭৪৩।	আমিনুর রহমান	আলী আহমেদ
২৯৭৪৪।	আবুল কাসেম	শফি উল্লাহ
২৯৭৪৫।	নুরুল আমিন	আঃ মজিদ
২৯৭৪৬।	আজিজুর রহমান	আবদুল হক
২৯৭৪৭।	আবু আহমেদ	মৃত মজিবুল হক আমিন
২৯৭৪৮।	মোঃ আবু ইউসুফ	মৌঃ ফয়েজ আহমেদ
২৯৭৪৯।	এরশাদ উল্লাহ	মমতাজ উদ্দিন
২৯৭৫০।	আবদুল হক	মৃত হজু মিয়া
২৯৭৫১।	আবু আহমেদ	সেরাজুল হক
২৯৭৫২।	আবুল কালাম চৌধুরী	মাষ্টার বেলায়েত হোসেন
২৯৭৫৩।	খাজা মইন উদ্দিন	নুর মোহাম্মদ চৌধুরী
২৯৭৫৪।	আলী হোসেন	হাজী আঃ গনি মিয়া
২৯৭৫৫।	আবুল হোসেন	মৃত মৌঃ আলী আহমেদ
২৯৭৫৬।	আবদুল মতিন	আঃ হক ভুঞা
২৯৭৫৭।	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	অহিদের রহমান
২৯৭৫৮।	ফিরোজ আহমেদ	মফিজের রহমান
২৯৭৫৯।	আবদুল হাই	ওয়ালী আহমেদ
২৯৭৬০।	দেলোয়ার হোসেন	ইমান আলী
২৯৭৬১।	মোঃ ইলিয়াস	কালা মিঞা
২৯৭৬২।	দেলোয়ার হোসেন	ওবায়দুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৭৬৩।	দলিলুর রহমান	বদিয়ার রহমান
২৯৭৬৪।	বশির আহমেদ	ছফর আলী খন্দকার
২৯৭৬৫।	জালাল আহমেদ	মৌঃ শেখ আহম্মদ
২৯৭৬৬।	মোঃ আরিফুর রশিদ	নামুল হুদা মাষ্টার
২৯৭৬৭।	মোঃ আবুল কালাম	আমিনুল হক
২৯৭৬৮।	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	এম, সিদ্দিক আহমেদ
২৯৭৬৯।	আবদুর রব	আঃ রশিদ ভুইয়া
২৯৭৭০।	নুর আহাম্মদ	নুরুল হক
২৯৭৭১।	দেলওয়ার হোসেন	ফজলুল হক ভুইয়া
২৯৭৭২।	মোঃ কামাল উদ্দিন আজাদী	মৌঃ আবুল খায়ের
২৯৭৭৩।	নীল কমল দাস	ভাগীরথ চন্দ্র দাস
২৯৭৭৪।	মফিজা রহমান	সালামত উল্লাহ্
২৯৭৭৫।	মফিজুল করিম	হোসেন আহমেদ পাটোয়ারী
২৯৭৭৬।	মোঃ মাহবুবুল আলম	মৌঃ আবুল বাসার

খন্ড নং-১২২

জেলাঃ- ফেনী (নোয়াখালী)

থানা/উপজেলাঃ- ছাগলনাইয়া

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৭৭৭।	মোঃ ওবায়দুল হক	মোঃ মুন্সি সরু মিয়া
২৯৭৭৮।	মোঃ কবির আহম্মদ	মোঃ মুলকুতর রহমান
২৯৭৭৯।	নুরুল হুদা	মোঃ শফি উল্লা
২৯৭৮০।	কুনু মিয়া	তিতা মিঞা
২৯৭৮১।	মোঃ ইলিয়াস	মোঃ ইদ্রিস মিঞা
২৯৭৮২।	মোঃ এছাহাক মিয়া	মোঃ ফজলুল হক
২৯৭৮৩।	মোঃ আঃ ছোবাহান	মোঃ আঃ হাকিম
২৯৭৮৪।	মোঃ আঃ জলিল	মোঃ কালা মিয়া
২৯৭৮৫।	মোঃ ইমাম হোসেন মজুমদার	মৃত মৌঃ মধু মিয়া মজুমদার
২৯৭৮৬।	মৌঃ মনির আহমেদ	মোঃ জালাল আহমেদ
২৯৭৮৭।	মোঃ মোস্তফা	মোঃ জমির আহমেদ
২৯৭৮৮।	মোঃ আঃ হাদী	মোঃ সেফাইয়ত উল্লা
২৯৭৮৯।	মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী	মোঃ আঃ রশিদ চৌধুরী
২৯৭৯০।	মোঃ মুসলেম চৌধুরী	মোঃ ইলিহাস চৌধুরী
২৯৭৯১।	মোঃ মস্তফা ভুঞা	মোঃ আলী আশরাফ ভুঞা
২৯৭৯২।	মোঃ ওবায়েদুল হক	মোঃ নুরুল ইসলাম

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৭৯৩।	মোঃ ওবায়েদুল হক	মোঃ আঃ ছাত্তার
২৯৭৯৪।	মোঃ আবু নাসির	মোঃ মাজাহর উল্লা
২৯৭৯৫।	মোঃ নুর ইসলাম	মোঃ মন্তু মিয়া
২৯৭৯৬।	মোঃ স্রামছুল হক	মৃত মোঃ ইউনুস মিয়া
২৯৭৯৭।	মোঃ আবু সালেহ মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মৃত আলী নেওয়াজ মজুমদার
২৯৭৯৮।	মোঃ শফিকুর রহমান	মোঃ আঃ মালেক
২৯৭৯৯।	মোঃ জিয়া উদ্দিন	মোঃ সিরাজুল হক
২৯৮০০।	মোঃ জহিরুল আনোয়ার	এ,কে,এম, শফিকুর রহমান
২৯৮০১।	মোঃ আবু তৈয়ব চৌধুরী	মোঃ আবদুর রশিদ
২৯৮০২।	মোঃ আবু তৈয়ব চৌধুরী	মোহাম্মদ আলী চৌধুরী
২৯৮০৩।	মোঃ ইউছুফ মিয়া	মোঃ ছালামত উল্লাহ
২৯৮০৪।	মোঃ মনির উদ্দিন	মোঃ টুকু মিয়া
২৯৮০৫।	মোঃ রহিম উল্লা	মোঃ আবুল খায়ের
২৯৮০৬।	মোঃ আবু তাহের	মোঃ গনি আহমেদ
২৯৮০৭।	মোঃ রফিক আহমেদ	মোঃ নুরুল ইসলাম
২৯৮০৮।	মোঃ আঃ হালিম	মোঃ আঃ ছাত্তার
২৯৮০৯।	মোঃ আহাম্মদ উল্লা	মোঃ আহসান উল্লা খন্দকার
২৯৮১০।	মোঃ আঃ হাদি	মৌঃ লকিয়ত উল্লা
২৯৮১১।	এ,বি,এম, নুরুল আমিন	মোঃ সুলতান আহমেদ
২৯৮১২।	মোঃ ছামছুদ্দিন	মোঃ আবুল মহসীন পাঠান
২৯৮১৩।	মোঃ আরশাদ উল্লাহ	মোঃ আবদুর রশিদ
২৯৮১৪।	মোঃ আমিন	মোঃ ছুলেমান মোল্লা
২৯৮১৫।	মোঃ শরিয়ত উল্লা	মোঃ আঃ গফুর
২৯৮১৬।	মোঃ আঃ হাই	মোঃ সুলতান আহমেদ
২৯৮১৭।	মোঃ শামছুল করিম ভুএগ্রা	মোঃ ফজিল আহমেদ ভুএগ্রা
২৯৮১৮।	মোঃ শাহ আলম পাটোয়ারী	মোঃ আঃ হক পাটোয়ারী
২৯৮১৯।	মোঃ কবির আহমেদ	মোঃ গোলাম রহমান
২৯৮২০।	মোঃ আজিুল হক	মোঃ ফজলুল হক
২৯৮২১।	মোঃ রবিউল হক	মোঃ আঃ ওহাব
২৯৮২২।	মোঃ আহমেদ হোসেন	মোঃ নাজির আহমেদ
২৯৮২৩।	মোঃ তাহের আহমেদ	মোঃ মকবুল আহমেদ
২৯৮২৪।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ আমিনুর রহমান
২৯৮২৫।	মোঃ মীর হোসেন	মোঃ আম্বর আলী
২৯৮২৬।	মোঃ ফিরোজ আহমেদ	মোঃ সলিমুল্লাহ
২৯৮২৭।	মোঃ মজিবুল হক	মোঃ মুছা মিয়া
২৯৮২৮।	মোহাম্মদ আলী	মোঃ আবদুস ছামাদ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৮২৯।	মোঃ আবুল খায়ের মজুমদার	মোঃ তোফজ্জেল হোসেন মজুমদার
২৯৮৩০।	মোঃ নুরুল আফছার চৌধুরী	মোঃ হোসেনুল হক চৌধুরী
২৯৮৩১।	মোঃ ছায়েদুল রহমান	মোঃ সোনা মিয়া ভুঞা
২৯৮৩২।	এ,টি,সামছুদ্দিন আহমেদ	মৃতঃ আল্‌হাজ্ব মাওলানা মোঃ শফিকুর রহমান
২৯৮৩৩।	মোঃ শাহজাহান	মোঃ ফজলুর রহমান
২৯৮৩৪।	মোঃ কবির আহমেদ	মোঃ আবদুর রশিদ
২৯৮৩৫।	মোঃ জয়নাল আবেদীন	সৈয়দ আঃ আজিজ
২৯৮৩৬।	মোঃ ফকরুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম
২৯৮৩৭।	মোঃ আবুল কাসেম ভুঞা	মোঃ আলী ভুঞা
২৯৮৩৮।	মোঃ জাকের হোসেন	মোঃ মকছুদুর রহমান ভুঞা
২৯৮৩৯।	মোঃ মফিজ আহমেদ	মৌঃ সিরাজুল ইসলাম
২৯৮৪০।	মোঃ আবুল খায়ের	মৃতঃ ইউনুছ মিয়া
২৯৮৪১।	মোঃ সেলিম চৌধুরী	মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
২৯৮৪২।	মোঃ আনোয়ারুল কাদির	মোঃ আমিনুল হক
২৯৮৪৩।	মোঃ আহমেদ কবির	মোঃ জবারুল হক ভুঞা
২৯৮৪৪।	মোঃ আবু আহমেদ পাঠোয়ারী	মোঃ সুজা মিয়া পাঠোয়ারী
২৯৮৪৫।	মোঃ আবুল খায়ের	মোঃ নুর মিয়া
২৯৮৪৬।	মোঃ আঃ কাইয়ুম	মৃত আবু তাহের খন্দকার
২৯৮৪৭।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ বজলুর রহমান খান্দকার
২৯৮৪৮।	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ নুরুল ইসলাম
২৯৮৪৯।	মোঃ আঃ হাই চৌধুরী	মোঃ হাজী মফিজ উদ্দিন
২৯৮৫০।	মোঃ আঃ মজিদ	মোঃ নাজির আহমেদ
২৯৮৫১।	মোঃ আঃ কাদের	মোঃ সোনা মিয়া
২৯৮৫২।	আবুল খায়ের	বদিউর রহমান
২৯৮৫৩।	আবদুল হক	ওহেদুর রহমান
২৯৮৫৪।	আবদুল জব্বার	মৃত মোঃ দানা মিয়া
২৯৮৫৫।	সিরাজদৌল্লা	মোঃ ছলিমুল্লা
২৯৮৫৬।	শাহাবুদ্দিন	সৈয়দ আহম্মদ
২৯৮৫৭।	এস,এম, আঃ মান্নান	
২৯৮৫৮।	আমির হোসেন	মোঃ ইসমাইল
২৯৮৫৯।	আমির হোসেন	মোঃ বাদশা মিয়া পাটোয়ারী
২৯৮৬০।	মোঃ রুহুল আমিন	মোঃ শহি উল্লা
২৯৮৬১।	আবু আহাম্মদ	মকবুল আহম্মদ
২৯৮৬২।	মোঃ রউফ হক	মোঃ ইদ্রিস
২৯৮৬৩।	নাসির আহমেদ	দলিলুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৮৬৪।	জালাল আহম্মদ চৌধুরী	আবদুর রেজ্জাক চৌধুরী
২৯৮৬৫।	আবুল হোসেন	আলী নেওয়াজ
২৯৮৬৬।	আমির হোসেন	আবিদ আলী
২৯৮৬৭।	জাকির হোসেন	মুসলিম মিয়া
২৯৮৬৮।	আহমেদ হোসেন	মৃত সৈয়দ আহমেদ
২৯৮৬৯।	আবুল কাসেম	বদিউজ্জামান
২৯৮৭০।	জয়নাল আবেদীন	মকবুল আহমেদ
২৯৮৭১।	মুস্তাক আহমেদ	মকসেদ আহমেদ
২৯৮৭২।	আঃ মালেক	মৃত আহমদের রহমান
২৯৮৭৩।	আঃ মান্নান	জোনাব আলী
২৯৮৭৪।	মোঃ আমির হোসেন চৌধুরী	সিরাজুল ইসলাম সারেং
২৯৮৭৫।	ফয়েজ আহম্মদ চৌধুরী	মৃত মোঃ বসু মিয়া চৌধুরী
২৯৮৭৬।	নাদিরুল হক চৌধুরী	মৃত মোঃ চান মিঞা
২৯৮৭৭।	হাফেজ আহম্মদ	মৃত নজির আহম্মদ
২৯৮৭৮।	আবুল কাশেম চৌধুরী	মৃত আঃ হাই চৌধুরী
২৯৮৭৯।	সিয়াস উদ্দিন	শেখ আহম্মদ মজুমদার
২৯৮৮০।	জামার উদ্দিন	নাজির আহমেদ
২৯৮৮১।	আবুল খায়ের	ফকির আবুল হোসেন
২৯৮৮২।	হাবিব উল্লা	আবদুল খালেক
২৯৮৮৩।	সামছুল হক	আবদুল জলিল
২৯৮৮৪।	আবদুল ওহাব	
২৯৮৮৫।	আবদুল ওহাব ভুইয়া	হাফেজ আহম্মেদ ভুইয়া
২৯৮৮৬।	মোহাম্মদ ইলিয়াস	গোললুর রহমান
২৯৮৮৭।	মমতাজুল হক	আবদুল জব্বার
২৯৮৮৮।	মোঃ এছাক	নমা মিয়া
২৯৮৮৯।	মোঃ আবদুল মতিন	মোঃ আঃ রশিদ
২৯৮৯০।	আবদুল হক	গুলালের রহমান
২৯৮৯১।	আহছান উল্লা	রুহুল আমিন ভুইয়া
২৯৮৯২।	আঃ গফুর	আঃ কাদের
২৯৮৯৩।	মোঃ হোসেন	হাফেজ মাহবুবুল হক
২৯৮৯৪।	আওরংগজেব খান	আলী রেজা খান
২৯৮৯৫।	আবুল হাশেম	আঃ খালেক
২৯৮৯৬।	শেখ মোঃ সিরাজুল ইসলাম	শেখ মোঃ ছামসুল হক মিয়া
২৯৮৯৭।	আমিন উল্লা	মোঃ হানিফ
২৯৮৯৮।	কে,এম, আহম্মদ কবির	মুন্সী আরশাদ উল্লা
২৯৮৯৯।	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ আলী আহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৯০০।	মোঃ সাদেক হোসেন	মোঃ আমিনুল হক
২৯৯০১।	মোঃ গোলাম মাওলা	হাজী মোঃ ইদ্রিস
২৯৯০২।	মোঃ আহছান উল্লা	মৌঃ আলী আজম
২৯৯০৩।	মোঃ মোস্তফা	মোঃ আঃ কুদ্দুস ডিলার
২৯৯০৪।	মাহামুদুল হক	ফকির আহম্মদ
২৯৯০৫।	মোঃ গোলাম রসুল	মৃত হাজী আঃ আজিজ
২৯৯০৬।	মোঃ শফি উল্লা	মোঃ সৈয়দ আহাম্মদ
২৯৯০৭।	শফিকুল আলম	মফিউ উদ্দিন ভুঞা
২৯৯০৮।	মোঃ আবুল খায়ের	মুন্সী আঃ খালেক
২৯৯০৯।	নুর ইসলাম	মোঃ আঃ বারী
২৯৯১০।	মোঃ শাহাব উদ্দিন	হাজী জাদির আহম্মদ
২৯৯১১।	মোঃ আলী ভুঞা	
২৯৯১২।	নুরুল হুদা	মোঃ সুমসাম হুদা
২৯৯১৩।	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আঃ ছবেদ ভুঞা
২৯৯১৪।	আবুল খায়ের মিয়া	মোঃ দলিলুর রহমান
২৯৯১৫।	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ আফিফয়া
২৯৯১৬।	এস এম শাহজাহান	মৌঃ সায়েদুর রহমান
২৯৯১৭।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ আজিজুল হক মাষ্টার
২৯৯১৮।	এ টি এম জি সারোয়ার	মোঃ এ হাশেম মিয়া
২৯৯১৯।	আঃ ছাত্তার	আঃ গফুর
২৯৯২০।	নিকুঞ্জ বিহারী নাথ	অখিল চন্দ্র নাথ
২৯৯২১।	মোঃ নুরু উল্লাহ মিঞা	মৃত মাওলানা আবদুর রব
২৯৯২২।	আবু তাহের	মকলেছুর রহমান
২৯৯২৩।	মোঃ নুরুল করিম	মৌঃ মোঃ ফয়েজ
২৯৯২৪।	মোঃ ইলিয়াস	বজুল রহমান
২৯৯২৫।	মোঃ হাসানুদৌল্লা চৌধুরী	মৃত নুরুল ইসলাম চৌধুরী
২৯৯২৬।	আবুল কাশেম	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
২৯৯২৭।	মোঃ আঃ হাশেম	আঃ মালেক
২৯৯২৮।	হাফিজ উল্লা	মৃত মোঃ সৈয়দ আলী
২৯৯২৯।	জাহাংগীর আলী	হেমদু মিয়া
২৯৯৩০।	রবিউল হক	আবদুল মুনাফ
২৯৯৩১।	রসুল আহাম্মদ	মোঃ ইয়াছিন
২৯৯৩২।	মোঃ ছাদেক	মফিজুর হক
২৯৯৩৩।	মোঃ হানিফ	মোকান আলী
২৯৯৩৪।	হাফিজ আহম্মাদ	মৃত সফিউল্লাহ ভুইয়া
২৯৯৩৫।	মোঃ ফয়েজ আহাম্মদ	মোহাম্মদ মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৯৩৬।	রুহুল আমিন	আবদুর জব্বার
২৯৯৩৭।	মোঃ হোসেন	মকবুল মিয়া
২৯৯৩৮।	জাহাংগীর আলম	হামজু মিয়া
২৯৯৩৯।	মোঃ ইল্লিয়াস	মোঃ ইসাহাক
২৯৯৪০।	আঃ কাদের	আঃ গনি
২৯৯৪১।	মোঃ খোরশেদ আলম	মোঃ সরাফত আলী
২৯৯৪২।	আঃ সোবহান	মমতাজ উদ্দিন মিয়া
২৯৯৪৩।	আবু তাহের	গোলাম নবী
২৯৯৪৪।	রহিম উল্লাহ	নুর আহাম্মদ
২৯৯৪৫।	রসুল আহাম্মদ	আঃ মুনাফ
২৯৯৪৬।	মোঃ জামাল উদ্দিন	এইচ প্রম ছিদ্দিক আহাম্মদ
২৯৯৪৭।	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত লাল মিয়া
২৯৯৪৮।	আঃ মোতালেব	মৌঃ আবদুল
২৯৯৪৯।	আঃ শুকুর	মোঃ মিরখেতাব
২৯৯৫০।	মোঃ ইব্রাহিম	মোহাম্মদ আলী আকবর মিয়া
২৯৯৫১।	মোঃ জসিম উদ্দিন	মোঃ চান্দু মিয়া
২৯৯৫২।	কোব্বাত আহাম্মদ	মুন্সী আঃ আওয়াল
২৯৯৫৩।	আমির হোসেন	মোঃ আলী আহাম্মদ
২৯৯৫৪।	খুরশিদ আহাম্মদ	মৃত মমতাজ উদ্দিন আহাম্মদ
২৯৯৫৫।	নুরুল ইসলাম	লাল মিয়া বোলী
২৯৯৫৬।	মোঃ আঃ করিম	মোঃ আঃ কাদের
২৯৯৫৭।	মোঃ মইন উদ্দিন চৌধুরী	আফতারের জামান চৌধুরী

জিলাঃ- ফেনী (নায়াখালী) থানা/উপজেলাঃ- পরশুরাম

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৯৫৮।	হাবিবুর রহমান	সেকেন্দার আলী
২৯৯৫৯।	টিপু সুলতান	মৃত কবির আহম্মদ
২৯৯৬০।	ছিদ্দিকুর রহমান	মৃত ছদরু মিয়া
২৯৯৬১।	রুহুল আমিন	মোঃ হাদী মিয়া
২৯৯৬২।	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত সৈয়দ আলী
২৯৯৬৩।	কাজী আবদুর রহিম	মৃত কাজী আঃ রাজ্জাক
২৯৯৬৪।	মোঃ মোমিন উদ্দিন চৌধুরী	মৃত আঃ বারী চৌধুরী
২৯৯৬৫।	নুরুল ইসলাম	মৃত সুলতান আহমেদ
২৯৯৬৬।	মোঃ মোস্তফা	জবেদ আলী
২৯৯৬৭।	বাহার মিয়া	শফিউল্লা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
২৯৯৬৮।	শেখ তাজল ইসলাম	মোঃ বশিউর রহমান
২৯৯৬৯।	মোঃ শফিকুর রহমান মজুমদার	মোঃ আমির হোসেন
২৯৯৭০।	মোঃ বাবুল	হাবিবুর রহমান
২৯৯৭১।	মোঃ এনামুল হক	মোঃ নুরুল ইসলাম
২৯৯৭২।	মকবুল আহাম্মদ	ওহেদুর রহমান
২৯৯৭৩।	মোঃ রুহুল আমিন	মৃত আনা মিয়া
২৯৯৭৪।	দীপক চন্দ্র সাহা	ক্ষীতিশ চন্দ্র সাহা
২৯৯৭৫।	মোঃ নুরুল আমিন মজুমদার	মোঃ নাসির আহম্মদ মজুমদার
২৯৯৭৬।	মোঃ ফজলুল হক	মোঃ সৈয়দ আহম্মদ
২৯৯৭৭।	মোঃ ইলিয়াস	মৃত রাজা মিয়া
২৯৯৭৮।	আঃ বারেক	হাজী আঃ আজিজ
২৯৯৭৯।	মোঃ মনির উদ্দিন	আহছান উল্লা
২৯৯৮০।	আনোয়ার হোসেন	মৃত আঃ আজিজ
২৯৯৮১।	আনোয়ার হোসেন	সিরাজ উদ্দিন
২৯৯৮২।	ইমরানুল করিম	ফজলুল করিম মজুমদার
২৯৯৮৩।	শেখ আহম্মদ	মোঃ গুরা মিয়া
২৯৯৮৪।	মোঃ আলমগীর	এম এস হুদা
২৯৯৮৫।	ইমাম হোসেন মজুমদার	মৌঃ তবারক হোসেন মজুমদার
২৯৯৮৬।	ফয়েজ আহম্মদ	মোঃ জবেদ আলী মজুমদার
২৯৯৮৭।	মোঃ গোলাম রহমান	মৃত মজিবর রহমান
২৯৯৮৮।	মোঃ ইউনুস	মন্ত মিয়া
২৯৯৮৯।	আঃ মোমেন	হাফেজ আবু ছালেক মহিউদ্দিন
২৯৯৯০।	একরাম আলী	মৃত লাল মিয়া
২৯৯৯১।	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মকবুল আহম্মদ
২৯৯৯২।	আবুল ফয়েজ	হাবিবুর রহমান
২৯৯৯৩।	মীর কাশেম	মৃত নুরুল হুদা
২৯৯৯৪।	সিরাজুল হক	মোঃ জবেদ আলী
২৯৯৯৫।	আবুল বাসার	আলী মিয়া
২৯৯৯৬।	আবু তাহের	ওয়াহিদুর রহমান
২৯৯৯৭।	মোঃ আবুল খায়ের	ওয়াহিদুর রহমান
২৯৯৯৮।	এনামুল হোসেন	আবুল বাসার
২৯৯৯৯।	আবুল কাশেম	মৃত আলী আকবর
৩০০০০।	শামছুল হুদা	আঃ জব্বার
৩০০০১।	শফিকুর রহমান	ফজলুর রহমান
৩০০০২।	মোঃ হানিফ	মোঃ ইব্রাহিম
৩০০০৩।	আজিজুল হক	মৃত শামছুল হুদা মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
৩০০০৪।	আবুল কাশেম	আঃ হক
৩০০০৫।	নুরুল আমিন	হাজী আবদুল মালেক
৩০০০৬।	সিরাজুল করিম	আহমেদ হোসেন
৩০০০৭।	রুহুল আমিন	আবদুল রাজ্জাক
৩০০০৮।	আফজালুর রহমান	হাজী আবদুল মজিদ
৩০০০৯।	মোঃ আফজালুর রহমান	মোঃ নাসির উদ্দিন
৩০০১০।	সফিউল্লা	মোঃ সৈয়দ চৌধুরী
৩০০১১।	আবুল কাশেম	সিরাজুল হক

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

সহায়ক গ্রন্থঃ-

১। অলি আহাদ - জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫-১৯৭৫ (ঢাকা-১৯৮২)

২। অজিত ভট্টাচার্য - ডেটলাইন বাংলাদেশ।

৩। আ.কা.মো.যাকারিয়া - কুমিল্লা জেলার ইতিহাস (কুমিল্লা-১৯৮৪)

৪। আবুল মনসুর আহমদ - আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা -১৯৭৫)

৫। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন - মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড১৯৯৪)

৬। " " " " - সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী, ঢাকা-১৯৮৫।

৭। আহমদ ছফা - জাগ্রত বাংলাদেশ, ঢাকা-১৩৭৮।

৮। আলী ইমাম- রক্তদিয়ে কেনা, ঢাকা-১৯৮৮।

৯। আবদুল গাফফার চৌধুরী - বাংলাদেশ কথা কয়, ঢাকা-১৯৮৭।

১০। আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ - ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি ((UPL ঢাকা-১৯৯০)

১১। আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পাদিত) - মুক্তিসংগ্রাম, ঢাকা-১৩৭৯।
" " " - একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন, চট্টগ্রাম-১৯৭৬।

১২। আনোয়ার আহম্মদ - বায়ান্ন থেকে বাহাত্তর, কলকাতা।

১৩। আবু সাইদ চৌধুরী - প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি ((UPL) ঢাকা-১৯৯০।

১৪। আবদুল কাদের সিদ্দিকী - স্বাধীনতা'৭১, কলকাতা-১৯৮৫।

১৫। আবদুল হাফিজ (সম্পাদিত) - রক্তাক্ত মানচিত্র, ঢাকা-১৯৮১।

১৬। আনোয়ার উল্যাহ চৌধুরী - মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, ঢাকা-২০০০।

১৭। এন্থোনী ম্যাসকারেনহাস - দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৩।

১৮। এ,এস,এম, শামসুল আরেফিন - মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যাক্তির অবস্থান (UPL)১৯৯৫)

১৯। একুশের সংকলন ১৯৮১ - স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী।

২০। কামরুদ্দিন আহমদ-পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি।

২১। কাজী সামছুজ্জামান - আমরা স্বাধীন হলাম, ঢাকা-১৯৮৮।

২২। কারী করিম উল্লাহ -মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী 'সি' জোন (নোয়াখালী ডিসেম্বর-১৯৯৮)

২৩। খালেদ মাসুকে রসুল - নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে-লোক জীবনের পরিচয় (বাংলা একাডেমী-১৯৯২)

২৪। গাজীউল হক - এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা-১৯৭২।

২৫। জাতির পিতা বলেছেন (পুস্তিকা) - পাকিস্তান সরকার, ১৯৬৬।

২৬। জাহানারা ইমাম - একাত্তরের দিনগুলি, ঢাকা-১৯৮৬।

২৭। " " - বীরশ্রেষ্ট, ঢাকা-১৩৯০।

২৮। তাজুল মোহাম্মদ - সিলেটে গনহত্যা, ঢাকা-১৯৮৯।

২৯। তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী।

৩০। দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায় - ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ;পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ, কলকাতা-১৩৭৮।

৩১। নীহার রঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) কলকাতা।

৩২। প্যারি মোহন সেন - নোয়াখালীর ইতিহাস (কলকাতা-১৯৪০)।

৩৩। পঙ্কজ ভট্টাচার্য - গৌরবের সমাচার (ঢাকা-১৯৭৭)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। পাকিস্তান সরকার - পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, ঢাকা-১৯৭১।
৩৫। ফজলুর রহমান - যে কথা এতো দিন বলিনি (পি, ডি,পি অফিস-ঢাকা)।
৩৬। ফখরুল ইসলাম - বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস, (নোয়াখালী-১৯৯৮)।
৩৭। বদরুদ্দীন উমর- ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি।
৩৮। " " - ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, চট্টগ্রাম-১৯৮০।
৩৯। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর - জার্নাল'৭১। (UPL) ঢাকা-১৯৮৬।
৪০। বদরুদ্দীন আহমদ - স্বাধীনতার নেপথ্য কাহিনী।
৪১। বাংলা একাডেমী - বায়ান্নর একুশ; ত্রিশ বছর পর,১৯৮৩।
৪২। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৭৪।
৪৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র - প্রথম থেকে ষোলতম খন্ড।
৪৪। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ - ভারত স্বাধীন হল (UPL-১৯৮৯)
৪৫। মেজর রফিকুল ইসলাম (পি.এস.সি) - একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (UPL-১৯৮৫)
৪৬। " " " " - মুক্তিযুদ্ধে দুশো রনাঙ্গন।
৪৭। মেজর রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) - লক্ষ প্রানের বিনিময়ে।
৪৮। মোহাম্মদ জমির (পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় কর্মকর্তা) - বাংলাদেশ; স্মারক গ্রন্থ-১৯৭২; (পূনর্বাসন ও পুর্নগঠন) তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয় থেকে প্রকাশিত।
৪৯। মাহফুজ উল্যা - অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকা-১৯৮৩।
৫০। মেজবা কামাল - আসাদ ও উনসত্তরের গন অভ্যুত্থান, ঢাকা-১৯৮৬।
৫১। মঈদুল হাসান - মূলধারা'৭১, (UPL) ঢাকা-১৯৮৬
৫২। মোহাম্মদ হান্নান - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতহাস (কলকাতা-১৯৯৫)।
৫৩। " " - বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস।
৫৪। মোহাম্মদ আবদুল মোহাইমেন - ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর, প্রথম খন্ড, ঢাকা-১৯৮৯।
৫৫। মঞ্জুর আহমদ - একাত্তর কথা বলে, ঢাকা-১৯৯০।
৫৬। মাহবুবুল আলম - বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, চট্টগ্রাম-১৯৭৬।
৫৭। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র - একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়।
৫৮। মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা - ১১৫ হইতে ১২২ নং খন্ড।
৫৯। মযহারুল ইসলাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা-১৯৭৪।
৬০। যতীন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তধারা- ১৯৮৭।
৬১। রশীদ হায়দার - অসহযোগ আন্দোলন : একাত্তর, বাংলা একাডেমী-১৯৮৫।
৬২। " " (সম্পাদিত) - স্মৃতি'৭১ প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী-১৯৮৭।
৬৩। রফিকুল ইসলাম - বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৭৪।
৬৪। শেখ মুজিবর রহমান - আমাদের বাঁচার দাবী; ৬ দফা কর্মসূচী (পুস্তিকা প্রকাশ- আবদুল মোমেন-১৯৬৯)
৬৫। শামসুল হুদা চৌধুরী - একাত্তরের বিজয়, ঢাকা-১৯৮৫।
৬৬। " " " - একাত্তরের রনাঙ্গন, ঢাকা-১৯৮৮।
৬৭। শওকত ওসমান - নেকড়ে অরন্য, ঢাকা-১৩৮০।
৬৮। " " - জাহান্নাম হইতে বিদায়, ঢাকা-১৯৮৭।
৬৯। শান্তি কুমার ও অন্যান্য - বাংলাদেশের নব সূর্যোদয়, কলকাতা।
৭০। সরলানন্দ সেন - ঢাকার চিঠি, প্রথম খন্ড।
৭১। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন - বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২।
৭২। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন - বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন (এশিয়াটিক সোসাইটি-১৯৮৬)
৭৩। সাহিদা বেগম - যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস, ঢাকা-১৯৮৩।
৭৪। সেলিনা হোসেন - উনসত্তরের গন আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
৭৫। সামসুজ্জামান - মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর, ১৯৮৫।
৭৬। সিরাজ উদ্দিন আহমেদ - বাংলাদেশ গড়লো যারা, ঢাকা-১৯৮৭।
৭৭। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত - একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন (ঢাকা-১৯৬৫)
৭৮। হাসানউজ্জামান - ছেষট্টির স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন; বাঙালী জাতীয়তাবাদের মোড় পরিবর্তন, ঢাকা-১৯৭৯।
৭৯। " " - ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির নীতি; বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গ, ১৯৮১।

পত্রিকাঃ-

৮০। এ,এম, এ মুহিত - সলিমুল্লাহ হলের দিন গুলি, সুবর্ন জয়ন্তী স্মরনিকা।
৮১। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ - স্বাক্ষাতকার প্রকাশিত লক্ষীপুর বার্তা (জুলাই-১৯৯৭)
৮২। কর্নেল জিয়াউর রহমান একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা (২৬ মার্চ,১৯৭২)
৮৩। দৈনিক ইত্তেফাক ৪ মার্চ, ১৯৭১।
৮৪। দৈনিক সংবাদ ২০ মার্চ, ১৯৭১।
৮৫। দৈনিক আজাদ ২৩ মার্চ, ১৯৭১।
৮৬। নওবেলাল, ৪ মার্চ, ১৯৪৮।
৮৭। এম, আবদুল কাদের - বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত (নবদিগন্ত স্মরনিকা-১৯৮৬)।
৮৮। ম, হাবিবুল্লাহ - ভাগ্যের অঞ্চল নোয়াখালী-তবু কেন অভাগা (লক্ষীপুর বার্তা, এপ্রিল-১৯৯৭)
৮৯। মহাত্মাগান্ধী স্মারক প্রকাশনা "সেতু"-১৯৯৪।
৯০। শেখ মুজিবর রহমান - সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লিগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন (অক্টোবর-১৯৫৫)
৯১। সানা উল্লাহ নূরী - ভুলুয়া-নোয়াখালীর সভ্যতা ও রাজ বংশের ইতহাস (লক্ষীপুর বার্তা)
৯২। বাংলাদেশ জনসংখ্যা রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো রিপোর্ট, এপ্রিল, ১৯৯৯ ইং।

সাক্ষাৎকারঃ-

৯৩। আ,ফ,ম, মাহবুবুল হক - আহবায়ক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল।
৯৪। আ, ও, ম শফিক উল্লাহ - সাধারণ সম্পাদক, জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদ (১৯৭০-৭১)
৯৫। এডভোকেট মমিন উল্লাহ - সভাপতি নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগ (১৯৭০)
৯৬। এডভোকেট সরোয়ার-ই-দ্বীন - বি,এল, এফ, বাহিনীর সহপ্রধান (১৯৭১) ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নোয়াখালী জেলা (১৯৭০-৭১)
৯৭। কামাল উদ্দিন আহমেদ (ইংলিশ কামাল) - মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক।
৯৮। গাজী আমিন উল্যা - মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতা (ভারত থেকে অস্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহের দায়িত্ব প্রাপ্ত)

৯৯। ছায়েফুল আলম ইত্তেহাদী - সাধারণ সম্পাদক, রায়পুর থানা আওয়ামী লীগ (১৯৭০-৭১)

১০০।নুরুল হক মিয়া - জাতীয় পরিষদ সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ, ১৯৭১।

১০১।মোহাম্মদুল্লাহ - সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি।

১০২।মোসারফ হোসেন - কমান্ডার সি জোন।

১০৩।মনযুর-উল-করিম (অবসর প্রাপ্ত সচিব) - জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী-১৯৭১।

১০৪।মাহমুদুর রহমান বেলায়েত - বি. এল, এফ, বাহিনীর প্রধান. নোয়াখালী অঞ্চল।

১০৫।শেখ মোঃ আবদুল হাই - সাধারণ সম্পাদক, নোয়াখালী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি (১৯৭০-৭১)

১০৬।হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারী - মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, লক্ষীপুর অঞ্চল।

১০৭।হাবিলদার সামসুল হক - মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, নোয়াখালী অঞ্চল।

ইংরেজী বইঃ-

1. Abdul Momin Chowdhury - The Dynastic History of Bengal.
2. A. K. M. Ayub – Bangladesh; Struggle for Freedom, (Indian Press) 1971.
3. Ahmad Kamruddin – Socio- Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh Dhaka-1975.
4. Ahmad Moudud – Bangladesh; Constitutional Quest for Autonomy (UPL) 1979.
5. Bangladesh Misson, Calcutta – The Truth about Bangladesh, Calcutta, 1971.
6. Bhuiyan Md. Abdul Wadud – Emergence of Bangladesh and Role of Awami League (UPL) Dhaka-1982.
7. Choudhury Subrata Ray – The Genisis of Bangladesh, NewYork, 1972.
8. Kabir Mafizullah – Experiences of an Exile of Home Life in Occupied Bangladesh, 1972.
9. Gupta Sukhranjan Das – Midnight Massacre in Dacca, New Delhi, 1978.
10. Md. Omar Faruque – Emergence of Bangladesh, 1972.
11. K.M. Safiullah (Maj-Gen) – Bangladesh at War,1990.
12. Nurul Islam Khan (C.S.P) - The District Gazetteer, Noakhali-1977.
13. Publication Division, India---
14. Rounaq Jahan – Pakistan; Failure in National Integration, New York, 1972.
15. Rangalal Sen - Political Elites in Bangladesh (UPL)
16. Tewary I.N. – War of Independence in Bangladesh; a Documentary Study, India, 1971.
17. Zamal Hasan (ED) – East Pakistan Crisis and India (Pakistan Academy)
18. Bangladesh population census Report-1991.
19. Statistical Yearbook of Bangladesh 1996.
20. The Gazette of Pakistan extra, 5 June,1970.
21. The Gazette of Pakistan Extra Ordinary, 20 Sept.1971.
22. W. H Thomson, Final Report on the Survey and settlement Operation in the District of Noakhali.
23. The Bangladesh Observer, 23 February, 1969.
24. The People (Dhaka) 23 March 1971.

২৫. The Second Five Years Plan Report.

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা

(রাজনৈতিক মানচিত্র)

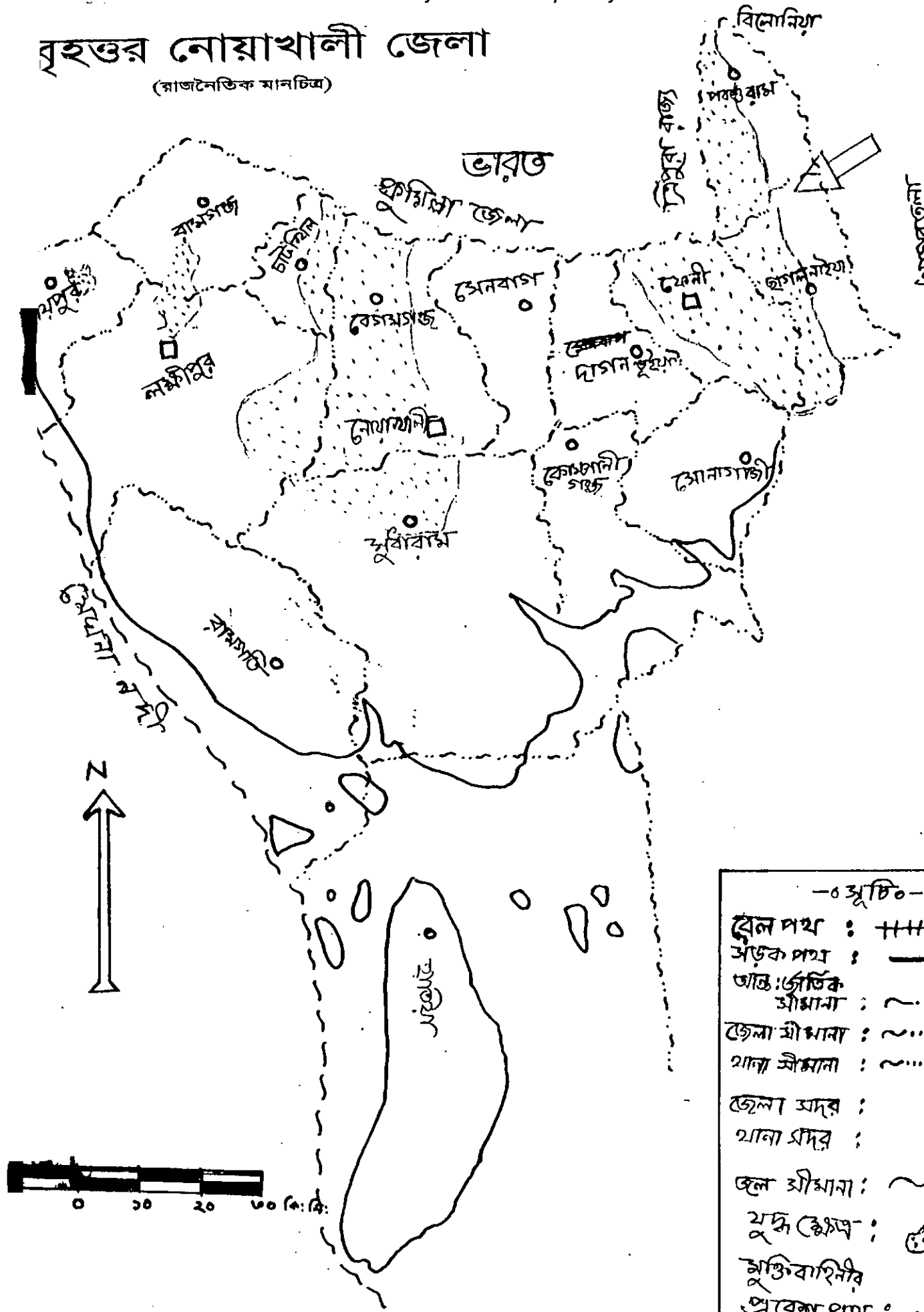

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা

(যোগাযোগ মানচিত্র)

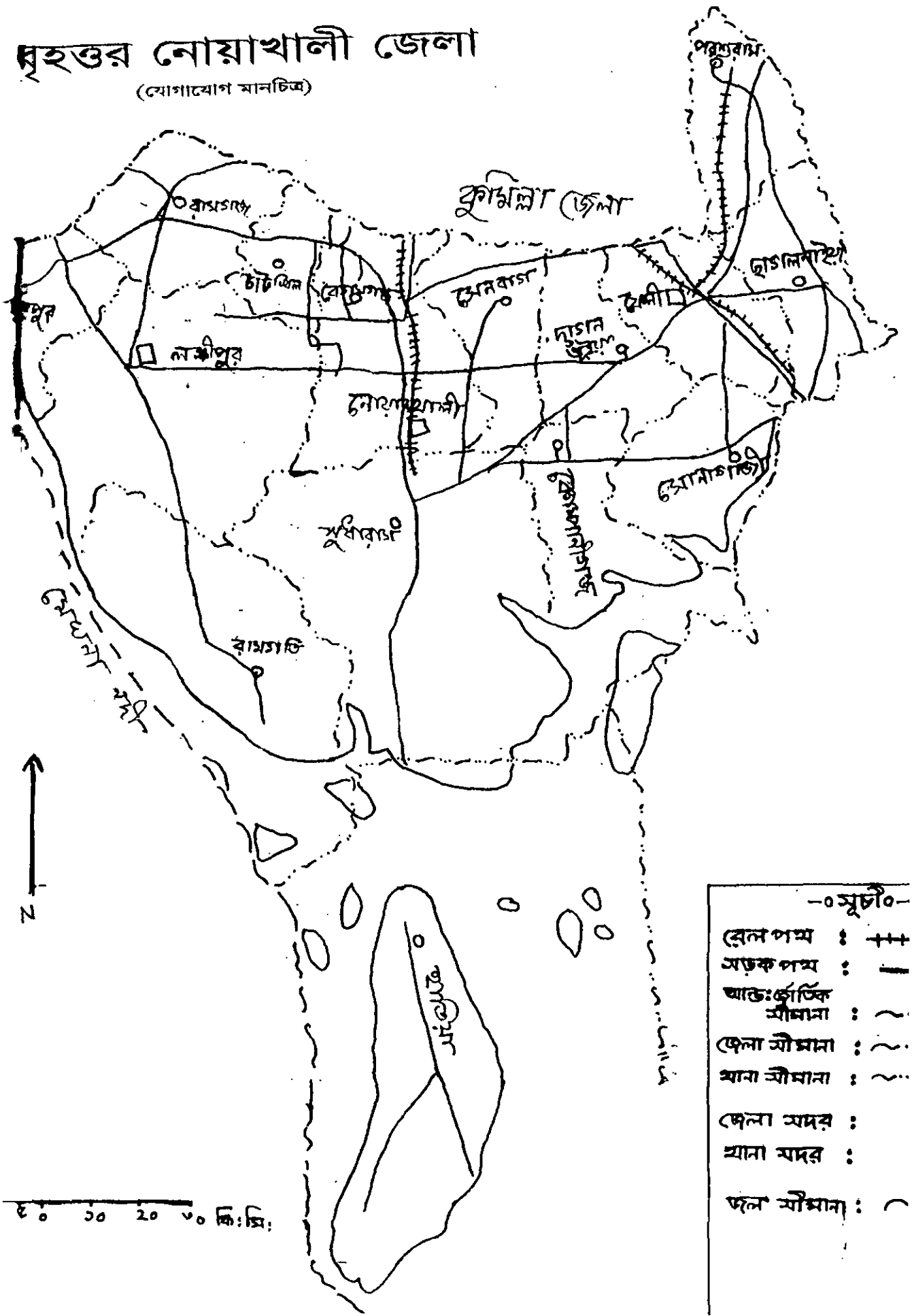

Dhaka University Institutional Repository